বিদেশীদের চোখে বাংলা

চণ্ডী লাহিড়ী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই বৈশাখ,
১৮৮২ শকাব্দ

প্রচ্ছদসজ্জা
ও
চিত্রাঙ্কন :
চণ্ডী লাহিড়ী

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভৌমিক
রুবী প্রিন্টিং হাউস
৪০/১-বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা-১২

প্রসঙ্গতঃ

কয়েক বছর আগের কথা। এক ইংরেজ বন্ধু সকৌতুক প্রশ্ন করেছিলেন—স্বাধীন ভারতের নাগরিকরা ইংরেজদের এখন কোন্ চোখে দেখে? আজও কি তাদের প্রতি আমরা তেমনই সন্দিগ্ধ? আর এই যে প্রায় দুশো বছরের সম্পর্ক, এর সবটাই কি দুঃখবিধুর স্মৃতি? মাধুর্যের কোন স্পর্শই কি কোথাও নেই? বোধ করি সেই প্রশ্নের কিঞ্চিৎ উত্তরপ্রয়াস আলোচ্য গ্রন্থ। প্রশ্ন শুধু ইংরেজদের নয়, আরও বহু বিদেশী এদেশে এসেছে, এবং ভারতবর্ষকে উপলব্ধির চেষ্টা করেছে। কিন্তু পরশাসনের লৌহ যবনিকা ভেদ করে আমরা যেমন বিদেশকে জানতে পারিনি, বিদেশীরাও আমাদের সঙ্গে পরিচয় সাধন করতে এসে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু নিরবধি কাল, বিপুলা পৃথ্বী। ভারত দেশটি বৃহৎ এবং বিদেশীদের আগমন শুরু হয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে। নিছক কাজের সুবিধার জন্য আমি বেছে নিয়েছি বাংলাদেশ এবং মাত্র একশো বছরের পটভূমিকে। ১৭৫৭-১৮৫৭ পর্যন্ত কলকাতাই ছিল সারা ভারতের রাজধানী—শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও এই একশো বছর কলকাতা ছিল ভারতের শিরোমণি। আঠারো শতকে হুগলী নদীর দুই তীর ছিল বিদেশীদের ঘাঁটি। দেশ-বিদেশের এত জাহাজকে বক্ষে স্থান দেওয়ার অভিজ্ঞতা আর কোন ভারতীয় নদীর হয়নি।

বিদেশীদের প্রাচ্যতত্ত্বসম্পর্কিত গবেষণা আমার আলোচনা থেকে নির্বাসিত। প্রাচ্যতত্ত্ব সেকালে তো বটেই, একালেও পুরাতত্ত্ব আলোচনার নামান্তর। আশু বর্তমানের মানুষ ও তার সমাজ নিয়ে তার কোন আগ্রহ নেই। বর্তমানের জীবন্ত নরনারীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌রা কখনও সংস্কৃত ব্যাকরণ, কখনও উপনিষদের ভাষ্য, কখনও আবেস্তার উপর হিপোক্রিটাসের প্রভাব নিয়ে গুরুভার প্রবন্ধ রচনা করেছেন। আর এই প্রাচ্যতত্ত্ব-বিদ্‌দের মধ্যে অনেকেই এদেশে আসেন নি। এদেশের মানুষ, মাটি, ফুল, ফল, আকাশ বায়ুর সঙ্গে তাঁদের কোন পরিচয় হয়নি। পুঁথির বাইরে বৃহৎ প্রাণময় দেশটির সঙ্গে তাঁদের অনেকেই সম্পর্কহীন। অথচ এই মুষ্টিমেয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌দের বাইরেও বহু বিদেশী ছিলেন যাঁরা তাঁদের ভ্রমণ কাহিনী, ডায়েরী, স্মৃতিকথা বা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে এদেশের মানুষ, সমাজ, আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদির কথা

লিখে রেখে গেছেন। তাঁদের অনুভূতির অকপট আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই সব ডায়েরী বা চিঠিপত্রে। ব্যবহারিক জীবনে এদের কেউ গভর্ণর জেনারেল, কেউ সাধারণ সৈনিক, কেউ নিছক পর্যটক। ইচ্ছা করেই যথাসম্ভব সরকারী নথিপত্র বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত নথিপত্রের উপর গুরুত্ব দিয়েছি। কারণ সরকারী নির্মোকের অন্তরালবর্তী নিভৃত মনের গোপন কথাটি কেবল এখানেই ধরা যায়।

আমি পেশায় সাংবাদিক। এই গ্রন্থ রচনাকালেও সাংবাদিকসুলভ খোলা মন নিয়েই আলোচনায় ব্রতী হয়েছি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির দূরতম বাসনাও মনে স্থান পায়নি। যদি কোথাও কোন তথ্য বাদ পড়ে গিয়ে থাকে, সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। পণ্ডিত গবেষকের অহমিকাও আমার নেই। অনেক চেষ্টায় একটি কাঠামো মাত্র রচনা করেছি। ভবিষ্যতে কেউ এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করে মূল্যবান গ্রন্থ লিখবেন এমন ভরসা রাখি। তবে যিনিই এই কাজে হাত দেবেন তাঁকে একাধিক ভাষাবিদ্ হতেই হবে। রুশ, ডাচ, পর্তুগীজ ডেনিশ ও ফরাসি ভাষায় বহু গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি আজও আছে যা আমাদের অনেকের পক্ষেই এককভাবে অনধিগম্য, অথচ যার গভীরে প্রবেশ করতে পারলে উভয় দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠবে। বোধ করি, তাতে বিদেশীদের চেয়ে আমরাই উপকৃত হব বেশী।

গ্রন্থ প্রণয়নকালে জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এসিয়াটিক সোসাইটিও ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রহ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে মিঃ ডেভিড হিউজ, পি. ক্রোশন, এবং ভি. এ. ম্যাকারেঙ্কোর সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। বন্ধুবর সুধীন ব্যানার্জী প্রামাণ্য বই থেকে আলোক-চিত্র গ্রহণে সাহায্য করেছেন।

উপসংহারে জানাই, আনন্দবাজার পত্রিকা ও সমকালীনে প্রবন্ধগুলির কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্তভাবে। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় সবগুলিই পরিবর্ধিত হয়েছে।

বাংলায় বিদেশী

(১৭৫৭—১৮৫৭)

যে সময়কে এই গ্রন্থে আলোচ্যকাল রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, তার সূচনায় কোম্পানি শাসনের উষাকাল, অন্তিমদশায় সমাপ্তি। উষাকাল, প্রভাত নয়। দিগন্তে তখনো কুয়াসা। সারাদিনের আবহাওয়া কেমন যাবে তখনও আঁচ করা সম্ভব নয়। সিরাজের পতন ঘটেছিল ঠিক, কিন্তু ইংরেজদের জয় কতখানি এবং পরিণতি কি দাঁড়াবে, সে সম্পর্কে কোম্পানি নিঃসন্দিগ্ধ নয়। কারণ, এক নবাব গেলেও, তখনও ক্ষুদে নবাব অনেক। দেশের শাসক কারা হবে স্থির হয়নি, রাজস্ব কার হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং কতখানি তার জবাব দেবে কে ?
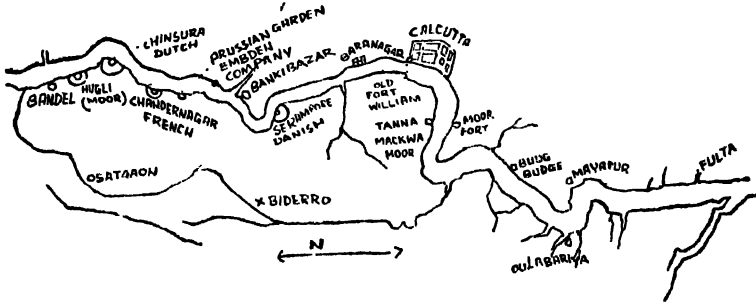
খাস কলকাতায় অবশ্য ইংরেজরা অনেক আগেই গুছিয়ে বসেছিল। সেখানকার আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করত কোম্পানি জমিদারের মারফত। ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের দেশী ধনীরা কলকাতায় উদ্বেগহীন জীবনযাপন করতে শুরু করেছিল। কলকাতার এই সমৃদ্ধিকে মুর্শিদাবাদ ঈর্ষা করত সন্দেহ নেই। ইংরেজ ছাড়াও বাংলাদেশে সে সময় ছিল ফরাসি, ডাচ, ডেনরা আর ছিন্ন-বিছিন্নভাবে ছিল পর্তুগীজ ও আর্মেনিয়ান। এদের গতিবিধির দিকেও কোম্পানিকে সতর্ক-সশঙ্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারী নথিপত্রে এই সময়কার বিদেশীদের খবর কিছু পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য সে হল একতরফের চিত্র—ইংরেজ কোম্পানির সন্দিগ্ধ চোখে দেখা প্রতিদ্বন্দ্বীদের চিত্র। অপর পক্ষে, অর্থাৎ ফরাসি, ডাচ বা ডেনরা এই

সময় বাংলা দেশকে কেমন দেখেছিল, তা জানা যায়নি। ঐ সব দেশের মহাফেজ-খানায় সে সব নথিপত্র সংরক্ষিত থাকতে পারে।

পর্তুগীজ

জব চার্ণক যেমন হুগলি নদীর মধ্য দিয়ে এসে সুতানুটিতে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন, পর্তুগীজরাও এসেছিলেন বিদ্যাধরী নদীর মধ্য দিয়ে। ঘাঁটি বসিয়েছিল তারদায়, অধুনা লবণ হ্রদের গভীরে অবলুপ্ত। সে প্রায় চারশো বছর আগের কথা। তারদা ছিল পর্তুগীজদের ঘাঁটি, এবং আশে পাশে তাদের প্রবল প্রতাপ ছিল বলে তারদাকে পর্তুগীজ রাজধানীও বলা চলে। একশো বৎসরের পরিশ্রমে গড়ে উঠেছিল তারদা। সপ্তগ্রামেও পর্তুগীজরা ঘাঁটি করেছিল। ব্যাণ্ডেল কথাটি পর্তুগীজ, ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে ল্যাণ্ডিং প্লেস। ব্যাণ্ডেল কথাটি এসেছে ফার্সি বন্দর থেকে। পর্তুগীজরা বলত Bandel De Chatigao, Bandel De Ugolin. অর্থাৎ চট্টগ্রাম বন্দর, হুগলি বন্দর ইত্যাদি। শেষোক্ত বন্দরটি পরে কেবল ব্যাণ্ডেল নামে পরিচিত হয়। তারদাকে বাদ দিলে সপ্তগ্রামের কাছে ব্যাণ্ডেলই ছিল তাদের বড় ঘাঁটি। সারা সুন্দরবনে পর্তুগীজদের অবাধ দৌরাত্ম্য। "হার্মাদের ডরে" তখন বৌ-ঝিরা একলা পুকুরঘাটে স্নান করতে নামত না। স্ত্রী-পুরুষ বলে কোন ভেদাভেদ নেই। এখান থেকে তাদের চুরি করে বা বলপূর্বক অপহরণ করে গোয়ার দাস বাজারে তারা বিক্রি করত। আবার অন্য দেশের লোক ধরে এনে বাংলা দেশে দাস হিসেবে বিক্রি করত। দাস-ব্যবসা যে বাংলা দেশে বেশ ভালভাবেই চলত, তার প্রমাণ অনেক আছে। নৌকাযোগে তারা বিভিন্ন বন্দরে অপহৃত নারীদের বিক্রি করত। বাংলা দেশের বহু নিন্দিত "ভরার মেয়ে"দের মূলে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের কলঙ্কিত কাহিনী লুকিয়ে আছে। সুন্দরবনের নদীপথে তখন মগ ও পর্তুগীজদের প্রচণ্ড প্রতাপ। জলদস্যুতা তাদের পেশা। ঝড় ও দুর্ভিক্ষে সুন্দরবন জনমানবহীন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে এটা যতখানি সত্য, এই ব্যাপারে পর্তুগীজদের ভূমিকাও কম নয়। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে খুলনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল "ল্যাণ্ড ডিপপুলেটেড বাই দি পর্তুগীজ" বলে চিহ্নিত করা আছে। ১৭৪৮-এ প্রকাশিত মানচিত্রে ডায়মণ্ড হারবারের কাছে একটি নদীর নাম দেওয়া আছে Rogue's river. পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে দেখা যায় পর্তুগীজরা পাদপ্রদীপের সম্মুখে নেই। অন্তরালে। কেউ দেশী জমিদার বা

ফরাসি বা ইংরেজ বাহিনীতে টোপাস (তোপ দাগার কাজ), কেউ বাজনদার, কেউ রন্ধন-শিল্পীর চাকরি নিয়ে বসে আছে। বিদেশীদের মধ্যে দেশী নারীদের বিয়ে করেছে পর্তুগীজরাই সর্বাধিক, এরা ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত। ধর্মে রোমান ক্যাথলিক, কাজেই ইংরেজদের মনে সর্বদাই ভয় ছিল, ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইংরেজ বাহিনীভুক্ত পর্তুগীজরা ক্যাথলিক ফরাসিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে না। ইংরেজদের সক্রিয় ও সতর্ক প্রতিবেশী ছিল ডেন, ডাচ ও ফরাসিরা। ডাচরা রাজনৈতিক শক্তি করায়ত্ত করেছিল সিংহলে, পর্তুগীজরা গোয়ায়। বাংলায় নিছক বাণিজ্য ছাড়া আর কোন আগ্রহ তাদের ছিল না। ডেনদের ভারতে প্রধান বাণিজ্য ঘাঁটি ছিল ত্রিবাঙ্কুরে। বাংলা দেশে তাদের আগমন ঘটে অনেক পরে।

ডাচ

বাংলায় ডাচরা বাণিজ্যের প্রথম উদ্যোগ করে ১৬২৭ সালে। করোমণ্ডলের ডাচ-গভর্নর ঐ বৎসর কয়েকজন কর্মচারীকে বাংলায় বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপনের জন্য পাঠিয়ে দেন। বাংলার বাণিজ্যিক গুরুত্ব অল্প সময়ের মধ্যে এত বৃদ্ধি পায় যে, ১৬৫৫ সালে স্বতন্ত্র ডিরেক্টরেট অব বেঙ্গল গঠিত হয়। চুঁচুড়ার বাণিজ্য-কেন্দ্রের নামডাক চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বার্নিয়ে (১৬৬৫-৬৬) বাংলায় ডাচদের বস্ত্রব্যবসায়ের প্রচুর প্রশংসা করেছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে। তাঁর বর্ণানুসারে তাঁদের "কাশিমবাজার কুঠিতে" সাত-আট শো দেশী কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। ডিরেক্টরেট অব বেঙ্গলের অধীনে সপ্তদশ শতকের শেষদিকে দেখা যায় চুঁচুড়া, কাশিমবাজার, বালেশ্বর, পাটনা, ঢাকা ও মালদায় তাদের কুঠিতে পুরোদমে বাণিজ্য চলেছে। বস্ত্র ও লবণের বাণিজ্যই প্রধান, আনুসঙ্গিক অন্যান্য দ্রব্যও ছিল। বাংলায় তাদের ভূ-সম্পত্তি ছিল কেবল চুঁচুড়া ও বরানগরে। কি ভাবে এই সম্পত্তির তাঁরা মালিক হয়েছিলেন, সেটা চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত হয়নি। নবাবের কাছ থেকে পাওয়া কোন ফরমান তারা কোনদিন দেখায়নি। ১৭৫৬-৫৭ সালের সূচনায় দেখা যায় বাংলার নবাব, ইংরেজ, ফরাসি, ডাচ প্রত্যেকেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কম্পমান। এ সময় ইতিহাসের পট পরিবর্তিত হয়েছে বিদ্যুৎগতিতে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছে ভূমিকা বদল।

ইংরেজদের দমন করবার জন্য নবাব সিরাজউদ্দৌলা ডাচ, ফরাসি ও ডেনদের

সাহায্য চেয়েছিলেন। কলিকাতা অভিযানের আগে কাশিমবাজার দরবারে ঐ তিন বিদেশী কুঠির স্থানীয় প্রতিনিধিদের তলব করেন। জানতে চান, ইংরেজদমনে তারা কি ভাবে নবাবকে সাহায্য করতে পারে। ডাচরা নবাবকে এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে অস্বীকার করে। তাদের যুক্তি হল—"ডাচ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গঠিত, যুদ্ধ করা কোম্পানির কাজ নয়। তাছাড়া চুঁচুড়া কুঠিতে আছে মোটে দশটি কামান ও সাদা-কালো সহ মাত্র ৫০ জন সৈন্য।" নবাব এতে কর্ণপাত করেন নি। তিনি হুকুম দেন, তাঁর সৈন্যরা যখন স্থলপথে কলকাতার দিকে অভিযান করবে, জলপথে তখন যেন ডাচ, ডেন ও ফরাসিদের জাহাজগুলি তাদের সাহায্য করে।

ডাচরা এই আদেশও অমান্য করে। নবাব তখন তাদেব হুমকি দেন যে, ফিরে এসে তিনি ডাচদেরও বাণিজ্য-অধিকার বন্ধ কবে দেবেন। যাই হোক, নবাবের আর্মেনীয় বন্ধু খোজা ওয়াজিদেব মধ্যস্থতায় ডাচরা পরে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। নবাব হুকুম দেন তাঁব কলিকাতা-অভিযানে বিপুল অর্থ ব্যযেব কথা বিবেচনা করে চার লক্ষ টাকা নজরানা দিতে।

এত টাকা দেবার সঙ্গতি ডাচদেব ছিল না। কিন্তু অন্য উপায়? নবাবের সৈন্যরা হয় টাকা অথবা রসদ ও অস্ত্র-সমর্পণের দাবী জানিযে কুঠি অবরোধ করে ফেলেছিল। টাকা না দিলে কাশিমবাজার, পাটনা ও অন্যান্য কুঠির ডাচরাও রেহাই পাবে না। আড়ঙ্গে মজুদ কয়েক লক্ষ টাকার মাল হাতছাড়া হয়ে যাবে। শেষ বাবের মত ডাচরা নবাবের কাছে দাবীর পরিমাণ হ্রাসের জন্য আবেদন জানালেন ভকিলের মারফৎ। এবারও তাঁরা নিষ্ফল হলেন। ডাচরা বাধ্য হয়ে মোটা সুদ কবুল কবে জগৎশেঠের গদী থেকে চার লক্ষ টাকা ধার করে নবাবকে সমর্পণ করল।

নবাব যখন কলকাতা আক্রমণ করলেন, ডাচরা তখন বিপন্ন ইংরেজদের সাহায্য করেনি। পটপরিবর্তন হল অল্পদিনের মধ্যেই। কর্ণেল ক্লাইভ ও এডমিরাল ওয়াটসনের নেতৃত্বে কলকাতা পুনরুদ্ধার হওয়ার সংবাদ পেয়ে ডাচ ডিরেক্টর অভিনন্দন জানালেন ওয়াটসনকে। ডাচ ইকুইপমেণ্ট-মাস্টার ক্যাপ্টেন লুকাস জাডল্যাণ্ড স্বয়ং অভিনন্দন-পত্র হাতে নিয়ে গেলেন। কলকাতার পব ইংরেজরা চলল হুগলি অভিযানে। ডাচরা তখনো নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। ইংরেজদের আগমনের সংবাদ পেয়ে প্রাণভয়ে হুগলি ও চুঁচুড়ার বহু অধিবাসী শহর ছেড়ে পালাল।

এডমিরাল ওয়াটসন ডাচ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে, তাঁরা নবাবের লোকজনদের অন্যায় ভাবে আশ্রয় দিয়েছে। হুগলি নদীতে ভাসমান কয়েকটি ডাচ জাহাজকে ইংরেজরা আটক করে রাখল। অধিবাসীরা শহর ছেড়ে পলাতক, কুঠির ভিতরে যথেষ্ট খাদ্যবস্তুর অভাব। এদিকে ইংরেজের অবরোধ, ওদিকে নবাবের আক্রোশ। ডাচদের এক সঙ্গীন অবস্থা সে সময়।

ইংরেজরা চন্দননগর অধিকার করলে সেখানকার বহু ফরাসি অধিবাসী স্ত্রী-পুত্রসহ চুঁচুড়ার ডাচ কুঠীতে আশ্রয় নেয। কর্ণেল ক্লাইভ ১৩ই এপ্রিলের পত্রে আশ্রয়প্রার্থীদের তাঁর হাতে সমর্পণ করতে নির্দেশ দেন। বাধ্য হয়ে ডাচ ডিরেক্টর আদ্রিযান বিশডম আশ্রয়প্রার্থীদের কুঠি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বলেন।

আশ্রযপ্রার্থীদের প্রথমে কলকাতায় ও পরে চন্দননগর ও শ্রীরামপুরে ফিরিয়ে আনা হয। কিন্তু কাশিমবাজার ডাচকুঠীব ডিরেক্টব মিঃ ভার্নেট ইংরেজদের আদেশে কর্ণপাত করেননি। তিনি আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয তো দিলেনই, পরন্তু নিজ কুঠিকে শক্তিশালী করার জন্য বাটাভিযায় লিখে পাঠালেন অস্ত্র পাঠাতে।

এবার পটপরিবর্তন ঘটল দ্রুততর। পলাশীর যুদ্ধে নবাব ক্লাইভের কাছে হেরে গেলেন। ডাচ ডিরেক্টব বিশডম নিরপেক্ষতার নির্মোক ফেলে দিয়ে ক্লাইভকে অভিনন্দন জানালেন।

ফরাসিরা পর্যুদস্ত, নবাবও পরাজিত। ডাচরা অতঃপর মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। মুর্শিদাবাদের নতুন নবাবকে ডাচরা প্রথমে স্বীকার করেনি। ইংরেজদের জয়লাভেও তারা ঈর্ষাবোধ করেছিল। ১৭৫৯ সালে জুন মাসে গুজব রটে গেল যে বাটাভিয়া থেকে ডাচ যুদ্ধ-জাহাজ আসছে ইংরেজদের হঠাতে। আগস্ট মাসে দেখা গেল গুজব সত্য। বহু ইওরোপীয় ও মালয়ী সৈন্যসহ একটি ডাচ জাহাজ এসে পৌছাল। বিপন্ন ক্লাইভ নবাবের দ্বারস্থ হলেন। নবাব ডাচদের কোনপ্রকার যুদ্ধে লিপ্ত না হতে নির্দেশ দিলেন। অক্টোবর মাসে হুগলি নদীতে আরও সাতটি সৈন্যবোঝাই জাহাজ এসে পৌছাল। ক্লাইভ আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেন না। হেস্টিংসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নবাব ডাচদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। নবাবের সমর্থনেই ডাচ যুদ্ধ জাহাজের আগমন। উভয় পক্ষেই শুরু হল যুদ্ধপ্রস্তুতি। ডাচরা নিজেদের সৈন্য ছাড়াও চুঁচুড়া, কাশিমবাজার ও পাটনায় দেশী সৈন্য সংগ্রহ শুরু করল।

১৬ই নভেম্বর ক্লাইভের নির্দেশে ক্যাপ্টেন ফোর্ড বরানগরস্থ ডাচকুঠি আক্রমণ করলেন।

২৩শে নভেম্বর ক্লাইভ কমোডোর উইলসনের মারফত ডাচদের চরমপত্র পাঠালেন —হয় আত্মসমর্পণ; নয় যুদ্ধ। যুদ্ধই হল। দুঘণ্টাব্যাপী তুমুল লড়াইয়ের শেষে ডাচরা পরাজয় বরণ করে নিল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে বেদারার যুদ্ধ নামে খ্যাত। চন্দননগর ও চুঁচুড়ার মাঝে এই বেদারার মাঠেই ডাচদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়েছিল।

এরপর দীর্ঘদিন উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা থাকলেও প্রকাশ্য কলহ দেখা দেয়নি। ডাচদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ বহুবার করা হয়েছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে, কিন্তু নরম ভাষায়।

১৭৭৮ সালের মার্চ মাসে ইওরোপে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ শুরু হল, আর তাকে অনুসরণ করে অশান্তির সৃষ্টি হল এদেশেও। কর্ণেল আলেকজাণ্ডার ডো আক্রমণ করলেন ফরাসিদের চন্দননগর। চুঁচুড়া থেকে ডাচ ডিরেক্টর পত্রযোগে কলকাতার ইংরেজ কোম্পানিকে জানালেন যে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধে তাঁরা নিরপেক্ষ। অল্পদিনের মধ্যেই ইওরোপ থেকে খবর এসে পৌঁছাল যে, সে-দেশে ডাচদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধেছে। ইংরেজদের অবস্থা তখন বেশ সঙ্গীন। আমেরিকায় তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। ইংরেজরা সেখানে বিপদগ্রস্ত। ওদিকে ইওরোপে বিভিন্ন শক্তি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। এই বিপদের সুযোগ নিয়ে ফরাসিরা ভারতে হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের সাহায্যে লুপ্ত কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে।

১৭৮০ সালে মার্কিন স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই বিপজ্জনক দিনগুলির মধ্যে ইউনাইটেড নেদারল্যাণ্ড সরকার ফরাসিদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়। ২০শে ডিসেম্বর ইংরেজরা ডাচদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বাংলায় ক্যাপ্টেন চ্যাটফিল্ড পূর্বেই চন্দননগর দখল করেছিলেন। সেখান থেকেই তিনি অবরোধ করলেন চুঁচুড়ার ডাচ ঘাঁটি। কলকাতার কাউন্সিল ডাচ সম্পত্তির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কমিশার গঠন করে পাঠিয়ে দিলেন চুঁচুড়ায়। দুর্বল ডাচ গভর্নর রস্ কোনপ্রকার বাধা না দিয়ে ইংরেজ কোম্পানির হাতে হিসাব বুঝিয়ে দিলেন। কমিশারের পক্ষ থেকে নন্দকুমার চক্রবর্তী, কালিচরণ বোস, গঙ্গানারায়ণ ও গোবিন্দ নারায়ণ রায় সরকার হিসাবে বিভিন্ন গুদামে মজুদ মালের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। বরানগর কুঠির দায়িত্ব গ্রহণ করেন জন প্যাটারসন।

১৭৮৩ সালে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হয়। তদনুসারে ডাচরা, বিলম্বে হলেও, ভারতস্থ বিভিন্ন কুঠির অধিকার ফিরে পায়।

বরানগর কুঠি নিয়ে কোনদিনই ডাচদের স্বস্তি ছিল না। ইংরেজদের ঘাঁটি কলকাতা ছিল ঠিক পাশে। আক্রান্ত হলে বরানগরকে রক্ষা করা চুঁচুড়ার পক্ষে সম্ভব নয়। আর বরানগরে বাণিজ্যের পরিমাণ এত বেশী নয় যার জন্য তার প্রতিরক্ষা বাবদ অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

এই সব কারণে, ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেই ডাচরা বরানগর ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করে তার পরিবর্তে হুগলির কাছে কিছু জমি সংগ্রহ করার প্রস্তাব তুলেছিল। ডাচ কাউন্সিল হেস্টিংসের কাছে যে পত্র (১০ই এপ্রিল, ১৭৭৫) লেখেন, তাতে বলা হয়েছিল—বরানগরের কোন গুরুত্বই আমাদের কাছে নেই, কিন্তু আপনাদের কাছে এর মূল্য অনেক। আমাদের একান্ত অনুরোধ বরানগরের সম-পরিমাণ জমি চুঁচড়ার কাছে মঞ্জুর করুন।

ওয়ারেন হেস্টিংস এ প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু দুই পক্ষের আলোচনা যখন বহুদূর অগ্রসর হয়েছে, তখন সহসা চুঁচুড়ার ডাচ কর্তৃপক্ষই প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিলেন। তাঁরা জানালেন, বাটাভিয়ার কর্তৃপক্ষ বরানগর প্রত্যর্পণের প্রস্তাব সমর্থন করেনি।

পরে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে চুঁচুড়ার ডাচ ডিরেক্টর মিঃ আইজ্যাক টিটসিং বরানগর প্রত্যর্পণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শর্ত পুর্ববৎ। কর্ণওয়ালিশ কলকাতার কাউন্সিলের কাছে প্রস্তাবটি সমর্থনের জন্য পেশ করে বললেন, ডাচদের শর্তানুসারে বরানগর নেওয়া দরকার, কারণ বহু সমাজবিরোধী ব্যক্তি আমাদের আইন কানুনের দায় এড়াবার জন্য সেখানে আশ্রয় নিয়ে থাকে। তা ছাড়া ডাচরা যদি চুঁচুড়ার মত বরানগরকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আয়োজন করে, সেটা আমাদের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করবে।

খুব সম্ভবতঃ ১৭৯৫ সালেই বিনিময়ের ভিত্তিতে ইংরেজরা বরানগর গ্রহণ করে।

১৭৯৪ সালে ফরাসি সৈন্যরা হল্যাণ্ড আক্রমণ করে। রাজধানী আমস্টার্ডমের পতন হয় ১৭৯৫ সালের জানুয়ারী মাসে। রাজা স্ট্যাডহোল্ডার পালিয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নেন। আশ্রয়প্রার্থী রাজা এক ঘোষণা দ্বারা তাঁর প্রজাপুঞ্জের কাছে আবেদন করলেন যাবতীয় ডাচ উপনিবেশ রক্ষার দায়িত্ব বৃটিশ সরকারের উপর অর্পণ করতে। ভারতস্থ ডাচ উপনিবেশগুলি ফরাসিরা দখল করলে ইংরেজ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে এই আশঙ্কায় লণ্ডন থেকে ভারতস্থ ইংরেজ কোম্পানির কাছে নির্দেশ

এল—অবিলম্বে ডাচ কুঠিসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের। কিন্তু ফরাসি আক্রমণের হাত থেকে ডাচ কুঠী রক্ষার নাম করে কার্যতঃ ইংরেজ কোম্পানি সেগুলি অধিকার করে নিতে থাকে।

১৮০২ সালে আমিয়েন্সে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হল। চুক্তির শর্ত অনুসারে ফ্রান্সকে তাদের পূর্ব উপনিবেশগুলি প্রত্যর্পণ করার কথা। লর্ড ওয়েলেসলি অল্পদিনের মধ্যেই নির্দেশ পেলেন ডাচদের (সিংহল ব্যতীত) পুর্বেকার ঘাঁটিগুলি প্রত্যর্পণের। এটা হল সরকারী নির্দেশ। কিন্তু গোপনে তাঁকে লণ্ডন থেকে জানানো হল যে, ডাচদের সঙ্গে ফ্রান্সের যে-কোন সময় যুদ্ধ বাধতে পারে। আর ইংলণ্ডের সঙ্গেও ফ্রান্সের সম্পর্ক মধুর নয়। যুদ্ধের সম্ভাবনা আছে। ডাচরা তখন বেশ দুর্বল। স্বদেশে ফ্রান্স সর্বদা মারমুখী, ভারতে ইংরেজদের প্রবল বিক্রম। ফ্রান্সের হাত থেকে রক্ষার অজুহাতে সেই যে ইংরেজরা ডাচকুঠিগুলি দখল করেছিল, তারপর সেগুলি হস্তান্তরের কোন সদিচ্ছাই তাদের আচরণে কোনদিন প্রকাশ পায়নি। ১৮১০ ও ১৮১১ সালে লর্ড মিণ্টো জাভা ও মলাক্কা ডাচদের হাত থেকে কেড়ে নেন। অর্থাৎ তাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি হাতছাড়া হয়ে যায়।

১৮১৪ সালের ১৩ই আগস্ট বৃটিশ ও নেদারল্যাণ্ড সরকারের মধ্যে যে চুক্তি হয় তদনুসারে ডাচরা তাদের ভারতস্থ প্রায় সব ঘাঁটিই ফিরে পায়। কিন্তু চারদিকে তখন বৃটিশ সাম্রাজ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার কোন সুযোগ সুবিধাই আর অবশিষ্ট নেই। আর বৃটিশ সেনাবাহিনীর করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা ছাড়া নিরাপত্তা নেই। বাধ্য হয়ে ডাচ সরকার প্রস্তাব করলেন প্রাচ্যের ঘাঁটিগুলি বৃটেনের সঙ্গে বিনিময়ের। ১৮২৪ সালের ১৭ই মার্চ বৃটিশ ও নেদারল্যাণ্ড সরকারের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হল। ১৮২৫ সালের ১৩ই জানুয়ারী হুগলি, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, পাটনা, কটক ও ২৪-পরগণার কমিশনারগণ চুঁচুড়া, কালিকাপুর, ঢাকা, পাটনা ও ফলতার ডাচকুঠির অধিকার গ্রহণ করলেন।

ডেন

১৭৫৫ সালের ১৫ই জুলাই নবাব আলীবর্দী খাঁর কাছ থেকে ডেনরা শ্রীরামপুরে ঘাঁটি স্থাপনের ফরমান পায়। ঐ বছরই সেখানে ৮ই অক্টোবর ডেন পতাকা অনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলিত হয়। ডেনমার্কের রাজা পঞ্চম ফ্রেডরিকের নামানুসারে শ্রীরামপুরের নাম হয় ফ্রেডরিকনগর। ডেন ঘাঁটির প্রধান সচিব নিযুক্ত হন

মিঃ স্বোটম্যান। নবাব প্রদত্ত ফরমান অনুসারে ডেনরা কোন দুর্গ বা সেনাবাহিনী শ্রীরামপুরে রাখার অধিকারী ছিল না। তারা নিষ্ঠার সঙ্গে ফরমানের শর্ত এদেশে পালন করেছিল। সম্ভবতঃ সেনাবাহিনী বা দুর্গ না থাকার জন্যই ডেনরা ছিল এদেশে বিদেশীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বল। ইংরেজ বা নবাব কোন পক্ষের আক্রমণই তারা ঠেকাতে পারেনি। ১৭৫৬ সালে মুর্শিদাবাদের নবাব কলকাতা অবরোধ করেন। তিনি ডেন ও অন্যান্য বিদেশীদের নির্দেশ দেন ইংরেজ দমনে সৈন্য, কামান, অশ্ব দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে। ডেনদের সৈন্য, কামান বা অশ্ব ছিল না। নবাব এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। দেশে ফেরার পথে তিনি ডেন, পর্তুগীজ ও জার্মানদের (এম্বডেনার) তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে বলেন। নবাবী নির্দেশনামায় ডেনদের কাছে ২৫ হাজার, পর্তুগীজদের কাছে ৫ হাজার ও জার্মানদের কাছে ৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়। এত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা অবশ্য কারোর ছিল না।

ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে এদেশে ইংরেজরা চন্দননগরের ফরাসি ঘাঁটি আক্রমণ করে। সে সময় বহু ফরাসি নর-নারী শ্রীরামপুরে ডেনদের কাছে আশ্রয় নেয়। পর্তুগীজ ও ডাচরাও নিজেদের নিরাপত্তার জন্য শ্রীরামপুরে চলে আসে। কিন্তু ইংরেজদের ধারণা হয়, ডেনরা শ্রীরামপুরে ফরাসি সৈন্যদের আশ্রয় দিয়েছে। তারা শ্রীরামপুর অবরোধ করে (২২শে সেপ্টেম্বর, ১৭৫৮)। যাই হোক, সেখানে কোন ফরাসি সৈন্যের সন্ধান না পেয়ে শেষ পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়। তবু ইংরেজদের সন্দেহের অবসান ঘটেনি। ফরাসিদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে ইংরেজরা "কিং-অব-ডেনমার্ক" নামক একটি জাহাজ আটক করে রাখে। এই শর্তে জাহাজটিকে মুক্ত করা হয় যে, জাহাজটির গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত একটি বৃটিশ জাহাজ সঙ্গে যাবে।

১৭৬২ সালে ডেনঘাঁটির চীফ নিযুক্ত হন ডি. মার্চেস। পূর্বে ইনি ডাচ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে কাজ করেছিলেন; কিন্তু জাতিতে ছিলেন ফরাসি। তাঁর সময়ে কয়েকজন ইংরেজ সৈন্য কলকাতা থেকে ঘেরিটি যাওয়ার পথে শ্রীরামপুরে আসে। সেখানে কয়েকজন স্থানীয় নাগরিকের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যদের বচসা হয়। শহরের শেরিফ ইংরেজ সৈন্যদলের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে বেত্রাঘাতের আদেশ দেন। রেগে আগুন হয়ে কলকাতা থেকে মেজর এডামস্ ছ'শো সৈন্য নিয়ে শ্রীরামপুর আক্রমণ করলেন। যাই হোক ডেন বিচারক ও চীফ ক্ষমা প্রার্থনা করায় ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয়।

১৭৭৭ সালে ডেনিস এশিয়াটিক কোম্পানির ভারতস্থ ঘাঁটিগুলির অধিকার ডেনমার্কের রাজার নিকট হস্তান্তরিত হয়। ফলে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হতে শুরু করে। শ্রীরামপুরে প্রথম ডেন রাজপ্রতিনিধি হন মিঃ ওলবাই।

শ্রীরামপুরে ডেনদের নিজস্ব উদ্যোগে বাণিজ্য তেমন প্রসারলাভ করেনি কোনদিন। ইংলিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি যদিও এদেশে ১৮১৩ পর্যন্ত একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারী ছিল, তথাপি কোম্পানির কর্মচারীরা নিয়মভঙ্গ করে ব্যক্তিগতভাবে বাণিজ্য করে বিপুল অর্থ উপার্জন করতেন। ইংরেজ কর্মচারীদের আইন ফাঁকি দেওয়ার কাজে শ্রীরামপুরের ডেন কোম্পানির কর্মচারীরা সাহায্য করে প্রভূত অর্থের অধিকারী হতেন।

১৮১৩ সালে ইংলিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় প্রত্যেক ইংরেজই স্বাধীনভাবে বৃটিশ ভারতে বাণিজ্য করার সুযোগ পায়। ফলে শ্রীরামপুরের ডেনদের সাহায্য নেওয়ার আর দরকার হয় না।

ইংলণ্ড ১৭৮০ সালে ফ্রান্স, স্পেন ও হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে বঙ্গোপসাগরে বাংলার প্রবেশদ্বারে ফরাসি ও ডাচ নৌবহর ঘোরাফেরা শুরু করে দেয়। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সে সময় ইংরেজ কোম্পানিকেও ডেন জাহাজ ভাড়া করে ডেনিশ পতাকা উড়িয়ে মাল আমদানী রপ্তানী করতে হত। এর ফলেও শ্রীরামপুরে ডেন কোম্পানির আয় বৃদ্ধি পেত। ১৭৮৪ সালে মাত্র নয় মাসে শ্রীরামপুর থেকে ২২টি জাহাজ বিদেশে রপ্তানী হয়েছে সে সময়।

কলকাতায় ঋণ করে পাওনাদারদের ফাঁকি দেওয়ার মতলবে বহু বৃটিশ প্রজা শ্রীরামপুরে আশ্রয় নিত। ১৮৩০ সালে ডেনরা দেনদারদের আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করে। অবশ্য এর এক বছর আগেই বৃটিশ ভারতে ইনসলভেন্সি কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল। ফলে বৃটিশ ভারতের পাওনাদারদের আর শ্রীরামপুরে পালাতে হত না।

শ্রীরামপুরের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিল বস্ত্র। কিন্তু আঠারো শতকের শেষ দিকে ম্যাঞ্চেস্টারের কৌশলী প্রতিযোগিতার কাছে এদেশের বস্ত্রশিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ফলে শ্রীরামপুরের রপ্তানী বাণিজ্যেও ক্রমাগত ঘাটতি দেখা দিতে থাকে।

১৮৪৫ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী ডেন সম্রাট শ্রীরামপুরসহ ভারতের অন্যান্য ডেনঘাঁটিগুলি বৃটিশ সরকারের কাছে হস্তান্তরিত করেন।

কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেনদের গুরুত্ব ব্যবসা-বানিজ্য বা রাজনৈতিক কারণে নয়। শ্রীরামপুর মিশনই এদেশে ডেনদের স্মৃতিকে অম্লান রাখার পক্ষে যথেষ্ট

বিদেশী বণিক-ঘাঁটিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্বলের আশ্রয়ে লালিত হয়েও শ্রীরামপুর মিশন এদেশে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ঐতিহ্যবান।

১৮০০ সালে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হয়। ১৮১৮ সালে স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর মিশন কলেজ। বাংলা অভিধান প্রণয়ন, মুদ্রণের জন্য বাংলা হরফ সৃষ্টি, বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ, প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল মুদ্রণ ইত্যাদি বহুক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন ও প্রেস পুরোধা। সেখানকার ডেনিশ গভর্ণর ও ডেন সম্রাট্ শ্রীরামপুর মিশন ও কলেজের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ডেন সম্রাট পূর্বোক্ত মিশনারীত্রয়ের কর্মপ্রচেষ্টায় খুশী হয়ে স্বহস্তে তাঁদের প্রশংসাসূচক চিঠি লেখেন ও তিনটি স্বর্ণপদক পাঠিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৮২৭ সালে ডেন সম্রাট্ প্রদত্ত সনদবলে শ্রীরামপুর কলেজ ডিগ্রীদানের অধিকারী হয়। এশিয়ায় কোন কলেজে আধুনিক রীতিতে ডিগ্রীদানের ব্যবস্থা এখানেই সর্বপ্রথম।

জার্মান

ইংরেজ ও ডাচ উভয় সম্প্রদায়েরই চক্ষুশূল ছিল জার্মান কোম্পানি। পলাশী যুদ্ধের বহু আগেই তারা বাংলায় আসে ও বাঁকিবাজারে ঘাঁটি স্থাপন করে। স্বয়ং নবাব তাদের বাণিজ্যের অনুমতি দেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাদের ব্যবসায়িক সাফল্য ইংরেজ ও ডাচদের ঈর্ষার কারণ হয়। ইওরোপে ফিরে তারা জার্মানদের বিরুদ্ধে এমন অপপ্রচার চালায় যে, জার্মানদের বাণিজ্যিক সনদ বাতিল করে দেওয়া হয়। সনদ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও বাংলা দেশে প্রাশিয়ানরা স্বদেশের তোয়াক্কা না রেখে বাণিজ্য চালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু এখানেও ইংরেজ ও ডাচদের শ্যেনচক্ষু সতর্ক ছিল। তারা নবাবকে ক্রমাগত প্রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে থাকে। ১৭৩৩ সালে হুগলির ফৌজদার বাঁকিবাজার অবরোধ করে প্রাশিয়ানদের সামান্য ঘাঁটি চূর্ণ করে দেন। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও জার্মানরা কেউ আত্মসমর্পণ করেনি। জার্মান এজেন্টের একখানি হাত কামানের গোলায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তা সত্ত্বেও অসমসাহসিকতার সঙ্গে তিনি সহকর্মীদের লড়াই চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করেন। সারাদিন তারা আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম চালায় এবং রাত্রির অন্ধকারে নৌকাযোগে পলায়ন করে। জার্মানদের পলায়নের সংবাদ পৌছানর পর কলকাতার ইংরেজ শিবিরে আনন্দোৎসব হয়েছিল।

এ ঘটনা পলাশী যুদ্ধের বহু পূর্বের। ব্যবসায়ীকে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায়

পরাস্ত করতে না পেরে ইংরেজ কোম্পানি রাজশক্তির সাহায্যে পরাস্ত করে উল্লসিত হয়েছিল। সে দেশের ইতিহাসে এটা নূতন কোন ঘটনা নয়।

১৭৫১ সালে জার্মানরা বাংলাদেশে আবার ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করে। এবারও ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাদের এই উদ্যোগ বন্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। বোর্ড নির্দেশ জারি করলেন—"এম্বডেন থেকে আগত আলামানদের (জার্মান) কোন জাহাজকে কোন ইংরেজ পাইলট পথ দেখিয়ে আনতে পারবে না। যদি কোন ডাচ বা ফরাসি পাইলট জার্মান জাহাজকে পথ প্রদর্শন করতে চেষ্টা করে, তবে সেই জাহাজগুলিকে যেন ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়।"*(১)

১৭৫৭ সালে কোম্পানির লণ্ডনস্থ কোর্টের নির্দেশ—জার্মানদের সঙ্গে যেন কোনও রকম বাণিজ্যিক লেন-দেন না হয়।

১৭৬৩ সালের ৯ই মার্চ তারিখে লণ্ডনস্থ কোর্ট প্রাশিয়ানদের সঙ্গেও বাণিজ্যিক লেন-দেন না করার নির্দেশ দেন।

পলাশী যুদ্ধের ত্রিশ বছর পর রেনেল হুগলি নদীর যে মানচিত্র রচনা করেন তাতে "প্রাশিয়ান গার্ডেন এম্বডেন কোম্পানি" নামে চন্দননগরের পার্শ্ববর্তী একটি স্থান চিহ্নিত হয়েছে।

রাশিয়ান

বাংলায় রাশিয়ানদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৬৩ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে লণ্ডনস্থ কোর্ট প্রেরিত একখানি চিঠিতে। তদানীন্তন রুশ-সম্রাজ্ঞী বৃটিশ সরকারের কাছে অনুরোধ করেন—"কয়েকজন রুশ নৌ-অফিসারকে বৃটিশ জাহাজে অবস্থানের দ্বারা নৌ-বিদ্যায় উচ্চতর জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থা করতে" (···in order to their perfecting themselves in the science and business of navigation)। তদনুসারে তদানীন্তন বৃটিশ সেক্রেটারী অব স্টেট লর্ড হ্যালিফ্যাক্স কোম্পানিকে অনুরোধ করেন ঐ রুশ অফিসারদের ভারতে নিয়ে যেতে।

"Earl of Halifax by the Royal command has signified to us that it will be very agreeable to His Majesty to permit the said six

*(১) "·········on no account to take charge of or show the way to any allaman, no doubt but the French and Dutch would do the same. God forbid, but should this be the case, I am in hopes they will be either sunk, broke or destroyed."—Unpublished Records. (Long)

Russian officers to make the voyage to India and back on board. The Commanders of the ships BRITISH KING, bound to the coast and bay, and the TALBOT and the SPEAKER for Bombay, each of them to receive here of the said officer on board, to afford them all proper accomodations and use them civilly, they having satisfied the said commanders for the same."—Uupublished Records. (Long)

সম্প্রতি প্রকাশিত নথিপত্রে দেখা যায় ঐ রুশ নাবিকেরা কলকাতায় এসেছিলেন এবং ক্যাপ্টেন পিগুর পরামর্শক্রমে 'পিগট' জাহাজ যোগে তাদের ইওরোপে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। (লণ্ডনে কোর্টের কাছে প্রেরিত কলকাতা বোর্ডের ১৯শে মার্চ, ১৭৬৪ তারিখের চিঠি)।

আঠারো শতকে ভারতে আগন্তুক রাশিয়ানদের মধ্যে হেরাশিম লেবেডেফের নাম একাধিক কারণে স্মরণীয়। বাংলা নাটক অভিনয়ে, দেশী ভাষা, প্রাচীন বাংলা কাব্য ও সমাজ সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি পথিকৃৎ। ১৭৮৭ থেকে ১৭৯৭ পর্যন্ত তিনি কলকাতায় ছিলেন। দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, বিশ্বাসঘাতকতার বলি হয়ে এত দীর্ঘদিন কলকাতায় আর কোন রাশিয়ান পরবর্তীকালেও বোধ হয় বাস করেনি।

আঠারো শতকের শেষ দিকে কলকাতায় আসেন রুশ নাবিক, আই-এফ খ্‌ জেনস্টার্ণ। দেশে ফিরে রুশ-ভারত বাণিজ্য-সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তিনি রুশ-সম্রাট পাভেলের কাছে দাখিল করেন। এফ-ই-ফ্রিমভ ছিলেন কিরভের এক যাজক-পুত্র। মধ্য এশিয়ার মধ্য দিয়ে তিনি ভারতে আসেন কাজাকীস্থানী রাজার অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য। কলকাতাতেও তিনি ১৭৮১ তে এসেছিলেন, পরে স্বদেশে ফিরে যান। ১৭৯৪ সালে তাঁর ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রাফায়েল দানিবেগফ জর্জিয়ান জারের দূত হিসাবে ১৭৯৫ সালে ভারতে আসেন ও দীর্ঘ ১৭ বৎসর এদেশে অতিবাহিত করেন। তিনিও কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনীও রুশভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

জলপথে এদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রাশিয়ানরা বহুদিন থেকেই চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইংরেজদের শ্যেনচক্ষু এড়িয়ে সে চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হতে পারেনি। ১৯০৮ সালে ভ্লাডিভস্টক থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রথম জাহাজ চলাচল শুরু হয়। জাহাজটির নাম নিজনি নভগোরড।

প্রাচ্যতত্ত্বজ্ঞানান্বেষীদের মধ্যে প্রথম ভারতে আসেন ইভান পাভলোভিচ মিনায়েভ। তিনি ১৮৭৪-৮৬ মধ্যে ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও নেপাল সফর করেন। কলকাতায় অবস্থানকালে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শরচ্চন্দ্র দাস, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

গ্রীক

আলোচ্য-কালের মধ্যে গ্রীকদের ভূমিকা একেবারেই নগণ্য। তারা নিজেরা ছিল অতি ক্ষুদ্র ব্যবসাদার। ইংরেজরা তাদের ঠাট্টা করে বলত ফেরীওয়ালা। ১৭৫০ সালে প্রথম যে গ্রীক বাংলায় আসেন, তাঁর আদি নিবাস ফিলিপ্পোলিস, নাম—আলেক্সিও আরগিরি। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আরও বহু গ্রীক বাংলা দেশে আসে। নিজেদের ঘাঁটি নেই, সনদের জোর নেই, কাজেই কখনও ফরাসি কখনও ইংরেজদের পদাশ্রিত হয়ে তাঁরা থাকতেন। ক্যাপ্টেন থর্ণহিল যখন মিশরের দৌত্য করতে যান তখন তাঁর দোভাষী হয়ে কাজ করেন আরগিরি। তাঁর কাজে খুশী হয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস আরগিরিকে কলকাতায় গ্রীক চার্চ স্থাপনের অনুমতি দেন এবং নিজেও দু' হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করেন। ১৭৭৭ সালে আরগিরির মৃত্যুকালে গ্রীকরা বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সরাসরি আলেকজান্দ্রিয়া থেকে পাদ্রী আনাবার গৌরবে তারা ছিল গর্বিত।

কিন্তু গ্রীকরা এদেশে বাঁচেনি। ধর্মের দিক থেকে তারা ছিল রক্ষণশীল। এদেশীয় কোন নরনারীকে তারা ধর্মান্তরিত করেনি। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক শক্তি প্রবল না হলে আত্মস্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ফলে কালক্রমে এদেশের ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরেশিয়ানদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় তারা অসংখ্যের মধ্যে হারিয়ে গেল। বিশ শতকের সূচনায় কলকাতায় যে সব গ্রীক সওদাগরি প্রতিষ্ঠানকে দেখা গিয়েছিল, তাদের উৎপত্তি পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ নূতনসূত্রে হয়েছিল।

আর্মেনিয়ান

ধর্মে গ্রীকদের মত রক্ষণশীল ও সংখ্যায় তাদের মতই অল্প হওয়া সত্ত্বেও আর্মেনিয়ানরা বাংলা দেশেতো বটেই, সারা ভারতে নিজেদের অস্তিত্ব আজও রক্ষা করে চলেছে। ইওরোপীয়দের মধ্যে আর্মেনিয়ানরাই এদেশে প্রথম আগন্তুক। একদা উদ্বাস্তু এই গোষ্ঠী-স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় জাতি বাংলার বাণিজ্যের ও শিল্পোন্নয়নের যে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তার সত্যমূল্য আজও নির্ধারিত হয়নি। এর সম্ভবপর দুটি কারণ—আর্মেনিয়ানদের চোখে কোন দিন বৃহৎ কোন স্বপ্ন ছিল না। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত মানুষের পক্ষে বিদেশে নিছক অস্তিত্ব রক্ষার বেশী আর কোন বাসনা না থাকাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করার পর ইংরেজরাও এদের গতিবিধি সন্দিগ্ধচোখে দেখেছে এবং এদের যে-কোন উন্নতির মূলে সবলে কুঠারাঘাত করে অস্তিত্ব বিপন্ন করতে দ্বিধা করেনি। আর্মেনিয়ানরা আঠারো শতকে কেবল ভীরু কপোতের ন্যায় আত্মরক্ষার্থে ছুটে বেড়িয়েছে। কখনও নবাবের দরবারে করজোড়ে বিচারপ্রার্থী, কখনও ফরাসী শিবিরে শরণার্থী, কখনও ইংরেজ শিবিরে নজরবন্দী। কোম্পানির নথি ও ইংরেজ শাসকদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে আর্মেনিয়ানরা সুবিধাবাদী, জুয়াচোর ও ধূর্তরূপে চিত্রিত। ইংরেজদের প্রবল অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ এরা পায়নি, এবং নিরুপদ্রব জীবনযাত্রায় অভিলাষী হওয়ায় শাসক ইংরেজসম্প্রদায়ের কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল কোন প্রতিবাদও তারা জানায়নি। এদেশে আজও আর্মেনিয়ানরা ঘোরতর রক্ষণশীল, তাদের বক্তব্য লিখিত ভাবে কোন ডায়েরী, চিঠি বা পুস্তকে থাকলে তা আছে তাদের মাতৃভাষায়। আমার জানা নেই।

ফরাসি

ফরাসিদের ভারত আগমন, সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা, ইংরেজদের সঙ্গে তাদের সংগ্রাম ইত্যাদি ঘটনা সর্বজনবিদিত। ইংরেজদের আগে তারা ভারতে আসে এবং ইংরেজদের পরে তারা ভারত ছেড়ে চলে যায়। বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংরেজদের মত ফরাসিরা তেমন বেপরোয়া ছিল না এবং তাদের আর্থিক সঙ্গতিও ভাল ছিল না। ডুপ্লে চেষ্টা করেছেন অনেক, শেষ পর্যন্ত দায়ী করেছেন সর্বনাশা দারিদ্র্যকে। ১৭৫৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি ডুপ্লে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বেকনফোর্টকে যে চিঠি দেন, তাতে অবস্থার ব্যাখ্যা করা হয়েছে সুন্দরভাবে :

"Private trade could easily be developed here, but, so long as the Company sends out beggars as employees and officers who have not a shirt put on their backs, commerce will languish and the colonies will survive only with difficulty."

পক্ষান্তরে ইংরেজদের অর্থ-সাচ্ছল্য, টাকা বিনিয়োগের ক্ষমতার তিনি প্রশংসা

করেছেন। কিন্তু ইংরেজদের রাজনৈতিক অধিকার লাভ ছিল ফরাসিদের চক্ষুশূল। ভারতে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে মাত্র একটি থাকবে। দুটির সহাবস্থান অসম্ভব। "Two swords cannot be in one sheath."

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছাড়াও আর এক ইংরেজ কোম্পানি বাংলা দেশে বাণিজ্য করার চেষ্টা করে। ইম্পিরিয়াল ওসটেণ্ড কোম্পানি ১৭২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাঁকিপুরে তাদের আড়ৎ ছিল। কিন্তু কলকাতায় তারা প্রবেশ করতে পারেনি। পলাশী যুদ্ধের পরেও বহুকাল এই কোম্পানি ও তার ঘাঁটির অস্তিত্ব ছিল। নিছক অস্তিত্ব, তার বেশী নয়।*২

আমেরিকা

পলাশী যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও স্বাধীন দেশ নয়। স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ১৭৮৭ সালে মার্কিন কংগ্রেসে গৃহীত হলেও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত 'আমেরিকান' নামে কোন সুসংহত জাতির উৎপত্তি হয়নি। ফলে উনিশ শতকেও বিচ্ছিন্নভাবে যে সব পর্যটক বা নাবিক ভারতে এসেছে, তাদের মুখ্য পরিচয় ছিল ইংরেজ বা ফরাসি, আমেরিকান নয়। ফরেষ্ট অবশ্য তাঁর সম্পাদিত ক্লাইভের জীবনীতে ও তাঁরই জবানীতে আঠারো শতকে বাংলায় আগত বিদেশীদের মধ্যে আমেরিকানদের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাদের কোন পরিচয় দেননি। ভারত থেকে ইংরেজদের কেউ কেউ আমেরিকায় রওনা হয়ে উত্তর জীবন সেখানেই কাটিয়েছে, এমন নজিরও আছে। নূতন মহাদেশের অনাস্বাদিত অনাহৃত বিপুল সম্পদ পায়ে ঠেলে ভারতে আসার সার্থকতাই বা কি?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হবার আগে সেখান থেকে ভারতে ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলেন এমন নাম অন্ততঃ একটি পাওয়া যায়। আমেরিকার অগ্রগণ্য শিক্ষায়তন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় যাঁর নামাঙ্কিত, সেই মিঃ ইয়েল যৌবনে ১৬৭২ সালে ভারতে আসেন ভাগ্যান্বেষণে। তাঁর বাবাও ইংলণ্ড ছেড়ে একদা নিউইংলণ্ডে গিয়েছিলেন একই উদ্দেশ্যে। মাদ্রাজে সামান্য রাইটাররূপে জীবন শুরু করে মিঃ ইয়েল সেখানকার গভর্ণর হন ও বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যান। কানেক্টিকাটের একটি দুঃস্থ বিদ্যালয়কে তিনি কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। আবার এর

---

*২ Ostend Company—Vassals—Balance of Power. P—7083

বিপরীতটাও ঘটেছে। শ্রীরামপুর মিশন কলেজের ঘোরতর দুর্দিনে পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়েছিলেন অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। নিরাশ হননি তিনি। ভারতবর্ষের ধর্মাচরণ ও সমাজজীবন সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮১০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীরামপুর মিশন পত্তনের সময়ও (১৭৯৯) ওয়ার্ড মার্শম্যান, ব্রান্সডন ও গ্র্যাণ্ট যে জাহাজে ভারতে আসেন সেটি মার্কিন জাহাজ, নাম 'ক্রাইটেরিয়ান'। বাংলা দেশের সঙ্গে মার্কিন দেশের এরকম পরোক্ষ যোগাযোগের এটাই বোধ হয় প্রথম ঘটনা। লর্ড কর্ণওয়ালিশ আমেরিকায় ছিলেন ও সেখানকার স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। বৃটিশ সরকারের স্বপক্ষে তিনি যে "অসামান্য বীরত্বের" পরিচয় দিয়েছিলেন তারই পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে ভারতে গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা বোধ হয় অন্যরকম। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনে কর্ণওয়ালিশের অংশগ্রহণের কথা এদেশে গোপন রাখা হয়েছিল। সম্ভবতঃ ভারতবাসীর মনেও স্বাধীনতা সংগ্রামের স্পৃহা জাগ্রত হতে পারে এমন আশঙ্কায়। আর আমেরিকায় তাঁর কাপুরুষোচিত ভূমিকা ভারত শাসনের পক্ষে অন্তরায় হতে পারে এমন ধারণা থাকাও অসম্ভব নয়।

উনিশ শতকে আমেরিকান জাহাজ ব্যাপকভাবে কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য বন্দরে নোঙর করতে থাকে। আমেরিকান জাহাজী ব্যবসা এদেশে এতই বিস্তার-লাভ করে যে বৃটিশ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেন। বোস্টনের সঙ্গে কলকাতার বাণিজ্যিক সম্পর্ক উভয় দেশকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় করে তুলেছিল। কলকাতায় প্রথম কৃত্রিম বরফ আমদানী হয় মার্কিন জাহাজে। ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসিদের ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার রাশিয়ানদের মনেও ঈর্ষার উদ্রেক করে। আমেরিকানরাও বিদেশে বাণিজ্য করতে গিয়ে ইংরেজদের কাছে বাধা পায়। উনিশ শতকের সূচনায় সেজন্য রাশিয়ান-আমেরিকান কোম্পানি নামক একটি যৌথ কোম্পানি গঠিত হয় ভারত ও পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে।

উনিশ শতকে ব্যবসায় সূত্রে রামদুলাল সরকারের সঙ্গে যেমন মার্কিন ব্যবসায়ীদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়, ধর্মসূত্রেও রাজা রামমোহনের সঙ্গে সেদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় ছিল। বস্তুতঃ রাজার বিভিন্ন বক্তৃতা উনিশ শতকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্ট মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে সম্ভবতঃ মার্ক টোয়েনই প্রথম কলকাতায় আসেন।

বিদেশীদের চোখে বঙ্গ-মনীষী

গত শতকের বাঙালী মনীষীদের সম্পর্কে আমরা মাত্রাতিরিক্ত উচ্চকণ্ঠ, কিন্তু সমসাময়িক বিদেশীদের রচনায় তাঁদের কথা আশ্চর্যরকম অনুচ্চারিত। বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় উন্নাসিকতা ত্যাগ করে বাঙালীর অন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করেনি। আর পর্যটকদের মধ্যেও বেশির ভাগ কেবল চোখ দিয়ে দেশ দেখেছেন, তাঁরা হৃদয়-সংবাদী ছিলেন না। শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজন সংবেদনশীল চিত্তের। বণিক বা শাসকদের মধ্যে উদার স্বার্থরহিত সংবেদনশীল মন আশা করা যায় না। বিশপ হেবার ব্যতিক্রমদের একজন। সেজন্যই, রাজা রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে তীব্র মতভেদ সত্ত্বেও বিশপ তাঁর ডায়েরিতে রাজার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

লর্ড হেস্টিংস ভারত ছেড়ে চলে যাবেন। তাঁকে বিদায়-সম্বর্ধনাকালে যে মানপত্র দেওয়া হবে তারই খসড়া নিয়ে এক সভায় আলোচনা চলছিল। রাজা রাধাকান্ত সভায় প্রস্তাব করে বসলেন,—হেস্টিংস সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করেছেন, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ না করে তাকে সযত্নে রক্ষার জন্য যে উৎসাহ দিয়েছেন, তজ্জন্যই তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া হোক। রাজা জানতেন তাঁর প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে। কারণ সভায় উপস্থিত ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে প্রায় সকলেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও সংস্কারমুক্ত। তবু রাজা রাধাকান্ত নিজ বিশ্বাস অকপটে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। হেবার রাজার রক্ষণশীলতা অপছন্দ করতেন, তবু রাজার এই বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন।

আর একটি ঘটনা। হেবারের জন্মদিনে রাজা রাধাকান্ত এসেছিলেন সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রালের বাড়িতে। লেডী আমহার্স্ট সহ কয়েকজন মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে হরিমোহন ঠাকুর মেয়েদের উপস্থিতির বিষয়ে মন্তব্য করলেন।

হেবার বললেন,—এতে অবাক হবার কী আছে? মুসলমান-আগমনের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দুনারীরাও অবাধে সর্বত্র পুরুষদের সহযাত্রী হত। তখন তো কোন পর্দাপ্রথা ছিল না।

রাজা রাধাকান্ত বুঝলেন বিশপ তাঁর প্রতিই কটাক্ষ করছেন। রাজা নিজে পর্দাপ্রথার পক্ষপাতী। কিন্তু নিঃশব্দে কিল হজম করার পাত্র তিনি নন। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—হ্যাঁ, একথা ঠিক যে, মুসলমান আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মহিলাদের আমরা

অন্দরে আবদ্ধ করে রাখিনি। কিন্তু মহিলাদের এখন সেই স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হলে উপযুক্ত শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করতে হবে।

দ্বারকানাথ

সেকালের অভিজাত মহলে দ্বারকানাথ ঠাকুর নামটিই ছিল রোমান্টিক। তিনি সাগরপারে যাবার অনেক আগেই তাঁর খ্যাতি ও আভিজাত্যের কথা সে দেশে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল।

ফ্যানি পার্কস কলকাতায় এসে শুনলেন দ্বারকানাথ প্যাবিস যাচ্ছেন। শোনামাত্রই তাঁর মন-ভ্রমর গুঞ্জন তুলল। অবশ্য অকারণ নয়। পশ্চিমী নারীব মন নিয়ে এই ইণ্ডিয়ান প্রিন্সকে তিনি দেখেছেন।

স্মৃতিকথায় পার্কস লিখেছেন :

"দ্বারকানাথ দু' বছরের জন্য ইউরোপ যাচ্ছেন। ফ্রান্সের রাজাব সঙ্গেও তিনি সাক্ষাৎ করবেন। যে চুম্বকেব আকর্ষণে প্রাচ্যেব এই জ্ঞানী পুরুষটি যাচ্ছেন তা হল সেখানকার নর্তকীদের রূপ-লাবণ্য। তিনি বলেছেন, বিশ্বের সেরা সুন্দরী তিনশো নর্তকী শোভিত প্যারিস অপেরা তিনি দেখবেন। এ ব্যাপারে বাবুটি বেশ পাকা লোক।"

দ্বারকানাথ প্যারিসের সুন্দরীদের নাচ দেখেছিলেন—এ কথা ঠিক, কিন্তু নিজ আভিজাত্যবোধ বিসর্জন দিয়ে নয়। পরন্তু প্যারিসের রাজনর্তকীদের প্রতি তাঁর আচরণ সারা ভারতের রাজন্যবর্গকে ইউরোপেব সামনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিল। সে-কথা লিখেছেন ম্যাক্সমূলর :

"প্যারিসে অবস্থানকালে দ্বারকানাথ প্রাচ্যের খাঁটি আভিজাত্য বজায় রেখেছিলেন। এক সান্ধ্য মজলিসে স্বয়ং সম্রাট লুই ফিলিপ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। তদানীন্তন ফরাসি মহিলাদের যা ছিল সর্বাপেক্ষা কাম্যবস্তু, সেই ভারতীয় শাল দিয়ে সভাকক্ষ সাজানো হয়েছিল এবং সভাশেষে মহিলারা যখন একে একে বিদায় নিলেন, তখন তাঁদের প্রত্যেকের গায়ে একটি করে শাল তিনি পরিয়ে দিলেন।" .

ইণ্ডিয়ান প্রিন্সদের প্রতি পরবর্তীকালে ইউরোপীয় নারীদেব যে মোহময় দৃষ্টি এবং সাধারণভাবে ইউরোপীয় সমাজের যে সশ্রদ্ধ ঔৎসুক্য জেগেছিল, ফ্রান্সের রাজদরবারে দ্বারকানাথের শাল-বিতরণ তার জন্য অনেকটা দায়ী।

ম্যাক্সমূলর কোনদিন ভারতে আসেননি, অথচ সারা ইউরোপে তাঁর সমপর্যায়ভুক্ত ভারততত্ত্ববিদ্ সম্ভবত পরবর্তীকালেও জন্মগ্রহণ করেননি। বেদ-উপনিষদ পুনরুদ্ধার ও টীকাটিপ্পনীসহ মুদ্রণের প্রথম উদ্যোগ তাঁরই। তিনি হিন্দু নন, কিন্তু তবুও রাজা রাধাকান্তের ন্যায় রক্ষণশীল হিন্দু তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের দান গ্রহণের জন্য অন্যতম সৎ-ব্রাহ্মণ হিসাবে ম্যাক্সমূলরকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সে-কথা ম্যাক্সমূলর তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন। তদানীন্তন ভারতের প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট পণ্ডিত ও সমাজ-সংস্কারকের সঙ্গেই ম্যাক্সমূলরের পত্রযোগে আলাপ ছিল। কিন্তু চাক্ষুষ আলাপ-পরিচয় হয়েছিল কেবল দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ইউরোপে।

দ্বারকানাথ সম্পর্কে ম্যাক্সমূলর অনেক কথা লিখেছেন। ইউরোপে তাঁদের দুজনের পরিচয় হয় এবং প্রথম দর্শনেই ম্যাক্সমূলর মুগ্ধ হন। বোধহয় বহুদিন পর 'অল্ড ল্যাং সাইন' রচনাকালেও সেই বিস্ময়বিমুগ্ধতার ঘোর কাটেনি। লিখেছেন:

"পঞ্চাশ বছর আগে ভারতীয়রা এখনকার মত অবাধে বিদেশ ভ্রমণ করত না। কালাপানি পার হওয়ার জন্য সামাজিক শাস্তির ভীতি তখনও দূর হয়নি। কাজেই ১৮৪৪ সালে যখন প্যারিসে সত্যই একজন খাঁটি হিন্দুকে দেখা গেল, তখন স্বভাবতই হৈ-চৈ পড়ে গেল। আমারও তাঁর সঙ্গে আলাপ করার প্রবল বাসনা হয়। এমনিতেই তিনি সুদর্শন, তার উপর যখন তিনি প্যারিসের সেরা হোটেলের সেরা কামরা ভাড়া করলেন, তখন ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পেল আরও। আমি সে সময় কলেজ-ডি-ফ্রান্সে অধ্যাপক বার্ণফের বক্তৃতা শুনতে যাই। একদিন যখন এই ভারতীয় পরিচয়-পত্রসহ অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন আমার সঙ্গেও পরিচয় হল। তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেও দেরি হল না। ভারতের এক মহৎ ও ধনী পরিবারের মুখপাত্র এই দ্বারকানাথ, যাঁর ছেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আজও জীবিত এবং পৌত্র প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সত্যেন্দ্রনাথকে ছাত্রাবস্থায় ইংলণ্ডে দেখেছি, পরে সাফল্যের সঙ্গে দেশ ও সরকারের সেবা করে এখন অবসর গ্রহণ করেছে।

"দ্বারকানাথ সংস্কৃত পণ্ডিত নন বটে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অপরিচয় ছিল না। প্রথমবার তাঁকে আমি দেখি ইন্‌স্টিট্যুট দ্য ফ্রান্সে। সেখানে অধ্যাপক বার্ণফ তাঁকে তাঁর নিজ সম্পাদিত ভাগবত পুরাণের এক খণ্ড উপহার দেন। এই গ্রন্থের একদিকে ছিল মূল সংস্কৃত, অপর দিকে ছিল তার ফরাসি অনুবাদ। আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, দ্বারকানাথ তাঁর নরম বাদামি আঙুল দিয়ে বইটির সাদা পাতা উল্টে চলেছেন আর আক্ষেপ করে বলছেন, "আহা! আমি যদি পড়তে পারতাম!"

একথা শুনে কেউ হয়তো ভাবছেন দ্বারকানাথ তাঁর নিজ দেশের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত না জানার জন্য আক্ষেপ করছেন। মোটেই তা নয়। আরও ভাল ফরাসি ভাষা না জানার জন্যই তাঁর আক্ষেপ।

"তিনি আদৌ প্রাচীনপন্থী ছিলেন না। নিজ ধর্ম বা তাঁদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সেই প্রাচীন ভাষার ছাত্রও ছিলেন না। কিন্তু অধ্যাপক বার্ণফ যখন তাঁকে আমার উদ্দেশ্যের কথা জানালেন, এবং কিভাবে প্যারিস থেকে বেদেব মূল পাণ্ডুলিপি কপি করে টীকা সন্নিবেশের চেষ্টা করেছি সে কথা জানালেন, তখন দ্বারকানাথ গভীর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তারপর পেলাম তাঁর নিমন্ত্রণ। প্রায়ই সকাল বেলা আমরা একত্রে ভাবত ও ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতাম।

"আশ্চর্যেব কথা, সঙ্গীতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন তদ্গতপ্রাণ, এমনকি ফরাসি ও ইতালিয়ান সঙ্গীতেও তাঁর দখল ছিল। একদিন আমায় নিযে তিনি পিযানোব কাছে এগোলেন। দেখি, কেবল যে তাঁব গলার স্বর সুমিষ্ট তা নয়, শুনলেই বোঝা যায় সঙ্গীতে তালিম নেওয়া গলা তাঁব। আমাদেব দু'জনেরই সময ভাল কাটল। তাঁর ইতালিয়ান সঙ্গীতের প্রশংসা কবে একদিন তাঁকে খাঁটি ভারতীয় সঙ্গীত শোনাবাব জন্য অনুরোধ কবলাম। প্রথমে তিনি আমায় ভারতীয় সঙ্গীতের নামে যা শোনালেন আসলে সেটা পার্শি গান, সে-গানেব কোন বৈশিষ্ট্য নেই। ঠিক এরকম গান আমি শুনতে চাইনি। পুনবায় তাঁকে শুধালাম খাঁটি ভারতীয় গান তাঁর জানা আছে কিনা। হাসলেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে বললেন—'সে গানেব কিছু তুমি বুঝবে না।' কিন্তু আমি তাঁকে বার বার অনুরোধ কবলাম। আবার তিনি পিয়ানোর কাছে গেলেন। তারপর কিছুক্ষণ এলোমেলো বাজিয়ে তিনি আসল গান-বাজনা শুরু করলেন। সত্যি বলতে কি, সেই গান শুনে আমি হতাশ হয়েছিলাম। তাঁর গানের সুর, কথা বা তাল-মান কোন কিছুই বুঝলাম না। অকপটে তাঁকে সে-কথা বললাম। তিনি বললেন—'তোমরা সবাই একরকম। যদি তোমাদের কাছে কোন কিছু নতুন ঠেকে, আর প্রথমবারে যদি সেটা তোমাদের ভাল না লাগে, তবে তৎক্ষণাৎ তাকে বিদায় করে দাও। আমি কিন্তু যখন প্রথমবার ইতালিয়ান গান শুনি, আমার কাছে সেটা আদৌ গান বলে মনে হয়নি। কিন্তু হাল ছাড়িনি। যতক্ষণ ভাল না লেগেছে ক্রমাগত চেষ্টা করেছি, যাকে তোমরা উপলব্ধি বল, সেই উপলব্ধি আমার ঘটেছে। সবকিছুর সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। তোমরা বল আমাদের ধর্ম নাকি ধর্মই নয। আমাদের কবিতা আদৌ কবিতা নয়।

আমরা কিন্তু পাশ্চাত্যের যা কিছু মহৎ অবদান তাকে বুঝতে চেষ্টা করি। আমরা যেমন তোমাদের গান বুঝতে চেষ্টা করি, তোমরাও যদি সেরকম আমাদের গান বুঝতে চেষ্টা করতে, তবে দেখতে সেখানেও সুর তাল লয় ছন্দ সুষমা সবকিছু আছে, ঠিক যেমনটি তোমাদেব আছে তেমনটি আছে আমাদেরও। যদি তোমরা আমাদের ধর্ম ও দর্শন বুঝবার চেষ্টা করতে তবে বুঝতে যে, যাকে তোমরা হিদেন বল, দুষ্কৃতকারী বলে আখ্যা দাও, আমরা তা নই। সেই অজ্ঞেয়কে জানবার জন্য তোমরা যেমন চেষ্টা কর, আমরাও তাঁকে উপলব্ধির চেষ্টা করি এবং বোধ করি তোমাদের চেয়েও আমরা তাঁকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি।'

"তিনি ভুল বলেননি।

"কথা বলতে বলতে তিনি আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তাঁকে শান্ত করার জন্য বললাম যে, আমি সে-কথা ভালই জানি। আমি জানি যে ভারতের একটি সঙ্গীতবিজ্ঞান আছে এবং যতদূর মনে হয় গণিতের ভিত্তিতে সেই সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

"আমি সঙ্গীত সম্পর্কিত কয়েকটি সংস্কৃত পুঁথি একবার পরীক্ষা করেছিলাম। কিন্তু তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনি। আমি একবার এই ব্যাপারে অধ্যাপক উইলসনের সঙ্গে আলোচনাও করেছি। অধ্যাপক উইলসন দীর্ঘদিন ভারতে ছিলেন এবং নিজে সঙ্গীতজ্ঞ। তিনি আমায় তেমন উৎসাহ দিলেন না। বললেন যে, ভারতে অবস্থানকালে তিনি একজন নেটিভ সঙ্গীত শিক্ষককে পেয়েছিলেন, যে সঙ্গীত-শাস্ত্র পড়তে পারে। সে তাঁকে সঙ্গীত শেখাতেও রাজী হয়েছিল এই শর্তে যে, তাঁকে সপ্তাহে দুবার বা তিনবার তার বাড়িতে গিয়ে তালিম নিতে হবে। ছ' মাস পর সে তাঁকে জানিয়ে দেবে সত্যিই তিনি সঙ্গীত শিখতে পারবেন কিনা, অর্থাৎ যোগ্য অধিকারী কিনা সেটা জানিয়ে দেবেন। তারপর পাঁচ বছর তালিম নেওয়ার পর হয়তো তিনি মার্গ সঙ্গীতের তত্ত্ব ও গীত উভয়ই শিখতে পারবেন। কিন্তু একজন সিভিলিয়ানের পক্ষে এত কাণ্ড সম্ভব নয়। সর্বদাই তিনি কর্মব্যস্ত। সে সময় উইলসন মিণ্ট মাস্টার এবং আরও কয়েকটি সরকারী পদে বহাল ছিলেন। কাজের চাপের মধ্যে যদিও তিনি পণ্ডিতদের কাছ থেকে বহু জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তবু পাঁচ বছর সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়।

"আমার কথা শুনে দ্বারকানাথ কৌতুক বোধ করলেন। কিন্তু তিনিও বললেন প্রাচীন হিন্দু মার্গ-সঙ্গীতের অসংখ্য কলা-কৌশল রপ্ত করার পক্ষে পাঁচ বছর হল

সবচেয়ে কম সময়। অতএব আমিও "সঙ্গীত-রত্নাকর" ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ ও উপলব্ধির সকল আশা ত্যাগ করলাম, যদিও ইস্ট-ইণ্ডিয়া হাউসের এই সব গ্রন্থ বার বার আমায় প্রলুব্ধ করেছে।"

ম্যাক্সমূলর দ্বারকানাথের স্বভাব সম্পর্কেও কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন— "আমার ভারতীয় বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুব উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন বুদ্ধিমান এবং বাস্তববাদী মানুষ। ব্রাহ্মণদের তিনি একটু হীনচক্ষে দেখতেন। একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কালাপানি পার হওয়ার জন্য তাঁকে দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কিনা; তিনি হেসে জবাব দিলেন—'না, আমি বহুদিন থেকেই বহু ব্রাহ্মণকে বাড়িতে প্রতিপালন করছি। সেই তো যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত।'

"আসলে কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত বলতে বোঝায় পঞ্চগব্য সেবন, অন্যথায় সমাজে গ্রহণ করা হয় না। পঞ্চগব্য কেবল গো-দুগ্ধ, দধি বা ঘোল নয়, তৎসহ গোমূত্র ও গোময় সর্বসমক্ষে খেতে হয়। এখনও সেই প্রায়শ্চিত্ত প্রথা চালু আছে এবং যে-সব ভারতীয় এদেশে আসে তাদের অনেককেই দেশে ফিরে এই শাস্তিভোগ করতে হয়। এখন অবশ্য পঞ্চগব্য সেবনের পবিমাণ হ্রাস পেয়েছে, একটি ছোট বড়ির আকারে সামান্য একটু মুখে দিলেই চলে।

"কিন্তু ব্রাহ্মণদের তিনি হীনচক্ষে দেখতেন বলেই যে কালো চামড়ার সাহেবি ব্রাহ্মণদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন, এমন নয়। ইংরেজদের অনেক কিছুর যেমন তিনি প্রশংসা করতেন, তেমনি ইংরেজ সমাজের, বিশেষতঃ ইংরেজ ধর্মযাজকদের কোন ত্রুটি দেখলে তিনি এক পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করতেন। বহু ইংরেজি সংবাদপত্র তিনি নিয়মিত পড়তেন, তার মধ্যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পত্রিকাও ছিল। ঐ পত্রিকায় যখনই এমন কোন সংবাদ বের হত যেটা বিশপ বা ক্লার্জিদের পক্ষে শোভন নয়, তখন সেই সংবাদটি কেটে তাঁব নিজস্ব ব্ল্যাকবুকে রেখে দিতেন। যত রকম ধর্মীয় কেচ্ছা আছে, সেগুলির এক মজাদার সংগ্রহ তাঁর ছিল। তাঁর ছেলে ঋষিতুল্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি আর্যসমাজের নেতা, তিনি কখনও এই ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেন না, কিন্তু তাঁর বাবা এতে আনন্দ পেতেন। যখনই কোথাও ভারতীয় খৃষ্টধর্মের দোষগুণ নিয়ে আলোচনা উঠত, অমনই দ্বারকানাথ তাঁর সেই ব্ল্যাকবুক বের করতেন। আমার নিজ বিশ্বাস এই যে কোন ধর্মকেই, তা সে ইতালী বা ইংল্যাণ্ড বা ভারতীয় হোক না কেন, কেবল ধর্মযাজকদের আচরণ দিয়ে তার বিচার হয় না।"

দ্বারকানাথের ইংলণ্ডে অবস্থান ও মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন স্টকলার সাহেব তাঁর স্মৃতিকথায়। স্টকলার দীর্ঘকাল ভারতে ছিলেন। কলকাতার অভিনয় জগতে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ কিন্তু পর বর্তীকালে দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি অধিকতর পরিচিতি লাভ করেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার তিনি প্রথম সম্পাদক, পরে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া স্টেটস্‌ম্যানের সঙ্গে একীভূত হয়।

প্রিন্স দ্বারকানাথ যখন ইওরোপ যান তখন ষ্টকলার ভারত থেকে বিদায় গ্রহণ করে লণ্ডনে পুনরায় বসবাস স্থরু করেছেন। দ্বারকানাথের আগমন সংবাদে তিনি পুলকিত হন। স্মৃতি কথায় সেদিনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন—

"প্রতিষ্ঠাবান হিন্দু দ্বারকানাথ ঠাকুরের লণ্ডন আগমনের সংবাদে, যাদের তাঁর সঙ্গে পূর্ব পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল তারা খুবই খুশি হয়। তাঁর স্বজাতীয়দের মধ্যে তিনি এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব, ভালমন্দ বাছ-বিচারের অদ্ভুত ক্ষমতা ও সম্পূর্ণ স্বাধীন চিত্তের অধিকারী এই মানুষটি অল্প বয়সেই কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করেন এবং নিজে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলেও যে কেহ সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছে তাকেই দিয়েছেন উৎসাহ। রামমোহন রায়ের, যিনি একেশ্বরবাদী, বিলাত যাত্রা এবং দেশবাসীর মধ্যে তাঁর ধর্মমত প্রচারার্থ পুস্তক মুদ্রণের জন্য তিনি অর্থ সাহায্য করেন। বঙ্গদেশের ইউরোপীয়দের কাছে তিনি অতিথিবৎসল গৃহস্বামী, বাস্তব বন্ধু, এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উদার সাহায্যকারী। এমন কোন উদ্যোগ ও দরকারী প্রতিষ্ঠান ছিলনা যা তাঁর অর্থ সাহায্য বা উপদেশ পায়নি। তিনি সর্বদাই তাঁর নিজ জাতীয় পোষাক পরেন কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রা প্রণালী পূর্ণমাত্রায় ইওরোপীয়। জীবনে তিনি উচ্চশিক্ষা না পেলেও উচ্চতর ইংরেজ সমাজের নরনারীদের সঙ্গে সমপর্যায়ে মেলামেশার ফলে তাঁর ভাষায় ও স্পষ্ট মতামতের ব্যাপারে পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ পড়েছিল।

"কলকাতার অনতিদূরে তাঁর যে মনোরম বাগানবাড়ি ছিল, সেখানে সব সময়েই মনোহর উৎসব লেগে থাকত। অবশ্য মাঝে মাঝে নব দম্পতিদের এই বাগানবাড়িটি মধুযামিনী যাপনের জন্য ছেড়ে দিতেন।

"ইউরোপীয় সঙ্গীত ও থিয়েটারের ব্যাপারে দ্বারকানাথ ছিলেন নিষ্ঠাবান সমঝদার। তাঁর দেশে যখন এক ইতালিয়ান নাট্যসম্প্রদায় সফর করতে যায় তখন সহজেই তিনি তাদের অভিনয়ের অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং ঐ দলের একজন শিল্পীকে নিযুক্ত করেন তাঁকে সঙ্গীতে তালিম দেবার জন্য। কাজেই তিনি যখন ইংলণ্ডে এলেন তখন অনুরূপ আনন্দ বিপুলতর বেগে তাঁকে আকর্ষণ করবে তাতে অবাক হবার কিছু

নেই। তাঁর মধুর ব্যবহার, প্রচুর সুনাম, বহু মূল্যবান গায়ের শাল, এমারেল্ড বসানো হাতের আঙটি—সব কিছু মিলিয়ে তিনি ছিলেন সেবারকার প্রতিটি সৌখিন-সমাবেশের মধ্যমণি। এমন কি বৃটিশ পীয়ারদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে আত্মগর্বী তাদের বাড়িতেও তাঁর জন্য ছিল সদা সাদর আবাহন। ডাচেস অব ইনভারনেস বিশেষভাবে ছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী।

"লণ্ডনের প্রচলিত আমোদ প্রমোদ উপভোগ মোটামুটি শেষ করে একদিন আমায় তাঁর এলবিমার্ল ষ্ট্রীটস্থ হোটেলে দেখা করার জন্য লিখলেন। তাঁর একটি কাজ করে দিতে হবে। তাঁর কাছ থেকে আমি এত পেয়েছি এবং তাঁর এত আস্থা অর্জন করেছিলাম যে, কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার কবার সম্ভাবনায় আনন্দিত হলাম। তাঁকে দেখে মনে হল লণ্ডনের জীবন যেন তাঁর ভাল লাগছেনা। মনে হল যেন তিনি অসুস্থ। সত্যিই তাই। 'এস্‌টক্‌লার'—প্রাথমিক কুশল বিনিময়েব পর মুখ খুললেন তিনি, "তোমাদের এই মহান দেশেব যাবতীয় ধনী ও অভিজাত মহলের সব সৌন্দর্য আমি দেখলাম। এখন অভিজাত প্রতিভা কিছু দেখতে চাই। যে সব জ্ঞানীগুণীদের এই রাজকীয় আওতায় দেখা যাবেনা তাদেব একান্ত সামাজিকভাবে একবার দেখতে চাই। তাদের জন্য আমাব পক্ষ থেকে একটি ভোজসভাব ব্যবস্থা করতে পারবে?, সবিনয়ে তাঁকে জানালাম, 'এদেশের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁবা প্রতিভা বা সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁদের প্রবল প্রতাপ তাঁদের সামান্য কয়েকজনের সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। তবে তাঁদের মধ্যেই এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা ভোজন-রসিক, গাম্ভীর্যের মুখোস.ত্যাগ করতে পারেন, কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও বুদ্ধিমত্তা ঝিলিক দেয়—এমন কিছু লোককে ডাকতে পারি।'

"আরে, তাইতো আমি চাই" তিনি সানন্দে বললেন। আমিও আর বিলম্ব না করে কয়েকটি নিমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়ে দিলাম। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার মায়ের নটিংহিল স্কোয়ারস্থ বাড়িতে মজলিস বসল। এই বৈঠকে অক্সেনফোর্ড, টম টেইলর, এলবার্ট স্মিথ, গিলবার্ট-বেকেট, হ্যারিসন আইনস্‌ওয়ার্থ, শার্লি ব্রুক্‌স্‌, রবার্ট কেলি-সস্ত্রীক, জর্জ মুর, দ্বারকানাথ ও তাঁর তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্র উপস্থিত ছিলেন। এই ভোজে পানীয় দ্রব্য খারাপ ছিলনা এবং আমার গৃহিনী খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতের ব্যাপারে একটু আন্তরিকতা দেখিয়েছিলেন, কাজেই ভোজনপর্ব বেশ পরিতৃপ্তির মধ্যেই সমাধা হল। দ্বারকানাথের ঠিক পাশেই বসেছিলেন অক্সেনফোর্ড, কাজেই তিনিই একচেটিয়া কথাবার্তা চালালেন। 'টাইমস্‌'-পত্রিকার এই কড়া সম্পাদক বিদগ্ধ পণ্ডিত, এবং

তাঁকে দেখে মনে হল, প্রাচ্যে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত কয়েকটি মূল্যবান প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর পেয়ে যেন তিনি পুলকিত হয়েছেন।

"সাধারণতঃ দেখা যায় 'কৌতুকপ্রিয় মানুষেরা' যখন পাশাপাশি বসেন, তখন যেন পরস্পরের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান রেখে চলেন। ভয় থাকে, হয়ত একের কৌতুক অপরে মেরে দেবে। কিন্তু আমাদের এই সমাবেশে প্রচুর বুদ্ধিদীপ্ত হাস্য-পরিহাস ও উচ্চাঙ্গের ঠাট্টা পরিবেশিত হল এবং দ্বারকানাথকেও আলোচনার ফাঁকে ফাঁকেই উপভোগের হাসি হাসতে দেখা গেল। অপর পক্ষের আগ্রহ ছিল রামায়ণ, শাস্ত্রাদি, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা ইত্যাদি সম্পর্কে। যাই হোক এই ভোজসভা হিট্ করেছিল। তিনিও কফি পানের অবকাশে স্বীকার কবলেন, 'খুব আনন্দের মধ্যে সন্ধ্যাটি কাটল। মনে হল যেন উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির মধ্যে যেন বসে ছিলাম।'

"আমার এই প্রধান হিন্দু বন্ধুটির মৃত্যুতে মর্মাহত হয়েছিলাম তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। ইংলণ্ডে বিলাসী জীবনযাত্রা ও বাণিজ্যসম্পর্কিত উদ্বেগের জন্য তাঁর শরীর অপটু হয়ে পড়েছিল, মাত্র কয়েক সপ্তাহ অসুস্থতার পরে তিনি মারা যান। ঠিক যেসময় তিনি মারা যান, সে সময় লণ্ডনের উপর দিয়ে অতি প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়। এক দুর্লভ পবিত্র প্রাণ চারিদিকে প্রবল প্রকম্পনে আলোড়িত করে যেন জানিয়ে গেল, সে চলে যাচ্ছে। বজ্রপাতের সেরকম প্রচণ্ড শব্দ, সুদীর্ঘ বিদ্যুল্লতার চোখ ঝল্সানো সেই আলো আমি আর কখনো দেখিনি। মহান দ্বারকানাথের আত্মা পার্থিব বন্ধন কাটিয়ে যাওয়ার সময় যে প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝা সেদিন দেখেছি তেমনটি আর্মেনিয়ার পার্বত্য ঝড় বা ভারতের কালবৈশাখীর দিনেও কখনো দেখিনি।

রামমোহন

উনিশ শতকের ভারতীয়দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ইওরোপ আমেরিকায় সর্বাধিক আলোচিত ও সর্বাধিক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। এর প্রথম ও প্রধান কারণ, রাজার প্রকাশ্যে পৌত্তলিকতাসহ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যা খৃষ্টধর্মাবলম্বী বিশ্বে ঔৎসুক্য ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। দ্বিতীয় কারণ উদার আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী। হীনমন্যতা সম্পূর্ণ পরিহার করে আপন অসাধাবণ ব্যক্তিত্ব ও স্বচ্ছ-চিন্তাধারার গুণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সেরা মনীষীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে রামমোহনের কৃতিত্ব।

রামমোহন, দ্বারকানাথ ও কেশবচন্দ্র—তিনজনই ইওরোপ ভ্রমণ করেন, ফলে

ভারত ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সে দেশের অধিবাসীদেব পক্ষে একটী নির্দিষ্ট সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করার সুযোগ হয়। চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের এই প্রথম সুযোগ ইওরোপে বিশেষতঃ ইংলণ্ডে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ফলে তাঁরা আলোচিত হন।

রামমোহন অবশ্য এই তালিকায় সর্বশীর্ষে। তাঁব জীবদ্দশাতেই তাঁর গ্রন্থাদি ইংরেজী, জার্মান ও ডাচ ভাষায় মুদ্রিত হয়ে ঐ সব দেশেই প্রকাশিত হয়। আমেরিকাতে যদিও তিনি যাননি, কিন্তু সেখানেও তাঁর বহু গ্রন্থ ১৮৩৩ এর পূর্বেই প্রকাশিত হয়। জীবন চরিত ইওরোপীয় কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

রামমোহনের ধর্মবিশ্বাসকে ইওরোপ আমেবিকার অনেকে যেমন উপলব্ধি কর্বেছিলেন, তেমনি সঙ্কীর্ণচিত্ত কেউ কেউ ভুল বুঝেছিলেন। পৌত্তলিকতা ত্যাগ করার অর্থ যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ নয়, বা পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেও যে হিন্দু থাকা যায় সেটা রক্ষণশীল খৃষ্টানদেব অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল।

রামমোহনের ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করে আমেরিকান রিভিউ পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন "রামমোহন খৃষ্টান নন একথা সত্য, কিন্তু উপাস্যের গুণ ও স্বভাব সম্পর্কে তিনি যে মত পোষণ করেন খৃষ্টধর্ম বিশ্বাস থেকে তার পার্থক্য বেশি নয়। মূল বিশ্বাস থেকে লক্ষ্যবস্তু উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন। যদি এই বিশ্বাসের দ্বারা তিনি তাঁর দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করতে পাবেন তবে প্রাচ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচারকর্ম অনেকখানি এগোবে। খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের পথে এক বৃহৎ বাধা তাঁর এই কার্যের দ্বারা অপসারিত হবে।"

কলকাতার ট্রিনিটারিয়ান চার্চের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ এডামস্ পর্যন্ত রামমোহনকে ভুল বুঝেছিলেন। তিনিও ভেবেছিলেন, পৌত্তলিকতা যখন রামমোহন ত্যাগ করেছেন তখন তাঁর একমাত্র বিকল্প হল খৃষ্টধর্ম গ্রহণ। তিনি চার্চে যান, পাদ্রিদের সঙ্গে আলোচনা করেন, খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেও কসুর করেন না, এবং খৃষ্টানদের মত বহু ঈশ্বরের পরিবর্তে একটী মাত্র ঈশ্বরে আস্থা রাখেন। তবে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে "সাহস" করছেন না কেন? এডাম্ এ সম্পর্কে ডাঃ টাকারম্যানকে লিখেছেন (১৮. ২. ১৮২৬)

"তিনি খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হলে হিন্দুরা তাকে উচ্চবর্ণের খৃষ্টান বলে মনে করবে না। বরং নিম্নবর্ণজ অজ্ঞ অশিক্ষিত যে সব ব্যক্তিকে ইংরেজরা বা পর্তুগীজরা ধর্মান্তরিত করেছে তাদেরই একজন বলে মনে করবে। অন্যভাবে বলা যায়, বর্তমান অবস্থায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে, যাদের সঙ্গে রামমোহনের মতভেদ আছে (অর্থাৎ খৃষ্টান)

তাদের সঙ্গে একীকৃত হবেন, অথচ যাদের সঙ্গে এখন একত্রে চলাফেরা করেন তাদের কাছ থেকেও বহু দূরে সরে যাবেন। এই দুই মন্দের মধ্যে একটা মন্দকে তিনি বেছে নিয়েছেন। যে মন্দটা তিনি বেছে নিয়েছেন (অর্থাৎ হিন্দুধর্মে বহাল থাকা) তাতে বন্ধন অনেক। এতে ভিতরে থেকেও অনেক স্বাধীনতা ও কাজ করার ক্ষমতা তিনি ভোগ করতে পারেন।”

মিঃ এডাম্ রামমোহনকে বুঝতে পারেননি। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হতে হলেই যে খৃষ্টান হতে হবে, এছাড়া একেশ্বরবাদী হওয়ার অন্যপন্থা নেই এই ছিল এডাম্সের সঙ্কীর্ণ বিশ্বাস। বেদান্তে যে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বলে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ করা হয়েছে সেকথা এডাম্ বোধ হয় জানতেন না। পৌত্তলিকতা ও হিন্দুধর্ম সমার্থক মনে করেই এডাম ভুল করেছিলেন।

রামমোহনের পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক চিন্তা ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা ইওরোপের অনেককে মুগ্ধ করেছিল। বিখ্যাত রাষ্ট্র বিজ্ঞানী জেরেমী বেন্থাম রামমোহনকে তাঁর প্রথম পত্রের প্রথম ছত্রেই সম্বোধন করেছেন এইভাবে।

“অশেষ গুণান্বিত, গভীর ভালবাসার পাত্র, মানবজাতির সেবাব্রতী,

“আপনার চমৎকার বন্ধু কর্ণেল ইয়ুং, কর্ণেল স্ট্যানহোপ ও কর্ণেল বাকিংহামের কাছ থেকে আপনার কথা আমি শুনেছি। আপনার রচিত একটা গ্রন্থও আমি পড়েছি। গ্রন্থের মধ্যে যদি হিন্দু নামটা লেখা না থাকত তবে আমি গ্রন্থের ভাষা সৌকর্য দেখে নিশ্চয়ই ভাবতাম কোন উচ্চশিক্ষিত ইংরেজই গ্রন্থটি রচনা করেছেন”।

কেশবচন্দ্র

কেশবচন্দ্র সেন যখন বিলেতে যান, ম্যাক্সমূলর তখন অক্সফোর্ডে প্রাচ্যবিদ্যা-বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক। ডাঃ পুসে অধ্যক্ষ। প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে তর্ক জমে উঠল। ডাঃ পুসে রক্ষণশীল ক্রিশ্চান। প্রশ্ন উঠল—যারা ক্রিশ্চান নয় তাদের কি মুক্তি (স্যালভেশন) হবে না? ডাঃ পুসের মতে, অ-ক্রিশ্চানদের স্যালভেশন সম্ভব নয়। কারণ যীশু ভিন্ন আর কেউ মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না।

স্যালভেশন কথাটির তাৎপর্য নিয়ে আসলে মতভেদ ছিল। ম্যাক্সমূলর ও কেশবচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বললেন, ইশ্বরের রাজ্যে জাতিভেদ নেই। স্যালভেশন সকলেরই হবে। ডাঃ

পুসে এ মত মানলেন না। বরং উষ্ণ হলেন। সহসা কেশবচন্দ্রের কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হল। ভিজে গলায় আবেগের তরঙ্গ তুলে তিনি বলে উঠলেন—ঈশ্বরকে আমি বিচ্ছিন্নভাবে ভাবতে পারি না। কেবল তাঁর কাছে পৌছানো নয়, তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়াই আমার লক্ষ্য। সারাক্ষণ তাঁর নাম জপ করছি তাঁকে ছাড়া আর-কিছু ভাবতেও পারি না।

প্রসঙ্গতঃ কিছু পরবর্তীকালের দু-একজন বিদেশীর কথা উল্লেখ করি। সিবিলিয়নদের মধ্যে সার্ হেনরী কটন ছিলেন ব্যতিক্রম। সাত বছর তিনি ছিলেন গভর্নরের পার্শ্বচর ও মন্ত্রী। সম্ভবত হোম সেক্রেটারিও হয়েছিলেন। কটন তাঁর স্মৃতিকথায় সার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লালমোহন ঘোষের বাগ্মীতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখছেন—ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে আমি বহুবার এঁদের সঙ্গে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি। আমি প্রতিবারই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছি। কিন্তু বাগ্মিতার জোরে নয়। জয়লাভের একমাত্র কারণ, আমি ছিলাম মন্ত্রী ও আমার পক্ষ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্রকেও তিনি দেখেছেন সরকারী কাজে এবং ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরমের’ রচয়িতা হিসাবে যে বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, সে-কথারও উল্লেখ করেছেন।

ইংরেজ ও জার্মানের কথা হল। এবার রাশিয়ান ভ্রমণকারী মিনায়েফের ডায়েরি থেকে দু-একজনের কথা বলি। মিনায়েফ ভারতে এসেছিলেন সম্ভবত দুবার। তিনি রাশিয়ান, স্বভাবতই ইংরেজ শাসকবর্গ তাঁকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং ইংরেজ রাজত্বের সেই প্রবল প্রতাপের দিনে অন্য কোন ইউরোপীয় জাতির পক্ষে ভারতে অবাধে বিচরণ সহজসাধ্য ছিল না। ইংরেজের রুশভীতির সম্পর্কেও ভারতীয়রা ছিলেন বিলক্ষণ সচেতন। মিনায়েফ ১৮৮৬ সনে তাঁর ডায়েরিতে প্রথম কংগ্রেস সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি সম্পর্কে লিখছেন—বোনার্জিকে কেউ জনসাধারণের প্রতিনিধি বলে মনে করে না। এমন কী ব্রাহ্মণ বলেও কেউ তাঁকে স্বীকার করে না। তাঁর বাবা ছিলেন গরীব অথচ বোনার্জির আয় মাসে দশ হাজার টাকা।

“...রাশিয়ানদের প্রতি বাঙালীদের সহৃদয় আতিথেয়তা আমায় বরাবর মুগ্ধ করেছে। এ সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি নয়, রাশিয়ান জাতির প্রতিই বাঙালীদের এই শ্রদ্ধা। গতকাল হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমার কাছে অকপটে স্বীকার করলেন যে, স্বচক্ষে একজন রাশিয়ানকে দেখে তিনি পুলকিত। দশ বছর আগে

আমি যখন সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করি তখনও শাস্ত্রীমশাই আমায় দেখেছিলেন বলে জানালেন।...

হরিদাস শাস্ত্রীর সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে জানলাম ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রতি ভারতীয়দের আস্থা কম। সুলক্ষণ সন্দেহ নেই। কথা-প্রসঙ্গে জানলাম রজনীকান্ত সেন বাংলা দেশের একজন বিশিষ্ট কবি হিসাবে সম্মানিত।"

বিদেশীদের চোখে বঙ্গনারী

লরেন্স ফস্টর শৈবলিনীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। চন্দ্রশেখরের এই কাহিনী কল্পিত হতে পারে, কিন্তু ফস্টরের মত শত শত ইংরেজ বাস্তব-ক্ষেত্রেও বঙ্গনারীদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি হেনেছিল। নীলদর্পণের পদী ময়রাণীকে নিয়ে পাড়ার ছেলেরা যে ছড়া বেঁধেছিল তার মূলেও ছিল নীলকুঠীর সাহেবদের অবৈধ প্রণয়। বলা বাহুল্য এরা হল রবীন্দ্রনাথ কথিত "ছোট ইংরেজ"। এরাই সব নয়। "বড় ইংরেজ"ও এসেছিলেন অনেক। তাঁদের অনেকেই উদ্দেশ্য-নির্বিশেষ দৃষ্টিতে বঙ্গনারীর কথা আলোচনা করেছেন। সেই পর্দানসীন যুগে ভদ্রঘরের বঙ্গনারীর দর্শন পাওয়া সাহেবদের পক্ষে বিশেষ সহজসাধ্য ছিল না। আর মনে চৌদ্দ আনা ইচ্ছা থাকলেও বাড়িতে পার্টি উপলক্ষে আগত সাহেবদের সঙ্গে পুরনারীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সাহস ছিল না কারও। এদিকে কলকাতার সাহেবদের কোন সোসাইটি ১৭৭৪ সালের আগে গড়ে ওঠেনি। ব্যারাকে যেসব তরুণ ইংরেজ সৈন্য বাস করত তারা দুধের তৃষ্ণা অনেক সময় ঘোলে মিটিয়েছে। দেশীয় নারী বলতে যাদের সঙ্গে তাদের পরিচয় সাধন সহজসাধ্য ছিল তারা হল আয়া, মেথরানী প্রভৃতি নিম্নবর্ণভুক্ত মহিলা। এদের প্রণয়াসক্ত হয়ে অনেক সাহেব জীবন সার্থক বলে মনে করেছে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে হঠাবার জন্য ডুয়েল লড়েছে, এবং সব কিছুতে ব্যর্থ হয়ে প্রণয়িনীর গৃহে আগুন লাগিয়ে হিংস্র আনন্দ উপভোগ করেছে।

ওরা হল নিম্নবর্ণভুক্ত মহিলা, সমাজে অপাংক্তেয়। ওদের মনের গতিও নিম্নমুখী। অতএব 'হে ইংরেজ নন্দন, ওই পিচ্ছিল পথে পা দিও না'। অনেক নিষেধবাক্য অনেক কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু তাতে কেউ বিশেষ কর্ণপাত করেনি। তাদের আর দোষ কি! মেথরানীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 'অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ডোমেষ্টিক স্কেচ' গ্রন্থের লেখক উচ্ছ্বাসে ডগমগ হয়ে লিখেছেন Mehturanee—adorned possibly by all those indescribable Asiatic charms which the glowing tint of the Sindoor centering the forehead, the sable pencilling of Soorma and Missie on eyelid and teeth and the Sanguinary hue of the Pan upon lips and gums are of course so highly calculated to create.

জর্জ পারবেরী কলকাতায় নবাগত ইংরেজদের দাসদাসী নিয়োগের ব্যাপারে একটু সচেতন হতে বলেছেন। কারণ **as soon as they find out your besetting sin they will pamper it and ultimately make you a perfect slave to it until they effect your ruin.**

বঙ্গদেশবাসী পাঠক নিশ্চয়ই জানেন, এই মেথরানী-আয়ারা আর যাই হোক, বাঙালী নয়। কর্মব্যপদেশে কলকাতাবাসী। 'ছোট ইংরেজের' নজর ছোট। তাদের কথা আলোচনার অযোগ্য। ভদ্রঘরের বঙ্গনারীদের দূর থেকে দেখেছেন এবং ডায়েরীতে সে কথা শ্রদ্ধানম্রচিত্তে উল্লেখ করেছেন এমন ইংরেজ দু-একজন ছিলেন। সেকালের কলকাতার খুঁটিনাটি বর্ণনা করেছেন অনেকেই কিন্তু বঙ্গ-রমণীর বর্ণনা বেশী পাওয়া যায় না। নবাবী শাসনের পতনের পর যখন দেশব্যাপী অরাজকতা দেখা দেয় তখন বিজয়ী ইংরেজ সৈন্যদের লালসা শোভনতার সীমা অতিক্রম করে অতি হীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে ইংরেজ কুঠিয়ালদের পাপাচরণের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেখে ইংরেজদের নৈতিক মানদণ্ড সম্পর্কেও বঙ্গসমাজ সন্দিহান হয়ে ওঠে। ফলে পর্দাপ্রথা উত্তরোত্তর কঠোর হতে থাকে। সাহেবদের ডায়েরী বা জর্নালে বঙ্গনারীদের কথা বিশেষ উল্লিখিত হয়নি, তার কারণ বঙ্গনারীর দর্শনলাভ খুব সহজসাধ্য ছিল না এবং কোথাও বেশী আগ্রহ দেখালে নীলদর্পণের উড সাহেবের ভাষায় "বীটন টু জেলি" হওয়ার আশঙ্কা ছিল বিলক্ষণ।

"এশিয়াটিকাস" কলকাতায় এসেছিলেন ১৭৭৪ সালে। বঙ্গরমণীর প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। বঙ্গরমণী ও তদানীন্তন কলকাতাপ্রবাসী ইওরোপীয় ললনাদের তিনি পাশাপাশি তুলনা করেছেন। "বঙ্গনারীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন এমন সুন্দর, তাদের নয়নযুগল এমন ব্যঞ্জনাময় যে গাত্রবর্ণের কথা একবারও মনে জাগে না, **you must acknowledge them not inferior to the most celebrated beauties of Europe.**

"পক্ষান্তরে কলকাতার শ্বেতাঙ্গিনীদের কথা ভাবুন। তাদের মুখের গোলাপী আভা বিদায় নেওয়ায় মুখ ফ্যাকাসে ও রোগাটে। দেখলে মনে হয় 'ল্যাজারাস' যেন কবর থেকে সদ্য উঠে এসেছে। অমন কঙ্কালসার বিবর্ণশ্রী শ্বেতাঙ্গিনীর চেয়ে **the dazzling brightness of a copper-coloured face infinitely preferable."**

তাঁর অল্পদিন পরেই কলকাতায় এসেছিলেন মিসেস ফে। ভদ্রমহিলার নিজের চরিত্রটি আদৌ নির্মল ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কেচ্ছা অবলম্বন করে

তখনকার দিনে তুখানি বই লেখা হয়েছিল। ধবলী অপেক্ষা শ্যামলীদের প্রতি ইংরেজ যুবকদের এত পক্ষপাতিত্ব দেখে তিনি যদি ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকেন তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর মতে, হিন্দু রমণীরা বড় বেশী প্রসাধন করে থাকেন, এই সাজ-পোশাক প্রসাধনাদি বাদ দিলে তাদের সত্যি সুন্দরী বলা যায় কিনা সন্দেহ।

Their whole time is taken up in decorating their persons—the hair, eyelids, eyebrows, teeth, hands and nails—all undergo certain process to render them more completely fascinating...the motive being to secure the affections of a husband or to counteract the plans of a rival.

এতগুলি কথা যিনি পরম প্রাজ্ঞের মত লিখেছেন তিনি দেখেছেন মাত্র তুজন বঙ্গনারী, আর তা-ও দূর থেকে। তিনি নিজেই লিখেছেন—

"হিন্দু নারীদের কখনও প্রকাশ্যে দেখা যায় না। যখন গাড়ি চেপে তারা পথে কোন কারণে বের হয়, তখন সেই গাড়ির চারিদিকে ঘেরাটোপ দেওয়া থাকে।"

কিন্তু ফ্যানি পার্কস হিন্দুর অন্দরমহলে প্রবেশের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। চীৎপুরের কোন ধনীবাবুর বাড়িতে তুর্গাপুজা উপলক্ষে আয়োজিত নাচ দেখার জন্য পার্কস দম্পতি আমন্ত্রিত হন। নাচ শেষ হওয়ার পর মিসেস পার্কসকে সাদরে অন্দরমহলে নিয়ে যাওয়া হয়। 'অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে' তাঁকে যেতে হল। নীচে প্রশস্ত হলঘরে আমন্ত্রিতগণ পান ভোজনে ব্যস্ত। উপরে একপাশে বাঁশের কাবারী কেটে বানানো হয়েছে চিক্। সেই চিকের ফাঁক দিয়ে নাচঘরের দৃশ্যাদি দেখা যায়। মিসেস পার্কস আগেই শুনেছিলেন, বঙ্গনারীরা পরিবারের পুরুষ ভিন্ন অপর কোন পুরুষকে অন্দরমহলে প্রবেশ করতে দেয় না। কিন্তু অন্দরমহলে প্রবেশ করে যখন তিনি বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করলেন তখন বিস্মিত হলেন। কারণ পর-পুরুষদের সামনে যাঁরা কখনো হাজির হন না, অন্দরমহলে যাঁরা পর-পুরুষদের কোন দিন প্রবেশ করতে দেন না, তাঁরা পর-পুরুষদের সকলকেই চেনেন। চিকের ফাঁক দিয়ে নীচের হলঘরে আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা বসে আছেন দেখা যাচ্ছে। এবং অন্তঃপুরবাসিনী মহিলারা appeared to know all the gentlemen in sight and told me their names. They were very inquisitive and requested me to point out my husband, inquired how many children I had and asked me thousand questions.

বঙ্গনারীর শাড়ি পরার বিশেষ ধরনটি আজ বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছে। সেকালিনীদের শাড়ি পরার কৌশল দেখে মিসেস পার্কস মুগ্ধ হয়েছিলেন। একটি মাত্র বস্ত্রকে সুন্দরভাবে শরীরের চারিদিকে পাক খাইয়ে পরতে দেখে তিনি তো অবাক—although in one piece a complete dress and is a remarkably graceful one.

পার্কসের সময়ে হিন্দু রমণীর পোশাক ও পরিধানে মুস্লিম ছাপ বেশ একটু প্রবল ছিল। হাতে শাঁখা ও রূপার গহনা, চোখে সুর্মা এবং কপালে ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থলে একটি কালো টীপ। পার্কসের বর্ণনা অনুসারে, তদানীন্তন বঙ্গরমণীর পোশাক ছিল নীল পাড় মস্‌লিন, তার তলায় সায়া-জাতীয় কোন কিছু ছিল না। গায়ে কোন জামার কথাও তিনি উল্লেখ করেননি। জঙ্গীপুরের ঘাটে তিনি এক বঙ্গরমণীকে স্নান করতে দেখেছিলেন। ভাগীরথীর জলে মহিলাটি স্নানপর্ব সমাধা করছেন। এক-কোমর জলে দাঁড়িয়ে অঙ্গ মার্জনা করতে করতে তিনি ধীরে ধীরে পরনের শাড়িটি কেচে ফেললেন কিন্তু আশ্চর্য, সমগ্র শাড়িটি কাচা হয়ে গেল অথচ দেহ একবারও অনাবৃত হল না। সব সময়েই শাড়ির কোন-না-কোন অংশ দিয়ে তিনি লজ্জা নিবারণ করলেন। মিসেস পার্কস লিখেছেন, They wash their hair and bodies retaining all the time some part of their drapery which assumes the most classical appearance.

হাচিসন কলকাতার এসপ্লানেড ঘাটে বঙ্গরমণীর স্নানের দৃশ্য দেখেছেন। তিনি অবাক হয়েছেন অন্য কারণে। স্নানের শেষে জলপূর্ণ কলসী নিয়ে তাঁরা কিভাবে অবলীলাক্রমে হেঁটে যান—সাহেব তো দেখে তাজ্জব। তাঁর ধারণা বঙ্গরমণীর শরীরের অমন আঁটসাট গড়নের মূল কারণই হল নিয়মিতভাবে কলসী বহন।

এ পর্যন্ত যাঁদের কথা উল্লেখ করলাম তাঁরা কেউ মিশনারী নয়। মিশনারীদের মধ্যে কেরী, ওয়ার্ড প্রভৃতি অনেকেই প্রাসঙ্গিকভাবে বঙ্গরমণীর কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কেউ বঙ্গরমণীর কুসংস্কার, কেউ বাল্য-বিবাহ, কেউ সতীদাহ প্রথার জন্য বেদনা বোধ করেছেন। ওয়ার্ড সাহেব একদা এক শ্মশানঘাটে এক বঙ্গরমণীকে নিজের অসুস্থ সন্তানকে জীবন্ত অবস্থাতেই ভাসিয়ে দিতে দেখেছিলেন। একদিকে কুসংস্কার, অন্য দিকে মাতৃহৃদয়—শেষ পর্যন্ত কুসংস্কারই হয়েছে জয়ী। ওয়ার্ড সাহেব বেদনার্তচিত্তে প্রশ্ন করেছেন, মাতৃহৃদয় কবে শতদলের মত সব বাধাবিপত্তি ভেদ করে আপন গৌরবে ফুটে উঠবে?

"স্কেচেস অব ইণ্ডিয়ার" গ্রন্থকার কলকাতায় কিছুদিন ছিলেন। পরে সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাংলা তথা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় মহিলাদের কমনীয় সৌন্দর্য তাঁকে বার বার মুগ্ধ করেছে। তাঁর মন্তব্য—

"হিন্দুস্থানী মহিলাদের (আমি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কথাই বলছি) শরীর লাবণ্যমণ্ডিত ; ছন্দ ও সৌন্দর্য বলতে যে আদর্শটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাই দিয়ে তৈরি তাঁদের অঙ্গ। তাঁদের মুখশ্রী যত সুন্দর ততোধিক মিষ্টি এবং ব্যঞ্জনাময়। তাঁদের লম্বা টানা চোখের সেই ঠাণ্ডা আগুন এমনিতেই যেন কথা বলে। এ দেশের মেয়েরা তাদের চুলের গরবে গরবিনী। তাদের চুল বেশ লম্বা ও চক্‌চকে, মাথার পিছনে সামান্য একটু পাক দিয়ে বেঁধে রাখে।"

এই পর্যটক তাঁর গ্রন্থের ফুটনোটে ভারতে আগত অন্যান্য ইওরোপীয়দের কূপমণ্ডুকতার নিন্দা করে মন্তব্য করেছেন—

"হাজার হাজার আগন্তুকদের এক বৃহৎ অংশ ভারতে অবস্থানকালে তাদের চাকরদের স্ত্রী বা তাদের উপপত্নী ছাড়া সত্যকার উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের না দেখেই ভারত ছেড়ে চলে যায়।"

ভারতীয় ও ইওরোপীয় মহিলাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন জন-লে-কোর্তিয়ের। ভদ্রলোক রক্তে ফরাসী, কিন্তু বেশ কিছুদিন ইংরেজ বাহিনীতে কাজ করেছিলেন। ১৭৮৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি কলকাতায় ছিলেন। তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—

"দশ-বারো বৎসরেই হিন্দু মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। আমরা সন্তানসম্ভবা নারীদের এদেশে প্রায়ই দেখি। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঠিক পর থেকেই তারা তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। যখনই সম্ভব স্তন্যপান করায়, যখন তা সম্ভব হয় না তখন সন্তানের স্বাস্থ্য ও মেজাজ যাতে ভাল থাকে তার ব্যবস্থা করে। সন্তানকে ক্রমাগত স্তন্যদানের ফলে পয়োধর দুর্বল হয়, কিন্তু হাসিমুখে তারা সে ত্রুটি মেনে নেয়। স্বামীকে সুখী করা ছাড়া জীবনে তাদের অন্য কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, এভাবেই তারা দেশের পুরুষ মানুষেরা যাতে অদৃষ্টের দুঃখ কষ্টের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারে, তার সাহস যোগায়।

"গাত্রবর্ণ ও নিরাবরণতার প্রতি কটাক্ষ করে যাদের তোমরা বর্বর বল, তাদের নারী-জাতির এই হল চরিত্র। এবার আমাদের সুদর্শনা ভদ্রস্বভাবা ইওরোপীয় ললনার কথা ভাবা যাক। ইওরোপীয় মহিলারা বিয়ে করেন কেবল ধন-সম্পদের

দিকে তাকিয়ে, সমাজ নির্দিষ্ট কর্তব্য পর্যন্ত তারা পালন করে না। বিয়ের পর যদি কোন মহিলার সন্তান হয় তবে তার ভার দেওয়া হয় মাহিনাভোগী নার্সের উপর। যতদিন পর্যন্ত সন্তান তার রূপসী মায়ের কাজে বাধার সৃষ্টি করবে, ততদিন সে নার্সের কাছেই মানুষ হবে।"

সন্তান পালনের প্রতি ইওরোপীয় মহিলাদের অনাগ্রহ, বিলাস-ব্যসনের প্রতি অত্যধিক মোহ ইত্যাদি দোষের উল্লেখ করে পরবর্তীকালেও বহু পর্যটক বঙ্কিম মন্তব্য করেছেন। ভারতীয় নারীর শ্রেষ্ঠ বিকাশ তার মাতৃত্বে, সেখানেই ভারতীয় নারীত্বের সার্থকতা, একথা কোর্তিয়ের তাঁর গ্রন্থের অন্যত্রও বলেছেন।

আঠারো শতকের একেবারে শেষদিকে কলকাতায় এসেছিলেন মিসেস্ শেরউড। কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদ এবং আরও বহু স্থানে। ভদ্রমহিলা ছিলেন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। 'ভারতবর্ষ' নামটি শুনেই তাঁর আতঙ্ক হত। কার কাছে উড়ো কথা শুনেছিলেন, সেখানকার *নেটিভ* আয়ারা সাহেব-শিশুদের আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। শোনামাত্র সন্দেহ হতে লাগল তাঁর। যেদিনই তাঁর শিশু একটু বেশি ঘুমোত সেদিনই তাঁর সন্দেহ ঘনীভূত হত। আবার কম ঘুমোলেও আয়ার রেহাই নেই। শুনেছিলেন, এদেশে অনেকে নানা মতলবে তুক্‌তাক্ করে। একদিন তাঁর বাড়ির এক হিন্দু আয়া তার নিজস্ব সংস্কারবশে শেরউড-কন্যার কপালে সিন্দুরের টিপ্ পরিয়ে দিয়েছিল। ব্যস, ভয়ে আশঙ্কায় মেম সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেল। এহেন মিসেস্ শেরউড কিন্তু এদেশের ঘুমপাড়ানি গানের প্রশংসা করেছেন। লিখেছেন—

"তার কথা ও স্বর এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। পরবর্তীকালে বহুদিন পর্যন্ত আমি সেই গান মূল হিন্দুস্থানীতে গেয়েছি। যখনই কোন শিশু আমার কোলে শুয়েছে, তাকে ঘুম পাড়াবার জন্য সেই গানই আমি গেয়েছি।"

গানটির ইংরেজি অনুবাদ তিনি তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে প্রকাশ করেছেন—

Sleep make baby
Sleep make
Sleep little baby
Sleep, Oh ! Oh !

Golden is thy bed
Of silk are thy curtains
From Cabul the Mughul woman comes
To make my master sleep.

ভেরেলেস্ট কোম্পানি-শাসনের একেবারে প্রথম দিকে অল্প কিছুদিনের জন্য বাংলার গভর্ণর হয়েছিলেন। মতভেদ ও দলীয় চক্রান্তের ফলে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি বাংলা দেশে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তিনি বঙ্গদেশীয় মহিলা সম্পর্কে যে সব অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার কোন কোন অংশ যদিও সমর্থনযোগ্য নয় এবং "সংস্কারমুক্ত" পশ্চিমী সাহেবের মুখে শোভনীয় নয়, তবু একজনের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে উল্লেখ করা যায়।

ভেরেলেস্ট লিখেছেন—

"মেয়েদের আব্রু নষ্ট করলে মুসলমানদের সম্ভ্রমে যতখানি আঘাত লাগে, হিন্দুদের তার চেয়ে কম নয়। এই আব্রু নষ্ট করা জঘন্যতম অপমান। মিঃ স্কাস্টন বলেছেন —'বাংলার সুবেদার সরফরাজ খান তাঁর সর্বাধিক ধনী প্রজা জগৎশেঠকে যে রকম লজ্জাকরভাবে অবমাননা করেছিলেন, তত অপমান সরফরাজ খান কোনদিন ভোগ করেননি। সুবেদার সরফরাজ শুনলেন, তাঁর প্রজা জগৎশেঠের পুত্র বিয়ে করেছে এক অসামান্যা সুন্দরীকে। সুবেদার চাপ দিলেন, একবার দেখাতেই হবে সেই রূপসীকে। ছেলের বাপ (মেয়ের শ্বশুর) সুবেদারকে অনেক অনুনয় করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। শেষপর্যন্ত সরফরাজ দেখলেন সেই মেয়েকে এবং ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। বোধ হয় তার কোন ক্ষতি তিনি করেননি। কিন্তু এই রক্ষণশীল পর্দানসিন দেশে, এই ঘটনায় তিনি মনে যে আঘাত পেলেন, তা দুরপনেয়।

"মিঃ ডো বলেছেন—ভারতে মহিলাদের এমন পবিত্ররূপে গণ্য করা হয় যে, সাধারণ সৈন্যরা যুদ্ধকালে চরম ধ্বংস কার্যের সময়েও তাদের অঙ্গে হাত দেয় না। হারেম হল তাদের আশ্রয়স্থল। যুদ্ধ-বিজয়ী বর্বরের দল স্বামীকে হত্যা করে সেই রক্তমাখা হাতে হারেমে প্রবেশ করে। কিন্তু তারাও হারেমবাসিনী পুরনারীদের গোপন কক্ষ দেখে ভয়ে পিছিয়ে আসে।'

"বর্বর দস্যুরা পর্যন্ত যেখানে মহিলাদের সম্ভ্রম হানি করতে সাহস করেনি, আমাদের বিচারালয় কি সেই কাজ করবে ?

"একটি সরকারের পরিবর্তে নতুন সরকার আমরা কায়েম করতে পারিনি। আমরা কি দুর্বল নারী, শিশু ও ভৃত্যদের (যাদের পরিবারের কর্তাই এতদিন নিজ শৌর্যের দ্বারা রক্ষা করতেন) রক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করব? আমরা কি স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে পবিত্র পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেব?"

ভেরেলেস্ট যখন বাংলার গভর্ণর হয়েছিলেন তখন নবাবী শাসনের শেষ হলেও কোম্পানি শাসন দানা বাঁধেনি। দ্বৈত-শাসনের নামে সর্বত্র চলছে অরাজকতা। একদিকে দুর্ভিক্ষ, অন্যদিকে দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠন তখন নিত্য ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ এই পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল। ভেরেলেস্ট শাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের দায়িত্বের কথাই লণ্ডনস্থ কোম্পানির পরিচালক-মণ্ডলীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

এর পর ভেরেলেস্ট যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটা তাঁর অজ্ঞতার পরিচায়ক। তিনি পশ্চিমী প্রগতিশীল আবহাওয়ায় লালিতপালিত হওয়া সত্ত্বেও বহু-বিবাহ সমর্থন করেছেন এবং তার স্বপক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন সেটা হাস্যকর। তাঁর মতে—

"প্রেসিডেণ্ট মণ্টেস্কু বলেছেন—'গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মেয়েরা মাত্র আট, নয়, বড় জোর দশের মধ্যেই বিবাহযোগ্য হয়ে পড়ে। বিশ বছরেই তারা বুড়িয়ে যায়। স্বভাবতই, এদেশে, আইনের কোন বাধা না থাকলে, একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রীলোককে বিয়ে করে। কাজেই বহু-বিবাহ প্রচলিত হওয়াই উচিত।'

"আমাদের (ইওরোপীয়দের) আইন নাতিশীতোষ্ণ দেশের আইন। সেখানে মেয়েদের সৌন্দর্য দীর্ঘস্থায়ী। বেশি বয়সে যখন তাদের যৌবন পরিপুষ্ট হয় তখন দৈহিক রূপ ও মনের জোর দুই মিলিয়ে তারা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে পড়ে। ফলে আমাদের দেশে মাত্র এক বিবাহ প্রচলিত। অন্যের দ্বারা কৃত সন্তানরা "জারজ" রূপে বিবেচিত হয়। বাপ-মায়ের সঙ্গে সন্তানদের সম্পর্কও শেষ হয় এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বও জারজ সন্তানরা পায় না।"

মিসেস্ ফে এক বড়লোকের মেয়ের বিয়ের বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। তিনি অবশ্য নিজের চোখে দেখেননি, শুনেছেন। বর-কনে একটি বহুবিচিত্রকারুকার্য খচিত পাল্কিতে চেপে বের পাত্রা হয়েছিল শোভাযাত্রা সহকারে ও পাত্রী পক্ষের লোকজন যোগ দেয় সেই শোভাযাত্রায়। কেউ চেপেছিল ঘোড়ায়, কেউ হাতির পিঠে, কেউ পাল্কিতে। নাচওয়ালীরা নাচতে নাচতে এবং বাদ্যকরের দল বাজনা

বাজাতে বাজাতে সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছিল। সন্ধ্যায় মেয়ের বাপের বাড়িতে হয়েছিল বাজি পোড়ানো, তাছাড়া খানাপিনারও নাকি বিরাম ছিল না। তবে এ সবই তিনি শুনেছেন, no European was present।

ইওরোপীয়ান হাজির নেই অথচ এত পয়সা খরচ হচ্ছে, মিসেস্ ফে'র পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত।

অবশ্য অন্যান্য সামাজিক খবরগুলি তিনি ইওরোপীয়ানদের মুখে শোনেন নি। ভারতীয়দের মুখেই শুনেছেন এবং বিশ্বাস করতে দ্বিধা করেন নি। যেমন—"বড়লোক তার একমাত্র কন্যার জন্য স্বজাতির মধ্য থেকে গরিব পাত্র সংগ্রহ করে ঘর-জামাই করতে চেষ্টা করে। এটা প্রয়োজন। কারণ, মেয়ের বৃদ্ধ বাপ যখন মারা যাবে, তখন তার তরুণ স্বামী তার নিজের বাপ-মায়ের তাগিদে এবং নিজের প্রয়োজনে পরিবারের মহিলাদের সাহায্যে স্বজাতীয় কোন গরিব পরিবারের সুন্দরী কন্যার খোঁজ করতে থাকবে। তারপর সেই সুন্দরীকে দ্বিতীয় স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে। অবশ্য পরিবারে প্রথম স্ত্রীর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকবে, প্রথম স্ত্রীই হবে বাড়ির কর্ত্রী। স্বামীর পক্ষেও যে-কোন একজনের প্রতি বেশী আসক্ত হওয়া সম্ভব নয়, কারণ প্রচলিত আইন অনুসারে স্বামী পালাক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গেই বাস করতে বাধ্য।"

এসব খবর মিসেস্ ফে সংগ্রহ করেছেন বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে। যদিও কোন ভারতীয় পরিবারের মহিলাদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেনি।

হিন্দু গরিবের কন্যাদায় একালে যেমন আহার-নিদ্রাহরণকারী ব্যাপার, সেকালেও তাই। ওয়ার্ড লিখেছেন—'দুবেলা দুমুঠো অন্নের ভাবনা হিন্দুর প্রধান ভাবনা নয়। কয়েকটি অন্ধ কুসংস্কার, হাস্যকর দেশাচারের জন্য ব্যয় নির্বাহ কি করে হবে সেই ভাবনাতেই তারা কাতর। অথচ, হাজার হাজার টাকা ব্যয় করার পরও নব-দম্পতির হাতে এমন টাকা থাকে না যদ্বারা সুখে দিনাতিপাত করা যায়। শুধু লোক-দেখানো আড়ম্বর, হৈ-চৈ, ধূমপান (গ্রামবাসীদের আপ্যায়নে সুগন্ধি তামাক ও হুঁকা-গড়গড়া ইত্যাদির ব্যবহার), ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় ভোজনেই সব পয়সা ব্যয় হয়ে যায়।'

সবই তো হল, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ের সৌন্দর্যের গোপন রহস্য কি? কোথায় তাদের রূপের উৎস?

ওয়ার্ড সাহেব তার খোঁজ করেছিলেন। তিনিই লিখেছেন—"মেয়েদের গায়ের ত্বক মসৃণ করার জন্য ইওরোপীয় মায়েরা কন্যাদের অতি অল্প বয়স থেকেই নানারকম ওষুধ খাওয়াতে শুরু করেন। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ে সরিষার তৈল সারা শরীরে মাখে—

এই তেলই তাকে গরম, ঠাণ্ডা ও মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে। তারপর পাঁচ বছর বয়স থেকেই চলে রৌদ্রস্নান। ফলে গায়ের রং আবার কালো হতে থাকে। তা সত্ত্বেও জন্মকালে মেয়ের গায়ের রং যাই হোক না কেন (অবশ্যই তুলনামূলক বিচারে সে রং খুব ফর্সা বলতে হবে), সে সব মেয়ের গাত্রবর্ণের রক্তাভা দেখে তুমি অবাক হবে না।”

বিদেশীদের চোখে সতীদাহ

বাংলা দেশে সতীদাহের প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা খুব বেশী নেই। অধিকাংশ বর্ণনাই পরের কাছে শোনা। কয়েকজন মেম সাহেব তো বাড়ির দাসদাসীদের মুখে ঝাল খেয়ে বিস্তৃত ভয়াল-ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক গল্প ফেঁদেছেন। মনে রাখা দরকার, সতীদাহ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। অর্থ-নৈতিক ও সংস্কারগত কারণে উদ্ভূত দেশাচারমাত্র। মুস্লিম শাসনকালে এদেশে হিন্দুমেয়েদের পর্দানসীন হতে হয়েছে, কিন্তু সে সময় সতীদাহ চালু হয়নি। সতীদাহ বস্তুতঃ বৃটিশ শাসনের সূচনায় আইন ও শৃঙ্খলার শোচনীয় অধঃপতনের প্রমাণ। কিন্তু সেকথা কোন ইংরেজ স্বীকার করেনি কোন-দিন। সব দোষ হিন্দুদের কুসংস্কারবোধের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আর সতীদাহ-নিবারণী আইন ও আন্দোলনের কৃতিত্বও কোন ইংরেজের নয়। সে গৌরবের অধিকারী রাজা রামমোহন। স্মরণীয় যে, যে ইংরেজ নরনারী সতীদাহের বিভৎস বর্ণনায় পঞ্চমুখ, তাঁরা দাস-ব্যবসায়ের মত ঘৃণ্য ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি। কারণ দাস ব্যবসায় ইংরেজদের একচেটিয়া ছিল। আর সতীদাহ যখন আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হয়েছে তখনও দাসব্যবসায় উচ্ছেদের জন্য কোন ইংরেজকণ্ঠে মৃদু প্রতিবাদ শোনা যায়নি। সতীদাহ রদ হয়েছে ১৮৩০ সালে আর দাস ব্যবসায় রহিত হয় তারও পনর বৎসর পরে ১৮৪৫ সালে। ভাবতে অবাক লাগে, যে ইংরেজ জাতি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির মত বিদ্বজ্জন সমিতি গড়েছেন, পশুক্লেশ নিবারণের জন্য আইন প্রণয়ন করেছেন, চারুকলা, বিজ্ঞানের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা করে সারা বিশ্বের বিস্ময় ঘটিয়েছেন, সেই ইংরেজ নরনারীদের ব্যক্তিগত ডায়েরী বা চিঠিপত্রের মধ্যেও কোথাও দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্রও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি। অথচ আরব আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাসদের হাত-পা বেঁধে নিয়ে এসে ভারতে বিক্রি করতেন যাঁরা তাঁরা জাতিতে ইংরেজ।

স্মরণীয় যে, মার্কিন কংগ্রেসে ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের জন্য জনৈক শ্বেতাঙ্গ নাগরিক ১৮৩৩ সালে যে আবেদন পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি "রাজা রামমোহন রায়" এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। কারণ রাজা ছিলেন জীবিত মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক

মানবদরদী।*১ সতীদাহকে কেউ দ্রষ্টব্য হিসেবে দেখেননি, যে আকর্ষণে কেউ নাচ বা দুর্গা পুজা দেখতে যায়। দেখতে হয়েছে, কারণ নদীপথই প্রধান যাতায়াতের পথ এবং সতীদাহ নামক ঘটনাগুলি ঘটত নদীতীরেই। সন্তোবিধবা রমণী স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় আরোহণ করে, না তার উপর বলপ্রয়োগ করা হয় সেটি নিঃসন্দেহে জানার কৌতূহল হয়তো ছিল কোন কোন বিদেশীর মনে। কিন্তু তৎসহ ছিল ক্রিশ্চান এথিকস্। জ্যান্ত মানুষকে হত্যা অথবা আত্মহত্যা যাই হোক না কেন, অনুষ্ঠানটি বর্বরতার পরিচয়বাহী, কোন শুদ্ধবিবেকী মানুষ তা সমর্থন করতে পারে না। বিদেশীদের চোখে তাই এই প্রথা অবিমিশ্র বর্বরতা। কোন যুক্তির দ্বারাই সমর্থন করা চলে না।

উইলিয়ম কেরীর বর্ণনায় একটি সামগ্রিক ছবি পাওয়া যায়। কলকাতার ত্রিশ মাইল দূরে এক গ্রামে (১৭৯৯) একটি সতীদাহের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। "দেখলাম বহু লোক নদী তীরে সমবেত হয়েছে। তাদের এই সমাবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা আমায় জানাল যে একটি শবদাহ করতে আসছে। শুধালাম, মৃতব্যক্তির স্ত্রীও সহমরণে যোগ দেবে কিনা। তারা বলল—হ্যাঁ। এবং মৃতের স্ত্রীকে দেখাল। স্তূপীকৃত জ্বালানি কাঠের একপাশে মহিলাটি বসেছিলেন, সেই কাঠের স্তূপের মাথায় তার স্বামীর মৃতদেহটি রাখা ছিল। মহিলাটির পাশে বসেছিলেন তাঁর নিকট আত্মীয়রা। একপাশে একটি ঝুড়িতে কিছু মিষ্টান্ন। আমি প্রশ্ন করলাম, তিনি স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতে চলেছেন কিনা। অথবা কোন অন্যায় প্রভাবে বাধ্য হয়ে এই পথ বেছে নিচ্ছেন। তারা জবাব দিলে, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়। আমি যতক্ষণ পারলাম যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তারপর ব্যর্থ হয়ে আমার সকল শক্তি দিয়ে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করলাম। বললাম, তোমরা যে কাজ করছ সেটা আসলে নৃশংস নরহত্যা। কিন্তু তারা বলল, এ হল পুণ্যকর্ম এবং শ্লেষভরে জানাল, আমার যদি দেখতে ভাল না লাগে তবে আমি যেন স্থানত্যাগ করি। বললাম, না, আমি যাব না। এই নরহত্যা আমি নিশ্চয়ই দেখব, ঈশ্বরের দরবারে বিচারের সময়

*১ **"In closing this addern (Address to the Members of the Congress on the abolition of Slavery, Washington) allow me to assume the name of the most enlightened and benevolent of the human race now living, though not a white man, Rammohan Roy."**

(Rammohan Roy, and America Andaianue Moore.)

আমি সাক্ষী দেব। বিধবার কাছে গিয়ে জীবন নষ্ট না করার জন্য কাতর অনুনয় করলাম। বললাম, ভয়ের কিছু নেই, যদি তুমি নিজেকে আগুনে পোড়াতে অস্বীকার কর তোমার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু মহিলাটি বেশ শান্তচিত্তে চিতায় আরোহণ করল। এবং হৃদয়ের প্রশান্তি প্রকাশের জন্যই বোধহয় দু হাত বাড়িয়ে নাচল। অবশ্য চিতায় আরোহণের আগে তার আত্মীয়রা তাকে চিতার চারিদিক ছ'বার প্রদক্ষিণ করায়, প্রদক্ষিণকালে বিধবাটি সন্দেশগুলি উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করে। জনমণ্ডলীও এই সন্দেশ পবিত্র প্রসাদের মত ভক্ষণ করে। তারপর সে চিতায় উঠে মৃত স্বামীর পাশে শয়ন করে একটি হাত তার কাঁধের নিচে ও অপর হাতে কাঁধের উপরে স্থাপন করে। এই দুই দেহের উপর শুকনো নারিকেল পাতা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি স্থাপন করা হয়, সর্বোপরি ঢেলে দেওয়া হয় ঘি। তারপর বাঁশ দিয়ে বেশ শক্ত করে চেপে রাখা হয়। তারপর লাগানো হল আগুন। শুকনো দাহ্য বস্তু সাজানো হয়েছিল, কাজেই দ্রুত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আগুন জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জনতা শিবের নাম নিয়ে উচ্চৈস্বরে চেঁচাতে শুরু করল। মহিলাটির কণ্ঠস্বর শোনার উপায় ছিল না। সে আর্তস্বরে চিৎকার করেছিল কিনা সেটা কোলাহলের জন্য শোনা গেল না। তার পক্ষে ঠেলে উঠে আসা বা বের হয়ে আসার জন্য চেষ্টা করার পথ বন্ধ, কারণ বাঁশ দিয়ে তাকে ঠেসে বেঁধে রাখা হয়েছে। ছাপাখানায় কাগজকে যেমন দুপাশ থেকে চেপে দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি।

আমরা প্রবল প্রতিবাদের স্বরে বললাম, "এভাবে জোর করা অন্যায়, আগুনের যন্ত্রণায় পালিয়ে আসার পথ রোধ করা কেন? তারা বলল, আগুন যাতে নিচে পড়ে না যায় সেজন্যই বাঁশ বাঁধার ব্যবস্থা। এ দৃশ্য বেশীক্ষণ দেখা যায় না। জোর করে তাদের বললাম, সহমরণ নয়, এহল নৃশংস হত্যাকাণ্ড—এই কথা বলে সেই স্থান ত্যাগ করলাম।"

এশিয়াটিক জার্নালে (১৮২৪) জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী একই স্বামীর চিতায় দুই সতীনকে একযোগে আত্মাহুতি দিতে দেখেছেন। "কাউকে বাঁশ দিয়ে বাঁধা হয়নি। বড় বৌয়ের বয়স পঞ্চাশ, ছোটর প্রায় চল্লিশ। চারদিকে প্রবল হরিবোল হরিবোল ধ্বনি, তার মধ্যে দুজনে চিতার উপর উঠে স্বামীর শবের দুইপাশে শয়ন করল। দেখতে দেখতে চিতার আগুনের অন্তরালে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। কোনপ্রকার বলপ্রয়োগ করা হয়নি, ঔষুধ খাইয়ে নেশাগ্রস্তও করা হয়নি। এমন কি বাঁশ দিয়েও বেঁধে রাখা হয়নি। বিনা প্রতিবাদে তারা মৃত্যু বরণ করল। এর পর হরিবোল ধ্বনি প্রবলতর

হয়ে উঠল এবং তাদের নিকট আত্মীয়জনের মুখ দেখে মনে হল যেন খুশি হয়েছে। আমি ভীত সন্ত্রস্তচিত্তে ঘটনাস্থল ত্যাগ করলাম।

শ্রীরামপুর মিশনের প্রখ্যাত পণ্ডিত মার্শম্যানের সঙ্গে বিশপ হেবারের আলোচনা হয়েছিল সতীদাহ সম্পর্কে।

"ডাঃ মার্শম্যান বললেন, তিনি প্রথম যখন বাঙলাদেশে আসেন, তখনকার তুলনায় আজকাল এই বীভৎস অনুষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এই বৃদ্ধির কারণ হিসাবে তিনি মনে করেন ধনী ও মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের জীবনযাত্রায় পশ্চিমী প্রভাবের ফলে ব্যয়বৃদ্ধি ও তার ফলে অভাব, সেই অভাবের ফলে বিধবা মা বা অন্যান্য স্ত্রীলোকদের ভার বহনের অনিচ্ছা, পরিণতিতে সহমরণ। আর এক সম্ভাব্য কারণ, বয়স্ক পুরুষদের ঈর্ষা। তারা ইহজীবনে একাধিক দারপরিগ্রহ করেই খুশী নয়, মৃত্যুর পরেও স্ত্রীদের উপর অধিকার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তজ্জন্য জীবদ্দশায় তাদের দিয়ে অথবা আত্মীয়দের দিয়ে সহমরণ অনুষ্ঠানের শপথ করিয়ে নেয়।

তাঁর (মার্শম্যানের) দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বাঙলা দেশে এই ঘটনা প্রায়ই ঘটে বটে, কিন্তু এই বাঙলা দেশেই এই প্রথা রহিত করা সম্ভব, বড় জোর মৃদু প্রতিবাদ উঠবে।

"সতীদাহ রহিত করার উদ্যোগকে কেবল এদেশের রমণীরাই উচ্চকণ্ঠে অভিনন্দিত করবে তা নয়, পুরুষরাও করবে। কারণ যারা সহমরণের সময় সমবেত হয় তাদের মধ্যে অতি সামান্য কয়েকজনের স্বার্থ এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে, আর যে মা, ভগিনী বা পরিবারের অন্যান্য রমণীর স্নেহচ্ছায়ায় একজন লালিত-পালিত হয়েছে, যে রমণীর জন্য পুত্র পৃথিবীর আলোক দর্শনে ধন্য হয়েছে, সেই মা ভগিনীকে আগুনে ঠেলে হত্যা করতে কেউ সহজে চাইবে না।

"মার্শম্যান বললেন, তিনি যখন প্রথমে ভারতে আসেন তখনকার মত ব্রাহ্মণদের আর সে ক্ষমতা নেই, প্রতিপত্তিও অন্তর্হিত। সাধারণ মানুষের মধ্যেও বহু ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তি আজ রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে একযোগে এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য প্রকাশ্যেই অভিমত প্রকাশ করছেন। এবং একথাও আজ সকলেই জেনে ফেলেছে যে, কোন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে এই রকম বিধান নেই। অবশ্য কেউ কেউ এই রীতির গুণগান যে না করেন এমন নয়।

"ডাঃ মার্শমান যে কথা বললেন, অনুরূপ অভিমত আমি শুনেছি সদর দেওয়ানি আদালতের এক প্রবীণ বিচারকের মুখে। অবশ্য গভর্নমেন্টের অভিমত স্বতন্ত্র।

গভর্নমেণ্টের অভিমত এই যে, জোর করে আইনের দ্বারা যদি এই প্রথা রহিত করার চেষ্টা হয় তবে জেদের ফলে এই প্রথা আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। এই অন্যায় প্রথা হয়ে উঠবে গর্বের বস্তু। এখন তো তবু অবস্থা মন্দের ভালো। এখন চিতায় আরোহণের আগে বিধবা মহিলাকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জানাতে হয় যে সে স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতে চায়। এবং তবেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবেদন মঞ্জুর করেন। এই প্রথা যদি আইনের সাহায্যে রহিত করা হয়, তবে লাইসেন্সের জন্য কেউ আর অপেক্ষা করবে না। সমাজের নিন্দা ও ঘৃণার ভয়ে আগেভাগেই বিধবারা চিতায় আরোহণ করে বসবে। এদেশের হিন্দুদের যদি খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করতে হয়, তবে সর্বাগ্রে গভর্নমেণ্টকে দূরে থাকতে হবে। মনে রাখা দরকার, এদেশের আচার-অনুষ্ঠান আমাদের দৃষ্টিতে যত হিংস্র বর্বরতাই হোক না কেন, এদের নিজেদের কাছে সে-সব পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান।"

সতীদাহ রোধের ব্যাপারে গভর্নমেণ্টের আপোষমুখী মনোভাবে হেবার আংশিক সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও হাচিসন গভর্নমেণ্টকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত নন। কঠোর ভাষায় তিনি সরকারের সমালোচনা করেছেন—"ভাবলে কষ্ট হয় যে, বৃটিশ সিংহ গভর্নমেণ্ট হাউসের চূড়ায় বসে দীর্ঘ দিন আত্মসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে কেবল চেয়ে দেখেছেন এবং টাকার ঝলকানি বা ঝনঝনির দ্বারা তার রাগ শান্ত করা যায়।

"পুত্র তার জীবন্ত মাকে চিতায় তুলে দিচ্ছে এমন দৃশ্য ভাবতে পারো! কিন্তু এই ঘৃণ্য কুৎসিত অনুষ্ঠান চলতে দেওয়া হয়, এবং সারাদেশে ইওরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট-প্রদত্ত লাইসেন্সের দ্বারা এই প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়।" (১৯শে অক্টোবর, ১৮২৬)

ক্যালকাটা জার্নালে সতীদাহের অনেক বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে। সতীদাহের নিন্দা করে এবং সরকারী অকর্মণ্যতায় ক্ষোভ প্রকাশ করে নিবন্ধ যেমন এতে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি প্রগতিশীল সংস্কৃতিকামী হিন্দুদের পত্রও ইওরোপীয় সম্পাদক সানন্দে প্রকাশ করেছেন। 'নটিকাস' ছদ্মনামে জনৈক ইওরোপীয় পাঠক একটি পত্রে লিখেছেন।

"নরম লোকহিতর আইন বা ধর্মের দ্বারা বাঙালীর কোন সুফল হয়নি। কারণ এই দুটোকেই তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়েছে, হতভাগ্য রমণীর অনুকূলে একটিকেও তারা ব্যবহার করেনি। আমাদের দোষগুলি তারা চমৎকার আত্মসাৎ করে। কিন্তু আমাদের একটি গুণও কি তারা গ্রহণ করেছে? আমাদের আগেরটি যেমন আছে, ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরেরটিও আছে। কিন্তু বাঙলাদেশের ঠাণ্ডা নির্দোষ অধিবাসীদের সম্পর্কে একথা বলা যায় কি? ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির

ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ও ভাবের আদান প্রদানের পরিমাণ বাঙালীদের মধ্যে বেড়েই চলেছে, ইওরোপীয় প্রভাব বাঙালীদের মধ্যে বড় কম নয়। অথচ দেখা যায়, আমরা এই প্রথার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও, বাঙালীরা নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে এই প্রথাকে সমর্থন জানায়।

গত দশ মাসে আমি একই স্থানে তিনটি নারীহত্যা (সতীদাহ) ঘটতে দেখলাম। প্রতিবারই এই ঘটনার কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছি, এই আশায় যে আইন সভায় তথা বৃহত্তর সমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে। আজও সেই আশা ত্যাগ করিনি কারণ ভারতের অন্যান্য 'বিদেশী' উপনিবেশগুলিতে এই হত্যাকাণ্ড রোধের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। আমি একথা বিশ্বাস করি না যে, ফরাসি, পর্তুগীজ এমন কি ডাচরাও যে মানবতাবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে এই প্রথা রহিত করেছে, সেই মানবতা-বোধ ইংরেজদের নেই।"

বিদেশীদের চোখে পাল্কী

নবাগত ইংরেজ-নন্দন জাহাজ থেকে নেমে চৌরঙ্গীতে এসে দাঁড়ালেন। নেশার ঘোরে চোখ দুটি রাঙা। কোন রকমে একটা ল্যাম্পপোষ্টে ভর দিয়ে পথের দিকে চেয়ে দেখলেন—যা দেখলেন তাতে নেশা ছুটে যাবার দাখিল। সার বেঁধে কফিন নিয়ে চলেছে শব-বাহকের দল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছ'টি কফিন রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গেল। এপিডেমিক নাকি ?

মহামারী যে নয় এ-তত্ত্ব তিনি অবশ্য কয়েক মিনিট পরেই বুঝতে পেরেছিলেন। নেশার ঝোঁকে যাকে তিনি কফিন বলে ভেবেছিলেন, পরে জেনেছিলেন তারই নাম পাল্কী। তাতে বহন করা হয় জ্যান্ত মানুষ, আর একমাত্র বড়লোকেই এই বিচিত্র যানটির আরোহী হতে পারে। সেকালে এই নবাগত ইংরেজ যুবকের দৃষ্টিবিভ্রমকে অবলম্বন করে 'চারিভরি'তে কার্টুন প্রকাশিত হয়েছে।

বেকন বিলেতে থাকতে জনসনের ডিক্সনারীতে দেখেছিলেন পাল্কী শব্দের অর্থ Indian Sedan. পরে ভারতে এসে যখন পাল্কী প্রত্যক্ষ করলেন তখন জনসনের বাপান্ত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। পাল্কীকে বেকন barbarous method of locomotion বলে অভিহিত করেছেন। চার্লস গ্রাণ্ট আরও অপ্রিয় সত্য ফাঁস করে দিয়েছেন। "সাহেবদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই প্রথমবার পাল্কী চড়তে গিয়ে অপ্রস্তুত হতেন। যেখানে পা রাখতে হয় সেখানে রাখতেন মাথা, আর মখমল আঁটা যে স্থানটিতে পিঠে রাখার নিয়ম সেখানে রাখতেন পা।"

অন্যান্য যানের মত পাল্কীও নানাবিধ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। লিনসোটেন তাঁর গ্রন্থে ১৫৯৮ সালের প্রচলিত পাল্কীর একটি ছবি দিয়েছেন। তার পোশাকী নাম যাই হোক, আসলে বাঁশে ঝোলানো চৌপাই ছাড়া সেটা আর কিছু নয়। হ্যাড্‌লী এই চৌপাইকে বলেছেন, বেড প্যালাঙ্কিন। তাঁর মতে এই পাল্কী দু'রকমের—চেয়ার পাল্কী ও বেড পাল্কী। চেয়ার পাল্কী অনেকটা সিডান চেয়ারের মত দেখতে। একমাত্র কলকাতা শহরেই চলে। আর বেড পাল্কী হল কোচের মত বেশ সুন্দর গদী-আঁটা। দূর পাল্লার যাত্রায় এই পাল্কী খুব জোরে যেতে পারে। বোধ করি সে কারণেই উইলিয়মসন একে বলেছেন "ফ্লাই-প্যালাঙ্কিন"।

চারপাই বা পাল্কী, যাই বলা হোক না কেন, এগুলির বাহার ছিল খুব। আঠারো

শতকের শুরুতে হল এদের গায়ে অলঙ্করণ। চারটি পায়ে আঁটা হল পিতলের তবক্, কোচের দুই হাতার সম্মুখের দিক তক্ষণ করে আঁকা হল বাঘ বা কুমীরের মুখ। বর্ষার সময় যাত্রী যাতে না ভিজে যায় তার জন্য বাঁশের ফ্রেম বানিয়ে আঁটা হল মোম মাখানো কাপড়। প্রথম দিকে পায়া ছিল খুব বড়, সেজন্য যাত্রীকে মাটি থেকে বেশ একটু উঁচুতে বসতে হত। পরবর্তী কালে পায়া ছোট হয়ে আসে, মাথার উপরটাও আর নিরাবরণ থাকে না। যাত্রী যাতে বেশ একটু আরামে হাত পা ছড়িয়ে বসতে পারে সেজন্য ভিতরে স্থান ছিল যথেষ্ট। উইলিয়মসনের বিবরণ অনুসারে এগুলি চওড়ায় ছিল সাড়ে চার ফুট।

যাঁদের অবস্থা কিছু ভাল তাঁরা দু'রকম পাল্কী বাড়িতে রাখেন। একটি নিত্য ব্যবহার্য, দ্বিতীয়টি বিশেষ উৎসব উপলক্ষে। কোম্পানীর অফিসাররা দেশীয় রাজন্যদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে পাল্কী তৈরি করাতেন। তাঁদের পাল্কীর সাজগোজ ছিল দেখবার মত। কোম্পানীর ১৭১৬ সালের কন্সালটেসনে (১২ই জুন) বলা হয়েছে—"পুরাতন তিনটি পাল্কী অব্যবহার্য হয়ে পড়ায় সেগুলির যাবতীয় রূপার সাজ ওজন করে বিক্রী করে দেওয়া হোক।"

বেড পাল্কীর স্বর্ণ যুগ ছিল আঠারো শতকের শেষ দিকে। উনিশ শতকের শুরুতে দেখা দিল "মহন্না"। উইলিয়মসন ১৮১০ সালে লিখেছেন—বেড পাল্কী এত সেকেলে হয়ে গেছে যে, ইউরোপীয়ানরা কেউ আর তা ব্যবহার করে না। সবাই ব্যবহার করে মহন্না। মহন্নার চারটি পায়া, উচ্চতা মাটি থেকে এক ফুট। উচ্চতা এমন যাতে একটি প্রমাণ আকারের মানুষ খাড়া হয়ে বসতে পারে। অর্থাৎ তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট, লম্বায় ছ' ফুট, চওড়ায় দুই থেকে আড়াই ফুট। মহন্না যাতে বেশী ভারী না হয়, সেজন্য এতে কাঠ ব্যবহার করা হত কম, বেত ও বাঁশের ব্যবহার ছিল বেশী। দু পাশে অনেকখানি স্থান খালি থাকত দরজা হিসাবে ব্যবহারের জন্য। বাকীটুকুর মধ্যে নিম্নাংশের পাতলা কাঠের ও উপরাংশের ভেনেসিয়ান কাঁচের আবরণ। বসবার স্থানে আঁটা গদী চারদিকে সাদা রঙের দেওয়াল। দু পাশে দুটি সেলফ্, একটি ছোট আয়না, চিরুণী, হয়ত টুকিটাকী আরও কিছু। গরমকালে খোলা দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হত খস্। সেই খস্ সর্বদা ভিজে রাখবার জন্য দুজন ভিস্তিওলা পাল্কীর দুই পাশে ছুটত জল নিয়ে।

সবচেয়ে রাজকীয় পাল্কীর নাম ছিল নোল্‌কি। এর বর্ণনা কেউ দেননি, শুধু উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত নবাবরাই এগুলি ব্যবহার করতেন। সাহেব-মহলে

বেড পাল্কী

চৌপাই (পাল্কীর পূর্বাবস্থা)

মহল্লা
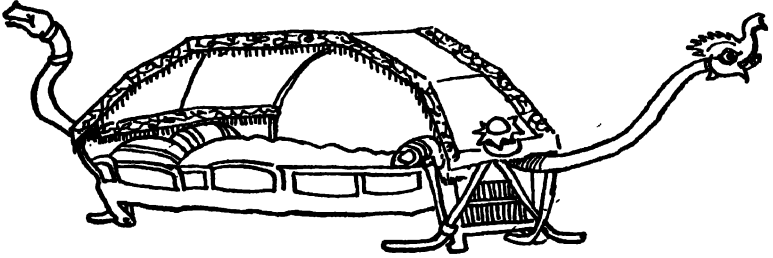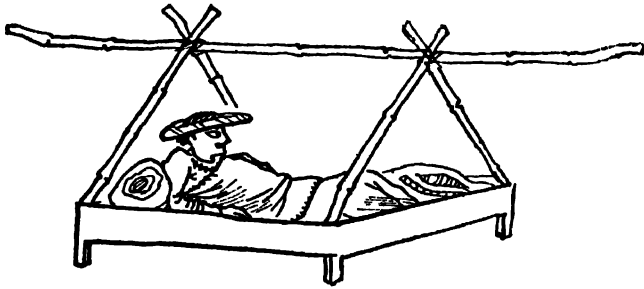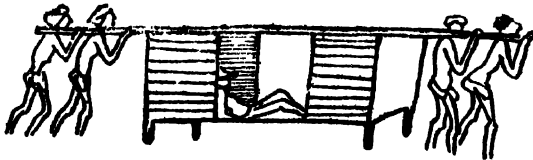
সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে 'বোচা' বা চেয়ার-পাল্কী। মেমসাহেবরা হামেশাই বোচা ব্যবহার করতেন। দূর পথ যাবার সময় সাহেবরাও পছন্দ করতেন, কারণ খুব সরু পথ দিয়েও বোচা চলতে পারে, বাহক লাগে কম। যাত্রী দুজন হলে ব্যবহৃত হত তাঞ্জাম। বোচা ও তাঞ্জামের অঙ্গসজ্জা ছিল দেখবার জিনিস। রথের উপর সিডান চেয়ার বসালে যেমন দেখতে হয়, বোচা হল তাই। আর তাঞ্জাম হল পাহাড়ী-পথের ঝাঁপানের মত। ইউরোপীয়ানরা তাঞ্জাম ব্যবহার করেছেন কম, তবে সাজ-সজ্জার প্রশংসা করেছেন সবাই।

১৭৮০-তে হ্যাডলী লিখেছেন, "The palanquin is so necessary an article at Calcutta that even European artificers keep them. কিন্তু যতই 'নেসেসারী' হোক না কেন, কোম্পানীর লণ্ডনস্থ ডিরেক্টরবর্গ নিম্নস্তরের কর্মচারী-দের পাল্কী ব্যবহারে বাদ সাধলেন। তাদের মতে সামান্য বেতনের রাইটারদের পাল্কী ব্যবহার বিলাসিতা মাত্র। ১৮৫৪ সালে রাইটারদের হুকুম দেওয়া হল ঘোড়া চেয়ার বা পাল্কীর খরচ বন্ধ করার জন্য। রাইটাররা এই আদেশ নিঃশব্দে মেনে নিলেন না, তাঁরা লণ্ডনে ডিরেক্টরদের কাছে আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করলেন। যতদিন এই আবেদনের জবাব না আসে ততদিন পাল্কী ব্যবহারের অনুমতি কলকাতার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দিলেন। বলা বাহুল্য, ভারত থেকে লণ্ডনের অফিসে আবেদনপত্র পাঠালে তার জবাব আসতে সময় লাগতো কমপক্ষে এক বৎসর। কোম্পানির জবাব এল এক বৎসর পর। জানালেন—তাঁরা রাইটারদের পাল্কী ব্যবহারের অনুমতি মঞ্জুর করতে অক্ষম। কোম্পানির কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে অসাধু উপায়ে অর্থ উপার্জনের যে অভিযোগ পাওয়া যায়, পাল্কী ব্যবহারের দ্বারা সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

লণ্ডনের ডিরেক্টরবর্গ অনুমতি না দিলেও কোম্পানির কর্মচারীরা যথাপূর্ব পাল্কী ব্যবহার করে যেতে লাগলেন এবং তাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মৌনসম্মতি যে না ছিল এমন নয়।

১৮৫৮-তে ডিরেক্টরবর্গ চরম হুকুমনামা পাঠালেন—...**no writer whatsoever be permitted to keep either palanquin, horse or chaise, on pain of being immediately dismissed from our service.**

কোম্পানির পূর্ব আদেশের ন্যায় এই আদেশেও কেউ কর্ণপাত করেনি। তার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ তার বহু পূর্বেই কলকাতার রাস্তার নতুন চক্রযানের

অভ্যুদয় ঘটেছে। হেস্টিংসের আমল থেকেই কোম্পানির কর্মচারীরা একটু একটু করে পাল্কী ছেড়ে কেরাঞ্চি গাড়ি ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। এবার শুরু হল ব্যাপকভাবে।

বিশপ হেবার কলকাতার (১৮২৪-২৫) ইওরোপীয়দের বিলাসিতার বর্ণনা দিতে
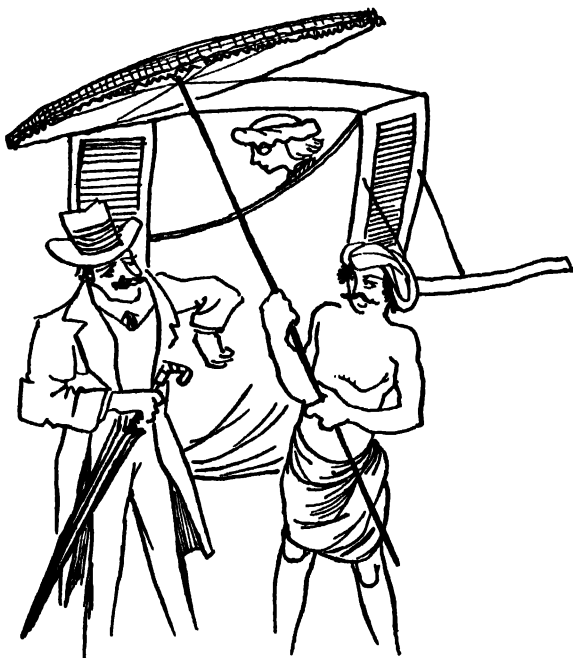
বোচা বা চেয়ার পাল্কী

গিয়ে বলেছেন—তারা এমন পাল্কী ব্যবহার করে যার দাম তিনশো টাকা। পুর্বে নাকি এক একটি পাল্কী তিন হাজার টাকা দামেও বিকিয়েছে।

উনিশ শতকের প্রথম দিকেও কলকাতায় পাল্কীর পরাক্রম ছিল অব্যাহত। সাহেবরা পাল্কী চড়ে যেতে যেতে শুনেছেন পাল্কীর গান, অবশ্য বাহকের কণ্ঠে। একবার এক সাহেবের আগ্রহ হল গানের মর্মার্থ জানার। সব শুনে তার তো চক্ষুস্থির। ডিউয়ার সাহেব গানটি সংগ্রহ করে রেখেছেন—

Oh what a heavy bag.
No, it is an elephant.
He is an awful weight.
Let us throw his palki down.
Let us set him in the mud.
Let us leave him to his fate.
Aye, but he will hit us then with a thick stick.
Then let us make haste and get along
......Hop along quickly.

চার্লস গ্রাণ্ট পাল্কী রাখার খরচ সম্পর্কে বিস্তৃত হদিস দিয়েছেন। ঠিকা পাল্কীর ভাড়া ছিল তাঁর সময়ে (১৮৪০) মাসিক ২৫ টাকা, অবশ্য বাড়িতে পাল্কী রাখলে খরচ পড়ত ৩৫ টাকা। সাহেবরা ভাড়া পাল্কী ব্যবহার করত খুব কম। প্রাইভেট পাল্কীর বেহারা রব্বানি হলে লাগত ছ' জন, আর ওড়িয়া হলে লাগত পাঁচজন। রব্বানীরা ছ'জনেই পাল্কীর সঙ্গে ছুটত, কিন্তু ওড়িয়ারা পাঁচজনে ছুটত পাল্কীর সঙ্গে, একজন সঙ্গীদের আহার্য বহন করত।

সে সময়ে ঠিকা বেহারার দৈনিক ভাড়া ছিল পাঁচসিকে, এর মধ্যে পাল্কী ভাড়া চার আনা ও বাকী এক টাকা সকলের মধ্যে বণ্টিত হত। ঠিকা পাল্কী ভাড়া নিতে হত সারাদিনের জন্য। বাহকদের নিজস্ব বলে কোন পাল্কী ছিল না।

গ্রাণ্টের সময়ে কলকাতার রাস্তায় ঘোড়ার প্রাধান্য ছিল খুব বেশী। সেজন্য পাল্কীর নাম তিনি উল্লেখ করেছেন সব শেষে। তাঁর সময়ে কলকাতায় পাল্কী-বাহকের সংখ্যা ছিল এগার হাজার পাঁচশো। এই বিপুল সংখ্যক বাহকদের কর্মান্তরে নিয়োগ করার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। মানুষকে পশুর মত ব্যবহৃত হতে দেখে তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠেছিল।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

of Uhen Paddy first travelled in Calcutta in a Palki, on hearing কেbolical grunts of the bearers, he got out to walk ; for he প্রয়োজ oor Devils ! they must be in great pain,—they groan so."

—Memoir of a Cadet.

"It must be acknowledged that no man of consequence ever makes use of his legs, or goes out of his house but in his palanquin, the ladies are carried in a kind of sedan chair and the gentlemen on little couches six feet long and two feet broad, which in summer has generally a covering scarlet and in a rainy season, one of oiled cloth, they are lined with silk and well stuffed with cotton."

—Letter of John De Couteur.

ঘোড়া-গাড়ি

ঘোড়ায় টানা রথ কবে কে চালু করেছিলেন তার প্রমাণ নেই। নিশ্চয়ই সে অনৈতিহাসিক কালের কথা। দেশী ঘোড়ায় টানা দেশী গাড়িও সেই রথের ঐতিহ্য রক্ষা করে নিজের অস্তিত্ব আজও বজায় রেখেছে। তাতে ফ্যাসান নেই, আধুনিকতার চমক নেই, রূপের জৌলুসে মন ভোলাবার কোন তাগিদও নেই। চলেছে, চলছে এবং চলবে। এরই ফাঁকে হঠাৎ কিছুদিনের জন্য শৌখিন পাড়ায় দেখা গেল হাল-ফ্যাসানি তরুণী, রূপ ও আভিজাত্যের দেমাকে গরবিনী, পথচারী নরনারীর দল অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখল। তারপর সেই লীলাও শেষ হল একদিন, সেই ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করে দেওয়ার জন্য দেখা দিল আধুনিকতর রূপসী। ঘোড়ার গাড়ি পড়ে রইল একপাশে বিগতযৌবন দেহভার নিয়ে। পথে ছুটল পেট্রলের ধোঁয়া উড়িয়ে মোটর গাড়ি।

তবু কলকাতার ঘোড়ার গাড়ি একদা বিদেশীদের মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রতি সন্ধ্যায় সব জরুরি কাজ পিছনে ফেলে কোর্সে (পরে রেস কোর্স) গিয়ে সন্ধ্যায় দাঁড়ানো ছিল অপরিহার্য। কাজেই কলকাতার ঘোড়ার গাড়ির কথাও অপরিহার্য রূপে উল্লিখিত হয়েছে বিদেশীদের ডায়েরিতে, স্মৃতিচারণায়।

বিলেত থেকে প্রথম গাড়িটি ভারতে এসেছিল মোগল-সম্রাটের প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরের উপহার হিসাবে, সার টমাস রো (১৬১৫) সেটি দিয়েছিলেন জাহাঙ্গীরকে। তারপর প্রায় বিনা নোটিশেই একে একে ভুয়ে ভুয়ে ছেয়ে গেল নানা ধরনের গাড়িতে। অবশ্য রাস্তার অভাবে ঘোড়ার গাড়ির চলন সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র কয়েকটি বড় বড় সহরের চৌহদ্দির মধ্যেই।

দেশী গাড়ি তেমন আরামদায়ক ছিল না। অথচ ইওরোপীয় পদ্ধতিতে গাড়ি তৈরি করা ভারতীয় কারিগরদের পক্ষে খুব সহজসাধ্য নয়। সেজন্য প্রথম দিকে গাড়ি

আমদানি করা হত। যাদের হাতে টাকা বেশি ছিল তারাই পারত আমদানি করতে। পলাশী যুদ্ধের আগে কেবলমাত্র ফোর্ট উইলিয়মের প্রেসিডেন্ট এবং কাউন্সিলের প্রবীণ সদস্যরাই ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করতেন। ১৭২৪ সালে ফোর্ট উইলিয়মের প্রেসিডেন্ট মিঃ ডীন ১১০০ টাকা ব্যয় করে একটি গাড়ি ও ঘোড়া কেনেন। এই কেনার খরচও তিনি কোম্পানির টাকা থেকে শোধ করেন। কিন্তু কোম্পানির লণ্ডনস্থ ডিরেক্টরবর্গ এই খবরে চটে যান এবং ডীনকে তাঁর নিজের পকেট থেকে এই টাকা শোধ করতে বাধ্য করেন।

১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্টের ফলে ফোর্ট উইলিয়মে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন এবং কাউন্সিলের সদস্যবর্গের ভারত আগমনের ফলে এদেশের ইংরেজ সমাজে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দেয়। এতাবৎকাল যারা কোম্পানির কর্মচারীরূপে ভারতে আসত, তাদের স্বদেশে তেমন কোন মর্যাদা ছিল না। কিন্তু কাউন্সিলের সদস্য হয়ে যাঁরা এলেন তাঁরা সেদেশের অভিজাত ব্যক্তি। তাদের রুচি ও জীবনযাত্রার মান উন্নত। মাহিনা বেশি, মর্যাদা বেশি, কাজেই ইওরোপ থেকে গাড়ি আমদানি করলেন। তাদের পথ অনুসরণ করে অন্যান্য ইওরোপীয়রাও গাড়ি আমদানি করতে শুরু করলেন। আজ যেখানে রেস কোর্স, সেখানে হত গাড়ির ট্রায়াল।

মিসেস ফে লিখেছেন,—হেষ্টিংসের সময়ে রাইটাররা এদেশে আসার পর দু-এক মাসের মধ্যেই গাড়ি কিনে কোর্সের দিকে ছুটত। ১৭৮০ সালের পূর্ব ত্রিশ বৎসর ছিল অমিতব্যয়ী বিলাসিতার যুগ। আর এই বিলাসিতার অন্যতম অবলম্বন ছিল গাড়ি ঘোড়া কেনা।

১৭৮৪ তে 'এশিয়াটিকাস' কলকাতার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, সন্ধ্যাবেলায় নগরীর কয়েক মাইল রাস্তায় বয়ে চলেছে গাড়ির বন্যা। চ্যারিয়ট, হুইস্কি, ফিট্‌ন্ ইত্যাদি ছিল তাঁর আমলের গাড়ি। প্রত্যেক বছর কোন-না-কোন নতুন ধরনের গাড়ি প্রবর্তিত হত। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় লেডিরা নিজেরাই গাড়ি চালাতেন। চ্যারিয়টের চাকা ছিল চারটে, কিন্তু মাত্র একজন বসত তাতে। অতি উচ্চ-পদাধিকারী ব্যক্তিরা কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবার সময় এই গাড়ি ব্যবহার করতেন। ভারতের দেশীয় ধনীদের জন্য বিশেষ ধরনের চ্যারিয়ট নির্মাণ করা হত। চারিদিকে তার রূপার কারুকার্য। ঘোড়ার মুখের লাগাম তৈরি হত সিল্কের বস্ত্রখণ্ড দিয়ে। হুইস্কিতে ঘোড়া থাকত একটি, আরোহী একাধিক। উনিশ শতকের শুরুতেই হুইস্কি অন্তর্হিত হয়। ১৮০৩ সালে ক্যালকাটা গেজেটের ৬৩নং

কাশীটোলার (কসাইটোলা) গাড়িনির্মাতা মিঃ পার্কিন্স বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, "a serviceable chariot with a pair of strong grey geldings"—দাম ১৪০০ সিক্কা টাকা। ঐ বিজ্ঞাপনেই তিনি জানিয়েছেন a fashionable full-panelled curricle, second hand, with a pair of half Arab bay mares and an exceedingly good harness' দাম ২০০০ সিক্কা টাকা।

A swan-necked gig, which may be occassionally used as curricle with harness—দাম ৬৫০ টাকা। এসব হল ভারতে তৈরি গাড়ি কিন্তু ঐ "সোয়ান-নেক" গাড়ি যদি ইওরোপের তৈরি হয়, তার দাম ১৫০০ টাকা।

১৮০৪ সালের ১লা মার্চ এক বিজ্ঞাপনদাতা Respectfully informs his friends and the public that he has just received for sale a highly finished crane-necked post-chaise painted dark green and lined with yellow morocco, built by Godsall & Co, by particular order of a gentleman of this country, sicca rupees 3500. Also, an elegant and extremely swan-necked post-chaise of the last fashion, body painted light blue morocco and suitable lace, sicca rupees 3000.

চেইস বলতে বোঝায় দু' চাকার গাড়ি, গাড়ির ছাদ খুলে ভাঁজ করে রাখা যায়।

তখনকার দিনে কলকাতার ইওরোপিয়ানরা বৃটেনের ধনীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলত। লণ্ডনে কোন নতুন মডেলের গাড়ি তৈরি হওয়ার খবর কলকাতা পৌছাতে যা দেরি, তৎক্ষণাৎ এখান থেকে অর্ডার চলে যেত—পরের জাহাজেই ঐ গাড়ি পাঠাও। লণ্ডনের গাড়ি-নির্মাতারা জানতো, যত দামই হোক না কেন, কলকাতায় পাঠালে সে গাড়ির দাম উঠবেই। লণ্ডনের টিলবেরী কোম্পানি ছাদবিহীন জিগ্ প্রস্তুত করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কলকাতাতেও সেই জিগ্ চালু হয়েছে। ডিউক অব ক্লারেন্সের নামানুসারে তৈরি হল ক্লারেন্স। চার চাকার গাড়ি, চারটে সিট্। ব্যস্ কলকাতাতেও ছড়িয়ে পড়ল ক্লারেন্স।

১৮১৮ ও তার পরের কয়েক বৎসর কলকাতার রাস্তায় চ্যারিয়ট, ডেনেট, কোচ, বারাউস, কারিকল, বগি, টিলবেরি, সোসিয়েবল, ল্যাণ্ডো, ল্যাণ্ডোলেট, ব্রিসকা, চেইস, ক্লারেন্স ইত্যাদি গাড়ি দেখা যেত। মার্ক টোয়েন তো এদেশটাকে গাড়ি

ঘোড়ার দেশ বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর মতে ইওরোপিয়ান ও ইওরেশিয়ানদের মধ্যে প্রত্যেকেই, নিতান্ত গরিব না হলে এদেশে সবাই গাড়ি-ঘোড়া রাখে। কোলস্‌ওয়াদি গ্র্যাণ্ট (১৮৪০) কলকাতার রাস্তায় "লণ্ডন এণ্ড ব্রাইটন কোচের" কথা উল্লেখ করেছেন। কলকাতায় গাড়ির এরকম চাহিদা দেখে শেষ পর্যন্ত বৃটেনের কারিগররা কলকাতায় আসতে শুরু করলেন। ১৮১৫ সালের ইণ্ডিয়া রেজিস্ট্রারে দেখা যায়, ফোর্ট উইলিয়মে সাতজন ইংরেজ "কোচ-বিল্ডার" বাস করছে। তার মধ্যে স্টুয়ার্ট ও ডাকিট কোম্পানি ১৭৯৭ সালে নিজেদের কারখানা স্থাপন করেছে। মরিসন ও জনস্টন কোম্পানিও কারখানা বসিয়েছে ঐ সময়েই। শ্রীমতী এমা রবার্টস্ ১৮৩৫ সালে ইংলণ্ডে চিঠি লিখছেন:

Very few carriages are brought from England, there being a celebrated coach-maker at Calcutta, there are others in different parts of the country, some maintained by Europeans and others by natives.

জনসনের বিবরণে দেখা যায় (১৮৪৩) ভাল গাড়ির দাম কলকাতায় বেশ ভারি। একটি বগি গাড়ির দাম আটশো থেকে এগারশো টাকা, বারাউস বা ব্রিসকার দাম দু-হাজার থেকে চার-হাজার টাকা, পাল্কি গাড়ির দাম ন'শো থেকে আঠারশো টাকা।

স্টকলার এদেশের বগি গাড়ির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে একটি মাত্র ঘোড়ার কথা বলা হয়েছে। তাঁর মতে স্ট্যানহোপ, ক্যাব্রিওলেটের চেয়ে দেখতে এমন কিছু ভাল নয়। কিন্তু সুবিধা অনেক। একমাত্র পাল্কিগাড়ি ছাড়া আর সব গাড়ির মডেল হল ইওরোপীয়।

পাল্কী গাড়ি আসলে একটি বড় পাল্কি, সামনে ঘোড়া বাঁধবার শ্যাফ্‌ট, চার চাকা, দুই চাকার মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ নিচু স্থান, সেখানে যাত্রীরা পা রাখেন। চালকের বসবার আসন বাইরে একটি কাঠের বাক্স। কোন গাড়ি দু ঘোড়ায়, কোন গাড়ি এক ঘোড়ায় টানে। পাল্কি গাড়ির দরজা ছিল ছাদ থেকে বসার আসন পর্যন্ত লম্বা, দুই পাশে ঠেলে দুই দরজাই বন্ধ করা যেত। বোম্বায়ে এই গাড়ির নাম হল শিগ্রাম। গুজরাটে এই গাড়ি ঘোড়ার বদলে বলদ দিয়ে চালানো হত। কলকাতায় এক ঘোড়ার গাড়িকে কেউ কেউ জৌন বলতেন। মনে হয় "জৌন" কথাটি যান কথাটির অপভ্রংশ।

১৮২৮ এর পূর্ব পর্যন্ত শহরের ধনীরা পাল্কি চড়েই অফিস যেতেন। যে মুষ্টিমেয়

কয়েকজনের বহুমূল্যবান ঘোড়ার গাড়ি ছিল, তাঁরাও অফিস যাবার সময় পাল্কি ব্যবহার করতেন। পাল্কির বেহারার কাজ করত উড়িষ্যার এক বিশেষ শ্রেণীর লোক। ১৮২৮ সালে বেহারাদের নির্দেশ দেওয়া হয় পিতলের ব্যাজ পরিধানের। জাতিচ্যুতির আশঙ্কায় তারা প্রথমে নতুন নির্দেশের প্রতিবাদ জানায়, ও শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট করে। কলকাতায় সেই প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট। কিন্তু সে ধর্মঘট ব্যর্থ হয়। ব্রাউন লো সাহেব তাঁর পাল্কির সঙ্গে চাকা এবং শ্যাফ্‌ট জুড়ে ঘোড়ার সাহায্যে চালালেন। দেখা গেল, বেহারা ছাড়াও চাকা ও ঘোড়ার সাহায্যে পাল্কি চলে। দেখতে দেখতে এই গাড়ি জনপ্রিয় হয়ে উঠল, নাম হল ব্রাউনবেরি। প্রথম দিকে এই গাড়িতে পা গুটিয়ে বসতে হত, যেমন পাল্কিতে বসতে হয়। গাড়োয়ানের জন্য কোচবক্স ছিল না। ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে একজন সহিসকে ঘোড়ার আগে আগে ছুটতে হত। ব্রাউনবেরি জনপ্রিয় হওয়ার প্রধান কারণ—এগুলি হাল্কা ও রাস্তা খারাপ হলেও চলত।

এখন কলকাতায় যে গাড়িকে 'ঠিকে গাড়ি' বলা হয়, তার আদি নাম কেরাঞ্চি গাড়ি। বিশপ হেবারের বর্ণনায় আছে—এই কেরাঞ্চি গাড়ি টানে দুটি ঘোড়ায়। বিলেতের হ্যাকনি গাড়ির অনুকরণে তৈরী এই গাড়ি।

কৌলিন্যের দিক থেকে কেরাঞ্চি গাড়ি অবশ্যই ব্রাত্য। গরিবের অবলম্বন এই গাড়িতে চড়ে অভিজাতরা কেউ সম্মানহানি করতে চাইতেন না। কিন্তু বিপদের সময় এই গাড়িই অনাথের নাথ রূপে দেখা দিত। কোলওয়ার্দি গ্র্যান্ট লিখেছেন, „আপৎকালীন অবস্থায় বা রাত্রিকালে যখন পাল্কি পাওয়া যেত না, তখন অনেক সময় ইওরোপিয়ানরা এই গাড়িতেই ভর করতেন। অবশ্য যাতে তাঁদের মুখ দেখে কেউ চিনতে না পারে সেজন্য গাড়ির দরজায় লাল কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়ে দিতেন।"

গ্র্যান্ট তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে) লিখেছেন, —"কেরাঞ্চি গাড়ি কিভাবে কে জানে, অন্তর্হিত হয়েছে। তার স্থান দখল করেছে পাল্কি গাড়ির মত আর এক গাড়ি, নাম দমদমার। এতে রুগ্ন ঘোড়াগুলির পরিশ্রম বেড়েছে কারণ যাত্রী সংখ্যাবৃদ্ধি।

"দি বেঙ্গলী" গ্রন্থে হেণ্ডারসন উনিশ শতকের শেষ দিকে ঘোড়ার গাড়ির গুণগত অবনতি দেখে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। টাকায় আট আনা বাট্টা কেটে নেওয়া ও সাধারণভাবে দারিদ্র্যবৃদ্ধিই এই অপকর্ষের কারণ। ভারতের নৌ-সেনাপতি সার জন গোর উনিশ শতকের শেষ দিকে

কলকাতায় এসে বলেছিলেন, "১৮০৫ সালে গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে যখন তিনি প্রথম কলকাতায় পদার্পণ করেন, তখনকার তুলনায় বর্তমান কলকাতার যা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যে ঘোড়ার গাড়ির অপকর্ষ সবচেয়ে লক্ষণীয়। সে সময়, বিশেষতঃ ওয়েলেসলির সময় কলকাতায় এমন গ্র্যাণ্ডি কেউ ছিল না যে অন্ততঃ চারঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার না করেছে। আর আজ গাড়ির মালিকদের একমাত্র চিন্তা, একটি হতভাগ্য গাড়ির মধ্যে কত অধিক যাত্রী ঠেসে দেওয়া যায়। আর সেই গাড়ি টানবে ততোধিক হতভাগ্য এক টাট্টু।"

নৌকা

কলকাতার ঘাটে নৌকার বহু বিচিত্র সমাবেশের কথা ডায়েরীতে বা স্মৃতিগ্রন্থে উল্লেখ করতে বড় একটা কেউ ভোলেনি। ইওরোপের সমুদ্রচারী অধিবাসীদের কাছে নৌকা কিছু নতুন জিনিস নয়। তাছাড়া বড় রাস্তার পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং বিপদসঙ্কুল, নদীপথই একমাত্র পথ। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাগিদে নৌকার যে প্রচুর উন্নতি ঘটবে তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। কলকাতার ঘাটে প্রধানতঃ ব্যবসায়িক নৌকার সমাবেশ ঘটত। শৌখিন নৌকার সমাবেশ ঘটত ব্যারাকপুরে। "সেখানকার ঘাট চরম কর্মচঞ্চল। যত রকম জাহাজ ও নৌকা আছে তার সবকিছুই এখানে মিলবে। কোথাও সুন্দর ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া মেল (জাহাজ), কোথাও একটি গ্র্যাব বা আরবীয় ডো, কোথাওবা পুর্বাঞ্চলের প্রোয়া। একদিকে দেশী নৌকার শ্রেণী, ছবির মত সাজানো। নৌকার ওপর তাদের ভাসমান কুটির, আর একদিকে ইংরেজদের ভাওলো বা অন্যান্য শৌখিন নৌকা সবুজ ও সোনালী রঙে সাজানো।" (মেরিয়া গ্রাহাম)। ওদিকে ব্যারাকপুরের ঘাট থেকে কলকাতার দিকে তাকালে চোখে পড়ত "মাস্তুলের অরণ্য" (ফরেস্ট অব মাস্টস)।

গ্র্যাণ্ট লিখেছেন, কলকাতার গঙ্গাতীরে এসে দাঁড়ালে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। সামনে যে জাহাজটি দাঁড়িয়ে, সে বহন করছে ইংলণ্ডের স্মৃতি। সে আবার ফিরে যাবে সেখানে। দুই দেশের মধ্যে ঐ জাহাজটিই তো সংযোগসেতু।

দেশী নৌকা দেখতে যেমনই হোক, দেশী মাঝি বিশেষতঃ কলকাতার মাঝিদের প্রশংসা কেউ করেনি। আঠারো শতক তো বটেই, উনিশ শতকেও জাহাজের ক্যাপ্টেনরা নিজেদের কেবিনে কিছু মাল আনতেন ব্যবসা করার মতলবে। বন্দরে যে সময় জাহাজ নোঙর করত, জাহাজের ক্যাপ্টেন তাঁর সেই মাল নিয়ে সওদা করতে

যেতেন শহরের বাজারে। বাজার তো তাঁর চেনা নয়। নির্ভর করতে হত মাঝিদের উপর। জাহাজ নদীর তীরে আসতে পারে না, দেশী নৌকায় চেপে তীরে আসতে হয়। জাহাজের ক্যাপ্টেনরা কিভাবে দেশী মাঝিদের পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হতেন, তার বিবরণ আছে স্ট্যাথামের 'ইণ্ডিয়ান রিকালেক্‌সন' গ্রন্থে।

"নবাগত জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে দেশী নৌকার মাঝি বলে 'I go with master, else black fellows cheat master.' ক্যাপ্টেন রাজি হয়। ঘাটে পদার্পণের পর মাঝি বেশ একটু গম্ভীরভাব ধারণ করে, কারণ সাহেবের সে গাইড, কাজেই ইজ্জত বেড়েছে। সাহেব কোন্ পাল্কীতে চড়বে সেটাও মাঝিই ঠিক করবে। আসল কথা, যে পাল্কী-মালিক তাকে বেশী দস্তুরী কবুল করবে তার পাল্কীই সে সাহেবের জন্য ভাড়া করবে। ক্যাপ্টেন খোস মেজাজে পাল্কীতে চাপেন, পিছনে মাঝি চলে ওল্ড চীনা বাজার বা অন্য কোন বাজারের উদ্দেশে। ডিঙ্গিওয়ালা যেখানে যেতে বলে, পাল্কীওয়ালা সেখানেই সাহেবকে নিয়ে যায়। ফল দাঁড়ায় এই যে, বেচারী ক্যাপ্টেনকে পরদিন আর চেনা যায় না। তার পোশাক ধূলিমলিন, পকেট একেবারে খালি।"

একজন তরুণ সৈনিক নৌকাযোগে কলকাতা থেকে বহরমপুর গিয়েছিলেন। তিনি ভাগীরথীতে নৌকাভ্রমণ উপভোগ করেছিলেন খুব।

"ভারতের নদীবক্ষে ভ্রমণ সত্যিই আনন্দদায়ক। স্থলপথে বা সমুদ্রপথে ভ্রমণের যে সমস্ত গুণ বা আনন্দ আছে, উভয়ই ভারতের নৌকাভ্রমণে পাওয়া যায়। ধীর গতি। এত ধীর যে, নৌকার পাটাতনে বসে ছবি আঁকার বা গৃহস্থালী কাজের কোন ক্ষতি হয় না। অথচ প্রয়োজন হলে, আবহাওয়া যদি ভাল থাকে, তীরে নেমে স্বচ্ছন্দে পায়ে হেঁটে আনন্দ উপভোগ করা চলে। সমুদ্রযাত্রীরা সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত।

"হাওয়া যখন অনুকূল থাকে না, তখন মাঝিদের গুণ টানতে (tow rope) হয়। নৌকার মাস্তুলে দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে অপর প্রান্ত হাতে নিয়ে দুজন মাঝি তীরে যায়। তার পর হাঁটতে থাকে। নদীর তীর ধরে চলার সময় যদি কোন খাল বা খাঁড়ি পড়ে তবে, তাদের সাঁতরে পার হতে হয়। তীরে যদি বালির চর থাকে, রৌদ্র যদি প্রখর হয়, তখন সেই তপ্ত বালুচর পায়ে হেঁটেই অতিক্রম করতে হয়। মাঝিদের জীবন কষ্টের জীবন। তবু তাদের মুখে হাসি লেগে আছে। তারা খুব কমই দীর্ঘজীবী হয়।"

হেবারও মাঝিদের প্রশংসা করেছেন। মাঝিদের এত পরিশ্রম সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটে, আর বিশপের মতে তার জন্য দায়ী সাহেব আরোহিগণ।

"অকারণ দেরি করে মাঝিদের কোন লাভ নেই। কখনও কখনও তারা অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করে বটে, কিন্তু তাদের নদীকে তো তারাই ভাল জানে, এবং আমাদের (সাহেবদের) চেয়ে আবহাওয়ার মেজাজ তারাই ভাল বোঝে। ইওরোপীয়রা গঙ্গায় ভ্রমণের সময় যে-সব দুর্ঘটনায় পড়ে, তার অধিকাংশের কারণ মাঝিদের ইচ্ছা ও বিচারের বিরোধিতা করে তারা তাদের দ্রুত এগিয়ে যেতে বাধ্য করে।"

বিদেশীদের চোখে দেশী চাকর

মোগলদের হাত থেকে রাজ্যশাসন দায়িত্ব গ্রহণের সময় ইংরেজদের ঐতিহ্যসূত্রে তার ভৃত্যমণ্ডলীকেও গ্রহণ করতে হয়েছিল। মোগল শাসনের ধার না থাক, ভার ছিল অনেক, ভৃত্যমণ্ডলীই তার প্রমাণ। মোগল-দরবারের রীতি অনুসরণ করে সাহেব বাড়ির নফরকুলের ভাষাও উর্দ্দু বা ফার্সি। সেই দরবারী রেওয়াজ অনুসারেই এখানেও প্রত্যেক নফরের কাজের চৌহদ্দি নির্দিষ্ট, একের সীমানায় অপরের পা দেওয়া বেইমানি, সেই কাজের ভিত্তিতেই পদমর্যাদাজ্ঞান টনটনে। সেই দরবারী রীতিতেই কাজ না থাকলেও, প্রয়োজন না হলেও পদ আছে, সেই সব পদে লোকও নিযুক্ত আছে। নতুন শাসকদেরও উপায় ছিল না। দাস-দাসীর সংখ্যা একটু বেশি না হলে লোকের মনে সম্ভ্রম জাগবে না। তাছাড়া বিলাসের প্রতি মোহ সাধারণ মানবধর্ম। অবস্থা এক সময়ে এমন দাঁড়ালো যে, ব্যক্তিগতভাবে কেউ আড়ম্বর পছন্দ না করলেও, নফরতন্ত্র অপছন্দ হলেও, কোমলি নেহি ছোড়তা।

ওয়েলেসলি ছিলেন প্রবল বিলাসী। বর্ণাঢ্য জীবন ছিল তাঁর কাম্য। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এলেন নতুন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ। নিয়ম অনুসারে পাত্র-মিত্র ও নফরবাহিনী সাজিয়ে ওয়েলেসলি এসে দাঁড়ালেন গভর্নমেণ্ট হাউসের প্রবেশদ্বারের সিঁড়িতে। স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন কর্ণওয়ালিশকে। দুই মার্কুইস পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। কর্ণওয়ালিশ ছিলেন সহজ সরল মানুষ, এত আড়ম্বর তাঁর অপছন্দ। ওয়েলেসলির ভৃত্যবাহিনী দেখে তিনি রেগে আগুন। তিনি কি বৃদ্ধ? অশক্ত? পঙ্গু? তবে তাঁকে সাহায্য করার জন্য কেন এই অকারণ আয়োজন। পার্শ্ববর্তী বন্ধুকে বললেন, **I do not want them, I do not want them. I have not yet lost the use of my legs. Thank God I can walk very well.**

এর পর কর্ণওয়ালিশকে দেখা যেত রাস্তায়—দুই ঘোড়ায় টানা সাধারণ গাড়িতে চড়ে চলেছেন—যে সে লোক নয়, স্বয়ং গভর্নর জেনারেল, সঙ্গে মাত্র একজন, সেক্রেটারী রবিনসন। তখনকার রেওয়াজ অনুসারে গভর্নর জেনারেলের আগমন ঘোষণা করে গাড়ির আগে আগে কোন ঘোড়সওয়ার ছুটে যেত না, পিছনেও কোন দেহরক্ষী বাহিনী সদম্ভে অনুসরণ করত না। কিন্তু ওয়েলেসলিকে তখনও গভর্নর

জেনারেলের পদ ত্যাগ করার পরও, দেখা যেত ছয় ঘোড়ায় টানা বহু মূল্যবান গাড়িতে চলেছেন। পিছনে দুজন দেহরক্ষী, তারও পিছনে 'ড্রাগন' বাহিনীর কয়েকজন ধ্বজাধারী সৈনিক! কর্ণওয়ালিশ গভর্নমেণ্ট হাউসের মত অত বড় প্রাসাদে বাস করারও পক্ষপাতী ছিলেন না। বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন—"আদৌ এবাড়ি আমার পছন্দ নয়। গাইড ছাড়া কিছুতেই এবাড়িতে পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এতো বাড়ি নয়, এ হল কারাগার। জানলা দিয়ে একবার মুখ বাড়ালেই হল, অমনি দুজন শান্ত্রী বেয়নেট হাতে হাজির হয়। এ ব্যবস্থা কিছুতেই আমি চলতে দিতে পারি না।"

কর্ণওয়ালিশের পর মিণ্টো এলেন। তাঁরও তিক্ত অভিজ্ঞতা।

"কলকাতায় এসে প্রথম রাত্রে যখন শয়ন করতে গেলাম, দেখি, আমার পিছু পিছু চৌদ্দ জনের এক বাহিনীও ড্রেসিং রুমে প্রবেশ করল। তাদের পরণে সাদা মসলিনের গাউন। এদের নারী ভেবে কেউ যেন রোমাণ্টিক কিছু কল্পনা না করেন, কারণ এদের পরিধেয় যেমন গাউন, মুখে আছে কালো দাড়ি। এই দাড়িওলা দাসীরা (বিয়ার্ডেড্ হাউসমেড) আমায় অবিলম্বে ছেড়ে দিয়ে চলে যাক এই কামনাই মনে মনে করলাম।"

শুধু গভর্নর জেনারেল নয়, তাঁকে অনুসরণ করে অন্যান্য সাধারণ কর্মচারীরাও দাসবাহিনী নিয়োগ করতেন পাইকারি হারে। কেউ কেউ কারণস্বরূপ বলেছেন, ভারতে জাতিভেদ অনুসারে কর্মভেদ প্রচলিত। একই রকম চাকর সব রকম কাজ করতে চায় না, তাই সব রকম কাজের জন্য আলাদা লোক দরকার। প্রায় প্রতিটি জর্ণাল বা ডায়েরিতে চাকরের ফিরিস্তি পাওয়া যায় এবং প্রায় প্রত্যেকেই তাদের কাজের বিভাগ ও উপ-বিভাগের বর্ণনা দিয়েছেন। তৎসহ সেই সব সেবকদের উদ্দেশে গালিবর্ষণ তো আছেই। অবশ্য প্রশংসা যে কেউ করেন নি এমন নয়, সেটাকে ব্যতিক্রম বলেই ধরা চলে।

মিসেস ফে স্বভাবে উন্নাসিক। এদেশের একমাত্র "বেঙ্গল মাটন অলওয়েজ গুড।" আর কোন কিছু তাঁর ভাল লাগেনি। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন (১৭৮০) ডায়েরীতে—

"আমি ঘর-সংসার সাজাতে আরম্ভ করেছি। ভারতে কাজটি খুব সহজ নয়। এখানে যে কাজের জন্য যে চাকরকে নিয়োগ করা হয়, তার বাইরে কোন কাজ করতে বললে সে করবে না। আর নিজের কাজটুকুও যে স্বেচ্ছায় করে তা নয়।

সেদিন আমি একজন চাকরকে একটি টেবিল আমার পাশে বসাবার জন্য বললাম। সে দেখি চেঁচিয়ে অন্যান্য বেয়ারাদের সাহায্যের জন্য ডাকাডাকি করতে লাগল। বললাম—'নিজেই টেবিলটা সরাও না কেন?' জবাব দিল 'আমি ইংরেজ নই, বাঙ্গালী। একজন কেন, তিনজন বাঙ্গালীও একত্রে একজন ইংরেজের সমান কাজ করতে পারে না। "(Oh I no English ; one, two, three Bengal man cannot do like one Englishman.")

"ইংলণ্ডে চাকর যদি অসৎ হয়, আমরা তাকে শাস্তি দিই, বা অপমান করে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করি। তাদের দুর্দশা দেখে অন্যান্যরা শিক্ষা গ্রহণ করবে এটা আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের এই হতভাগাদের কোন লজ্জাবোধ নেই। আমি দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি, এর থেকেই বুঝতে পারবে কী অস্বস্তির মধ্যে এখানে দিন কাটছে। মাত্র দেড় পাঁইট কাষ্টার্ড তৈরি করার জন্য আমার খানসামা তেরটি ডিম ও এক গ্যালন দুধ চাইল। আমি এতটা জুয়াচুরি প্রশ্রয় দিতে রাজি নই। আমি আপত্তি জানাতে সেও হুমকি দিল। ফলে নতুন লোক নিয়োগ করলাম। তাকে বললাম—দেখ বাপু, আমি বাজারে গিয়ে কোন্ জিনিসের কত দাম সব জেনে এসেছি। কাজেই তুমি যা খুশি চাইবে তাই আমি মেনে নিতে পারি না। কাল থেকে আমার বাড়ির জন্য যা কিছু কিনবে তার সঠিক বাজার দর লিখে রোজ সকালে হিসেব দেবে। ফলে লোকটি দ্বিগুণ মাহিনা দাবি করে বসল। কাজেই নতুন লোকটিকে বাতিল করে আবার পুরাতনটিকেই বহাল করলাম। আমি জানি লোকটি গুণ্ডা, এরা সবাই তাই। তবু মনে হয় আমার মেজাজ সে টের পেয়েছে, এবং সংযত হয়ে চলবে।······

······"যে লোকটি আমার বাজার করত সেও চলে গেল। তার অভিযোগ হল—গরিব চাকরদের আমার বাড়িতে কাজ করে লাভ নেই। অন্য লোকের বাড়িতে কাজ করলে মাইনে ছাড়াও দৈনিক অন্ততঃ এক টাকা উপরি আয় হয়। কিন্তু আমার বাড়িতে যদি মাত্র এক আনা বা দু আনা চায় তাও নাকি আমি কেড়ে নিই। "হোয়াট এ টেরিবল্ ক্রিচার আই এ্যাম।"

মিসেস কে উপরোক্ত লেখায় কেবল বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি জবরদস্ত মহিলা। চাকর নামধেয় গুণ্ডারাও তাঁর নামে তটস্থ।

খেয়াল করেন নি, চাকরদের জন্য দস্তুরীর যে ব্যবস্থা অদ্যাবধি চালু আছে, তাতে হস্তক্ষেপ করা মালিকের সঙ্কীর্ণচিত্ততার পরিচয় মাত্র।

মিসেস ফের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁর যুগ ছিল চাকরদের সুবর্ণ যুগ। আঠারো শতকের শেষের দিকে দাসবাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধিকেই সাহেবরা আভিজাত্য বলে মনে করতেন, এবং সেই খাতে যে-কোন পরিমাণ অর্থব্যয় করা মানবধর্ম বলে অভিজাতবর্গ মেনে নিয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমে হেবার বা পার্কসের কালে বা আরও পরে গ্র্যাণ্টের সময়ে দাসবাহিনীর সংখ্যা তেমন হ্রাস না পেলেও বর্ণাঢ্য ভাবটুকু আর ছিল না। ফে'র সময়েই ছিলেন হিকি, খুব বেশি বড়লোক নন। দাস-দাসী নিয়োগের ব্যাপারে এবং তাদের সম্যক মর্যাদাদানের ব্যাপারে হিকি উদারচিত্ত, তাঁর বন্ধুরাও তাই।

পার্লবী তাঁর জার্ণালে দাসদাসীদের বিস্তৃত তালিকা ও বেতনের হার উল্লেখ করেছেন। একজন খানসামা, একজন আবদার (জল ঠাণ্ডা রাখাই কাজ), হেড খিদমতগার, সেকেণ্ড খিদমতগার, এক বাবুর্চি, মেট বাবুর্চি, মশালচি, ধোবি, ইস্ত্রিওলা, একজন দর্জি ও সহকারী, একজন আয়া ও তার সহকারী, এক ডুরিয়া, সর্দার বেয়ারা, মেট বেয়ারা, গোয়ালা, ভেড়ীওলা, মুর্গীওলা, মালী, মেট মালী, তস্য সহকারী, গম পেষাইওলা, কোচম্যান, আটজন সহিস্, আটজন ঘাস্‌ড়ে, ভিস্তিওলা ও তস্য সহকারী, একজন বড় মিস্ত্রি ও সহকারী, খসের গায়ে জল দেবার জন্য দুজন কুলি, দুজন চৌকিদার, একজন দ্বারোয়ান, দুজন চাপরাসি, মোট নফর সংখ্যা সাতান্ন জন, বেতন মোট দুশো নব্বুই টাকা। সর্বোচ্চ বেতন বারো টাকা, সর্বনিম্ন দু টাকা।

যাঁরা একটু পদস্থ তাঁদের জন্য এ ছাড়াও ছিল আস্তাবরদার ও চোপদার, কখনও কখনও সোনতাবদার। আঠারো শতক হলে অন্ততঃ দুজন হুকাবরদার। পরচুলা পরাবার নাপিত ও পাঙ্খাওলা তো আছেই।

হিকি তাঁর আমলের কলকাতার মানদণ্ডে এমন কিছু ধনী ছিলেন না। তাঁরও ভৃত্য সংখ্যা ষাট জন। যাঁরা একটু অবস্থাপন্ন তাঁরা অন্ততঃ একশো জন নিয়োগ করতেন।

বিশপ রেজিনাল্ড হেবার কলকাতায় এসে তাঁর নিজের বাড়ির জন্য নিযুক্ত দাসবাহিনীর সংখ্যা দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন। এতো ভৃত্য নয়, রীতিমত ভৃত্যরাজকতন্ত্র। তাঁদের শিশুকন্যার জন্য নিযুক্ত রয়েছে আয়া, বেয়ারা, খিদমতগার, হরকরা এবং একজন পাচক। তাছাড়া আরও দুজন—একজন শিশুকে রৌদ্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য ছাতাবহন করবে। তার জন্য আগে আগে 'মেস' হাতে নিয়ে চলবে। "মেস" বহন অবশ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু মিসেস হেবার আপত্তি করলেন। একফোঁটা শিশুর জন্য এত লোক নিয়োগ করা কেন? তাঁকে বোঝানো হল—এই রেওয়াজ। মোগল আমলের বিলাস-ব্যসনের এ হল ছিটেফোঁটা। এতো অতি সামান্য ব্যাপার। এমন বাড়িও কলকাতায় আছে যেখানে মাত্র ছ' বছরের শিশুকে কোলে নিয়ে আয়া যখন ফিটন গাড়িতে চড়ে পথে বের হয়, তখন গাড়ির পা দানিতে দু পাশে দুই সহিস হাঁক দিতে দিতে চলে। সামনে চালক, গাড়ির পিছনে ছাতাবরদার। তারও পিছনে ছোট একটি ঘোড়া। ছ' বছরের খোকাবাবুর জ্যান্ত সত্যকার ঘোড়ায় চড়ার শখ হবে না ঠিক, কিন্তু যা রীতি আছে তা অমান্য করা চলে না।

চন্দননগরের ফরাসি শাসক ডুপ্লেও বাড়িতে চাকর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিজেকে বিরাট ব্যক্তি বলে মনে করেছিলেন।

গ্র্যাণ্ট উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভৃত্যদের পদ অনুযায়ী যে সব ভূমিকায় কথা উল্লেখ করেছেন, আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও অবস্থা প্রায় তাই। অন্য লোকের বাড়িতে সাহেবের নিমন্ত্রণ হলেও সাহেব একলা যেতেন না, সঙ্গে নিজের খিদমতগার ও ছাতাবরদারকে নিয়ে যেতে হত। আঠারো শতকে তার সঙ্গে থাকতো সাহেবের ব্যক্তিগত হুঁকোবরদার। খিদমতগারের পোশাক সাদা লিনেনের, কোমরে সোনা বা রূপার ব্যাণ্ড। পদমর্যাদায় বেয়ারাদের স্থান পঞ্চম। সাধারণতঃ হিন্দু। রব্বানি, ওড়িয়া ও বাঙ্গালী তিন রকম বেয়ারাই আছে। জাতিতে হিন্দু বলে কেউ সাহেবের খাবার টেবিল স্পর্শ করে না। একবার ওড়িয়া বেয়ারারা পাখা টানতেও অস্বীকার করেছিল। কারণ নিষিদ্ধ মাংস যে টেবিলে রাখা ছিল পাখা ছিল তার উপর ঝোলানো। রব্বানিরা কথায় কথায় চটে কিন্তু খুব বিশ্বাসী ও কর্মক্ষম। ওড়িয়ারা শান্ত ও ধীর। আঠারো শতকে পাল্কিবহনের জন্য স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত হত। উনিশ শতকে বেয়ারাদেরকেই বেহারা হয়ে পাল্কি টানতে হত অবসর সময়ে। সর্দার বেয়ারার সম্মান কিন্তু খুব বেশী। পাল্কি বহন দূরের কথা, স্পর্শও করে না। মনিব-বাড়ির চাবি তার কাছে। মনিবকে পোশাক পরানো, ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া, আলো জ্বালানো ইত্যাদির তদারক করাও তার কাজ। সাহেব যখন মেমকে নিয়ে নিজ কক্ষে নিভৃতে বিশ্রম্ভালাপে রত তখন সেখানে একমাত্র সর্দার বেয়ারাই প্রবেশ করতে পারে।

বাবুর্চিরা সাধারণতঃ মুসলমান। অনেক সময় মগ বা পর্তুগীজ। হিন্দু বাবুর্চিকে কাওড়া বলা হয়। গ্র্যাণ্ট মুসলমান বাবুর্চিদের প্রশংসা করেছেন, কারণ তারা রান্না

করার সময় খাদ্যবস্তু মুখে দিয়ে পরীক্ষা করে না, অথচ অনবদ্য স্বাদ ফুটিয়ে তোলে। পক্ষান্তরে মগেরা শুকর-মাংস দিয়ে সুন্দর চপ বানিয়ে দেবে, কিন্তু নিজেই হয়ত রান্নার অর্ধেক সাবাড় করবে।

পাঙ্খাওয়ালার কৃতিত্বেও গ্র্যাণ্ট মুগ্ধ—"সৈন্য ও পর্যটকদের যেমন অনেক সময় ঘোড়ার উপর চলমান অবস্থায় ঘুমিয়ে নিতে দেখা যায়, পাঙ্খাওয়ালারাও তেমনই কর্মরত অবস্থায় ঘুমোতে পারে। চোখ বন্ধ করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমোচ্ছে, পাখা চালাচ্ছে তার পায়ের সাহায্যে।"

কলকাতার দর্জির কাজের প্রশংসা করলেও তাদের স্বভাবের নিন্দা করেছে প্রায় সবাই। এদের চৌর্যবৃত্তি এবং মিথ্যা কথার দক্ষতা সেকালের সাহেব মহলে প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। পার্কস লিখেছেন—দর্জি হল ইণ্ডিয়ান লাক্‌সারী। তাদের হাতের কাজ অতি চমৎকার। কারুকার্য ও টেকসই উভয় দিক থেকেই তারা ফরাসি দেশের সেরা দর্জিদের সমকক্ষ। কিন্তু আমার দর্জি ছিল পাকা চোর। ছুরি, কাঁচি, সিল সবকিছু তারা আত্মসাৎ করত। মূল্যবান নেক্‌লেস ব্রেসলেট নিয়ে সরে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে।

ক্যাপ্টেন উইলিয়মসনের (১৮২৩ খৃঃ) একবার শখ হয়েছিল দেশী নাপিতের কাছে দাড়ি কামাবার—"এক টুকরো কটুগন্ধি সাবান, বুরুশের বালাই নেই। শুধু গালে জল দিয়ে হাত বুলিয়ে দাড়ি নরম করে নেওয়া হয়। তারপর ক্ষুরটা চামড়ার উপর বুলিয়ে দাড়ি কামাতে শুরু করে। এই ক্ষুর চালানোর সময় যার দাড়ি, তার ভীতিবিহ্বল মুখচোখের দিকে নাপিতের দৃষ্টি থাকে না। শুধু দাড়ি নয়, ক্ষুরের টানে দাড়ির সঙ্গে গালের মাংসও কেটে বেরিয়ে আসে। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায়ই দেশী নাপিতদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। আমার উপর দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ভয়াবহ কাণ্ড। প্রতিবারই গালের ক্ষত নিরাময় হতে সাত থেকে দশদিন সময় লেগেছে।"

হুকাবরদারদের সুবর্ণযুগ আঠারো শতক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। উনিশ শতকে সাহেব-বাড়িতে হুকোর পাট চুকে যায়। গড়গড়ার জল পরিবর্তন, তামাক তৈরি, গন্ধদ্রব্যাদি মিশ্রণের দ্বারা স্বাদসৃষ্টি—ইত্যাদি বহুদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ ফল। কাজটিও প্রায়ই ছিল বংশানুক্রমিক। ভোজসভায় মনিবরা খানসামা ও হুকাবরদার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কিন্তু সভাকক্ষে প্রবেশ করত সারিবদ্ধভাবে। তার পরে যে যার প্রভুর পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়াত। হাতে গড়গড়া, বুকে দু-তিনটি পাক দিয়ে

নল জড়ানো। ব্যাপারটা সহজ নয়। একজনের গড়গড়ার নল অপরের নলকে যেন ডিঙিয়ে না যায়, সেটা অপমান। সব নল, যত বড় আকারেরই হোক না কেন তার চৌহদ্দি নির্দিষ্ট। মনিব ও গড়গড়ার মাঝামাঝি স্থানে যেন কেউ হঠাৎ না এসে পড়ে, সেটাও অপমান। মহিলারাও লোভ সামলাতে পারতেন না, দু' এক টান খেতেন—The mixture of sweet scented Persian tobacco, Sweet herbs, coarse sugar spice etc., which they inhale, comes through clean water and is so very pleasant that many ladies take the tube and draw a little of the smoke into their mouth"—(Price).

চাকর ও নোকর এক নয়। দুটি শ্রেণী। নোকরের মর্যাদা বেশী। তাকে চাকর বললে সে অপমানিত বোধ করে। উইলিয়মসন এই তত্ত্ব পরিবেশন করে জানিয়েছেন যে, সাহেবরাও এই দুই শ্রেণীর পদমর্যাদা সম্পর্কে সব সময় সচেতন নন। নোকর বলতে বোঝায় বেনিয়ান, সরকার, দারোগা, মুন্সি, জমাদার, চোবদার, সোঁতাবদার, খানসামা, কেরানি। চাকর বলতে বোঝায় খিদমতগার, মশালচি, হুকাবরদার, ভিস্তিওলা, বাবুর্চি, দর্জি, ধোপা, মাহুত, সারোয়ান (উটচালক), সহিস, চাবক আস্তার (ঘোড়ার মুখে লাগাম বাঁধার কাজ), মালি, আবদার, কম্পাদর, হরকরা, বিত্তেন, দফতরি, হাজাম, ফরাস, মেথর ও ডুবিয়া, খালাসি, ভেড়িয়া, চৌকিদার, দ্বারোয়ান, কাহার, কোচম্যান, আয়া, ধাই।

নতুন সাহেব কলকাতায় আসার সংবাদ চাঁদপাল ঘাট থেকেই স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহলে ছড়িয়ে পড়ে। সকালে সর্বপ্রথম দেখা দেয় সরকারের দল। সরকার একজন চাই, সাহেবের এজেণ্ট হয়ে কাজ করার জন্য। সাহেবের আসবাবপত্র কেনা-কাটা, দাসবাহিনী নিয়োগ, গাড়ি-ঘোড়ার ব্যবস্থা সবকিছুই সে করবে। দরকার হলে সাহেব তার কাছে অর্থ সাহায্য নিতে পারেন, উচ্চহারে সুদ কবুল করে। এই সরকার যদি পুর্বেই নিযুক্ত হয়, তবে সাহেবের সম্মতি নিয়ে ভৃত্যকুল নিয়োগ করবে সে, অন্যথায় সাহেবকেই নফর নির্বাচন ও নিয়োগের দায়িত্ব নিতে হয়। অসংখ্য বেকার লোক, সবাই সার্টিফিকেট হাতে আসে। কতগুলি চাকর প্রয়োজন সেটা নির্ধারণ করা নবাগতের. পক্ষে সম্ভব নয় এবং যোগ্য লোক নির্ধারণ আরও শক্ত ব্যাপার। 'মেময়ির অব এক ক্যাডেট' গ্রন্থের লেখক তাঁর স্মৃতিকথায় কলকাতার ভৃত্যনিয়োগ সমস্যা সম্পর্কে লিখেছেন—

"বেকারের দল চাকরির জন্য দল বেঁধে আসে। সবারই হাতে ক্যারেক্টার

সার্টিফিকেট। পূর্বের মনিব যাবার সময় চাকরের হাতে এই সার্টিফিকেট দিয়ে যান। এই সার্টিফিকেট হস্তান্তরিত হয়। একজন চাকরী পাওয়ার পর তার সার্টিফিকেট অন্যজন নিয়ে চাকরীর জন্য চেষ্টা করে। অনেক সময় লব্ধ সার্টিফিকেট ভাড়া দেওয়া হয়, এমন কি বিক্রি পর্যন্ত হয়।

"আমার কাছে যারা চাকরির জন্য এসেছিল তাদের একজনের সার্টিফিকেট বড় মজার। সার্টিফিকেটধারী যে বাঙালী নয় সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। কারণ বাঙালীরা বড় চতুর। বিদেশী ভাষায় লেখা সার্টিফিকেটের মর্মার্থ কি সেটা বোঝার জন্য ইংরেজি-জানা দেশী লোকের কাছে সার্টিফিকেটটা পড়িয়ে নেয়। কিন্তু আমার কাছে যে সার্টিফিকেটটি এল তাতে লেখা ছিল, I do humbly certify that the bearer hereof, Khoda Bux has served me as mashalchee for three months and is discharged for repeated intoxication and insolence, and is moreover a very dirty fellow."

কিন্তু এই লেখকই পরে মন্তব্য করেছেন মনিব-চরিত্র সম্পর্কে। যত দোষ নন্দ ঘোষ—সব দোষ ভারতীয় চাকরদের স্কন্ধে চাপিয়ে অধিকাংশ মনিব নিজেদের সাধু প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থকার সাহেব সমাজের দুর্নীতি, উচ্ছৃঙ্খলা ও ন্যায়বোধ বর্জিত প্রভুত্বকামিতার প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছেন—"আমার মনে হয়, ভাল চাকর পেতে হলে মনিবকেও (ভারতে কিছুদিন অবস্থানের পরও) উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।"

গ্র্যাণ্টও কলকাতার সাহেবদের আমিরী মেজাজের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। "তাদের জীবনের প্রধান নীতি হল thou shalt do nothing for thyself which thy servant can do for you. মনিবদের অলস প্রকৃতির ফলে চাকরদের উপর কাজের চাপ ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পায়। অথচ ভাল কাজের জন্য প্রভুর কাছে সমাদর পায় না। অবশ্য বড় বড় সাহেব-বাড়িতে চাকরদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হয়, ছোট বাড়িতে তেমন হয় না। আমি ছোট ছোট ইওরোপিয়ানদের বাড়ি দেখেছি —নবাগত অতিথি গৃহভৃত্যদের কাছ থেকে যে রকম সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছে, বড় বড় বাড়িতে তা পায়নি, বরং উপেক্ষা পেয়েছে।

"আমি এমন বহু ঘটনা শুনেছি যে, প্রভু ও প্রভুপত্নী যখন নৌকায় বা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে দূরদেশে গিয়েছে, তখন তাদের পেয়ে ভৃত্য হাসিমুখে পায়ে হেঁটে ছশো, কখনো বা সাতশো মাইল পথ তাঁদের অনুসরণ করেছে। আমি এক বৃদ্ধা

আয়াকে জানি। বয়োভারে ন্যুব্জপৃষ্ঠ। গাড়ির ঝাঁকানিতে পিঠে ব্যথা হবে বলে নিজে গাড়িতে চড়েনি। প্রভুপত্নীর কষ্ট হবে বলে সে পায়ে হেঁটে প্রভুকে অনুসরণ করেছে। কানপুর থেকে লাহোর, মুসৌরি, গোয়ালিয়র এবং সবশেষে কলকাতায়।"

স্মরণীয় যে, ইংরেজ নরনারীদের জার্নালে বা ডায়েরিতে অসৎ চাকরের কথা যত ফলাও করে লেখা হয়েছে, অসৎ মনিবের কথা তেমন ভাবে লেখা হয়নি। অথচ অকারণে ভৃত্যদের বেপরোয়া প্রহার করার ঘটনা প্রায়ই ঘটত। কোম্পানির রেকর্ডে দেখা যায়, ১৭৬৩ সালের ২১শে মার্চ জনৈক মিঃ জনসন চাকরকে প্রহারের দায়ে জেল খাটছেন এবং জেলখানায় নিজ অসহায় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। 'মেমইরস্ অব এ ক্যাডেট' গ্রন্থেও লেখা আছে, "আজকাল কোন কোন স্টেশনে চাকরদের প্রহারের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের জন্য আদালত বসানো হয়েছে।"

সাহেব-মনিব ও তাদের চাকরদের নিয়ে ইণ্ডিয়ান চারিভরিতে কার্টুন আঁকা হয়েছে।

নবাগত ইংরেজ এসেছেন এক ভোজসভায়। হাঁক দিলেন—কোই হ্যায়? হামকো শেরী-সরাব দো।

খিদমতগার—জী নেই সাহাব।

সাহেব—হ্যাং ইট। আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট জিন, আই সেড শেরী-সরাব।

স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল একবার নাকি ভারত থেকে কিছু দেশী চাকর ইওরোপে রপ্তানি করার কথা ভেবেছিলেন। তদানীন্তন ইংরেজ চালিত পত্রিকাগুলিতে এ নিয়ে খুব সমালোচনা হয়। ইণ্ডিয়ান চারিভরি মন্তব্য করেন—পরের মন্দ ঘরে ডেকে আনার চেয়ে নিজের ঘরের মন্দ ঢের বাঞ্ছনীয়।

বিদেশীদের চোখে দুর্গাপূজা

পাদ্রী ওয়ার্ডের মতে দুর্গা হলেন গ্রীক দেবী মিনার্ভা, পল্ল ও জুনোর সম্মিলিত বিগ্রহ। এই ত্রয়ীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তাঁর স্বভাবের মধ্যে। গ্র্যাণ্ট দুর্গাকে বলেছেন 'হিন্দুর একমাত্র হিরোইন'। 'হিরোইন' কথাটি তিনি নায়িকা অর্থে প্রয়োগ করেননি, বীর রমণী বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমগ্র বর্ণনায় কোথায় যেন একটু তাচ্ছিল্যের সুর বেজে উঠেছে। দেবীর আট হাতে আট অস্ত্র, গ্র্যাণ্টের মতে সবগুলিই নারীসুলভ। —peculiarly feminine implements—an axe, a discus, a trindent, a club, an arrow and a shield. বাকি এক হাতের মুঠিতে তিনি অসুরের (green-bodied monster) কেশাকর্ষণ করছেন। দেবী ব্রিটানিয়ার সঙ্গেও দুর্গার মিল আছে। দু'জনেই সিংহ-বাহিনী। বঙ্গ-যুবক কেন যে বীর হয় না, তার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে গ্র্যাণ্ট একটু অম্ল-মধুর পরিহাস করেছেন। দেবতার পরিবর্তে দেবীকে সর্বশক্তিময়ী-রূপে স্বীকার করে নেওয়া তাঁর মতে পুরুষোচিত কাজ নয়। আর বঙ্গ-যুবককেই বা দোষ দিই কি করে? দুনিয়ায় কে কবে নারীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে জিতেছে? The impossibility of resistance to the power of woman." আক্ষেপ করেছেন গ্র্যাণ্ট নারীর কাছে পুরুষের চিরন্তন অসহায়তার জন্য।

দুর্গানামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওয়ার্ড লিখেছেন, তাঁর অরিজিনাল নাম ছিল 'পার্ভুতি' কিন্তু একস্ট্রা অর্ডিনারী শৌর্যের দ্বারা দুর্গা নামক এক অসুরকে পরাজিত করায় তাঁর নতুন নাম হয় 'দুর্গা'। এই অসুর হল অসংবৃত্তি আর পার্ভুতি (পার্বতী) হল সংবৃত্তির প্রতীক। পার্বতী ও অসুরের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সৎ ও অসতের চিরন্তন সংঘর্ষ ও পরিণামে সংবৃত্তির জয়লাভের কথাই যে বলা হয়েছে, পাদ্রী ওয়ার্ড তা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় কোথাও বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পায়নি। দুর্গাপুজা কলকাতার সেরা পুজা, has no superior for magnificience of entertainment and imposing appearance. এই পুজাকে কেন্দ্র করে নগরীর অঞ্চলবিশেষে যে বিপুল অর্থের বন্যা বয়ে যেত তা দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক। ওয়ার্ড তাঁর গ্রন্থে সমসাময়িক একটি পুজার ব্যয়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন—"a wealthy Hindoo has been known to

give 80,000 lbs of sweetmeats, 80,000 lbs of sugar, 1000 suits of cloth garments, 1000 suits of silk, 1000 offerings of rice, plantains and other fruits". তিনি আরও জানিয়েছেন, সারা কলকাতায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং ব্যয় হয়। ওয়ার্ডের দেওয়া এই হিসাব আঠারো শতকের একেবারে শেষ ও উনিশ শতকের প্রথম দিকের।

দুর্গাপূজার সামাজিক প্রস্তুতি ও সাধারণভাবে পুজার বহিরঙ্গ সম্পর্কে সবচেয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন হাচিসন। দুর্গা প্রতিমা তাঁর কেমন লেগেছিল জানি না, সেকথা তিনি গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন রূপলাল মল্লিকের বাড়িতে। সে সময় মল্লিক মশাই কলকাতায় প্রায় সব সাহেবকেই উৎসবের কয়েকদিন তাঁর বাড়িতে পদার্পণের জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন (১)। হাচিসন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—"এই উপলক্ষে ভারতে দেশীয় আমোদ-প্রমোদের যত রকম ব্যবস্থা আছে, বাবু তার আয়োজন করতেন। সব সেরা গাইয়ে, সব সেরা নাচিয়ে, সেরা কৌতুকাভিনেতা, মূক-অভিনেতা, (প্যাণ্টোমাইম ও জাগলার্স) এবং নানারকম বাজিকর। হিন্দুস্থানী নাচ-গান হাচিসন কিছু বোঝেননি, তবে বাজিকরদের আস্ত তলোয়ার গিলে খাওয়ার দৃশ্যটি মন্দ লাগেনি। কিন্তু সাহেবদের কাছে—এহো বাহ্য। যে আকর্ষণের জন্য সাহেবরা মান-সম্মান বিসর্জন দিয়েও নেটিভ বাবুদের বাড়িতে পূজোর তিনদিন হাজির হতেন, তা হল পানীয়। Tables were spread with profusion of viands, wines of every species, sparkling in vases of crystal and every expensive European beverage that could be thought of to exite appetite and delight.

বলা বাহুল্য, নিজগৃহে সাহেবদের আপ্যায়নের সঙ্গে জড়িত ছিল অভিজাত পরিবারগুলির সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। রাজা নবকৃষ্ণ নিজের বাড়িতে গভর্নর-জেনারেল বেণ্টিঙ্ক ও প্রধান-সেনাপতি কাম্বারমেয়ারকে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। কার বাড়িতে কতজন সাহেব পদার্পণ করেন, তাই নিয়ে ছিল প্রতিযোগিতা। তৎকালীন ইংরেজ-চালিত সংবাদপত্রগুলি কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই সুনজরে দেখেনি। তাদের মতে, সাহেবরা যদি বাবুদের বাড়ি পানভোজন করে, তবে তার দ্বারা

(১) **"Rooplal (Mallick) was the first native who diverting himself of that bigotry which surrounds the Hindoo religion, threw open his house for the entertainment of Europeans during the celebration of one of the most important Hindoo festivals, called the Durga Puja." —Hutchison.**

আনুষঙ্গিক নৈতিক অধঃপতনকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্তু সংবাদপত্রের সমালোচনায় কোন পক্ষই কান দেননি। পূজো চারদিন চললেও উৎসব চলত মোট নয়দিন যাবৎ। তার প্রস্তুতি পর্বের বিস্তৃত বিবরণ হাচিসনের গ্রন্থে আছে। একমাস পূর্ব থেকে দোকানদাররা আহার-নিদ্রা বিসর্জন দেয়। On taking a stroll through the bazzars at these periods you see the richest brocades of Delhi, the embroideries of Beneras, pearly white muslins and soft velvets. Jewels peep from their inlaid caskets and sherbats are prepared of the most costly perfumes and scents to cool the palates of the high and mighty. The Dukans or shops also present a grand show of finery and tinsel ornaments suiting every degree of purchaser. পূজা উপলক্ষে হয় কাঙালীভোজন। ভিতরে অভ্যাগতদের ভিড়, বাইরে শত শত অনাথ-আতুরের কোলাহল—such tumult has no parallel in anything I ever heard or witnessed.

আগেই বলেছি, সাহেবদের আমন্ত্রণ করার সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন জড়িত ছিল। কোন্ বাবু কোন্ সাহেবকে আমন্ত্রণ করেছেন, কার মারফত তদ্বির হচ্ছে এসব হল গোপনীয় ব্যাপার। কিন্তু সবাইকে টেক্কা দিয়ে প্রাণকেষ্ট হালদার প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন দিলেন—নাচ-গান, পানভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা। তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রিত রবাহুতের ভেদাভেদ নেই। বিজ্ঞাপন মারফত তিনি জনসাধারণকে জানিয়েছেন, তাঁর বাড়িতে পূজোর নয় দিন কেউ পদধূলি দিলে he will be happy to furnish them with tiffin, dinner, wines etc. during their stay.

দেশী নাচ-গান যদি ভাল না লাগে সে কারণে, সাহেব-তোষণের অত্যধিক আগ্রহে, কেউ কেউ দেশী বাজনায় বিলিতী সুর বাজাবার জন্য বাদ্যকরদের আদেশ দিতেন। কিন্তু পূজা উপলক্ষে হাটে-বাজারে এই যে কর্ম-চাঞ্চল্য, অফিস-কাছারিতে এই যে ছুটির হিরিক, নাচ-গান-বাজনায় অর্থ অপব্যয়ের এই যে অকারণ প্রতিযোগিতা—এটা ভাল লক্ষণ নয়। হাচিসন বলেছেন—It certainly is an ill wind that blows nobody good.

'স্কেচেস অব ইণ্ডিয়া'র গ্রন্থকার (যিনি ১৮১১-১৪ সাল পর্যন্ত ভারতে ছিলেন) কলকাতার হিন্দুদের সম্বন্ধে বলেছেন—সারা বছর তারা অপরিহার্য ব্যয় ছাড়া অন্য

কোন ব্যাপারে পয়সা নষ্ট করে না। কিন্তু এই হিন্দু will profusely lavish his treasures in riot and festivities.

তিনি আরও বলেছেন—"ইওরোপিয়গণ শুনলে অবাক হবেন, কোন অভিজাত এশিয়াবাসী নাচে না। নাচে অংশগ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভ্রমহানিকর। কিন্তু পূজোর সময় বাড়িতে এই নাচ দেওয়ার জন্য তারাই আবার অকারণে অর্থব্যয় করে থাকে"।

সাহেব-পরিচালিত 'ক্যালকাটা জার্নালে' ১৮১৯ সালের দুর্গাপূজার বর্ণনা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়। মহারাজা রামচন্দ্র রায় ও বাবু নীলমণি ও বোষ্টমদাস মল্লিকদের বাড়ির পূজা উপলক্ষে আয়োজিত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ঐ পত্রিকা মন্তব্য করেছেন, গৃহসজ্জার সেই বিপুল উপকরণ, উৎসবকে নয়নাভিরাম করার সেই বিশাল আয়োজন সম্পর্কে পাঠকদের সামান্য একটু আইডিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। "এক কথায় কেবল এটুকু বলা যায় যে, পাঠক যদি কখনো কলকাতার দুর্গাপূজা না দেখে থাকেন তবে তাঁকে আমরা কেবল এই ভরসা দিতে পারি যে, দুর্গা-পূজার তিনদিন রাজা রামচন্দ্র রায়ের বাড়িতে আরব্য-রজনীর সেই বিস্ময়কর রূপকথাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে পারবেন।"

"In a word, if the reader be one who has never witnessed the magnificant spectacle of a Doorga Poojah in Calcutta, we can only assure him that he will find the splendid fiction of the Arabian Nights completely realised, in the Fairy Palace of Rajah Ramchunder Roy, on the evenings of the 26th, 27th and 28th instant."

যাই হোক, এই পরিণামচিন্তাহীন অপব্যয়ের পথ দিয়েই বাবুরা ফতুর হতে লাগলেন। ৺বিজয়ার দিন কোলাকুলি যত হত, লাঠালাঠি হত ততোধিক। সহজ ও স্বাভাবিক পথ বেয়ে মামলা ছোট আদালত থেকে সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়াতে লাগল। ধীরে ধীরে কেনারামের প্রপৌত্রবর্গ বেচারাম হতে শুরু করলেন। অর্থ নেই, পূজার মর্যাদা রাখা দায়। বিগ্রহ হয়ে উঠল গলগ্রহ।

শ্রীরামপুর থেকে খৃস্টান মিশনারীদের পরিচালিত সংবাদপত্র সমাচার দর্পণ (১৮২৯) লিখেছে—"এই দুর্গোৎসব এখন সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত দেশে পুনর্বার কর্মকার্য আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই কহেন যে, ইহার পূর্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ

সমারোহপুর্বক নৃত্য-গীত ইত্যাদি হইত, এক্ষণে বৎসর বৎসর ক্রমে ঐ সমারোহ ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এই বৎসর এই দুর্গোৎসবে নৃত্য-গীতাদিতে যে প্রকার সমারোহ হইয়াছে, ইহার পুর্বে ইহার পাঁচগুণ ঘটা হইত এমত আমাদের স্মরণে আইসে। কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজী সমাচার-পত্রে ইহার নানা কারণ দর্শান গিয়াছে। বিশেষতঃ জানবুল সমাচারপত্রে প্রকাশ হয় যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা আপনারাই কহেন যে, এক্ষণে সাহেবলোকেরা বড় তামাসার বিষয়ে আমোদ করেন না। এ প্রযুক্ত যে হ্রাস হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ঐ পত্র প্রকাশক আরো লেখেন যে, এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরদের আপনাদের টাকা এইরূপে সমারোহেতে মিথ্যা নষ্ট করা অনুচিত হইতে পারে যে কাহারো (১) তদৃক ধন এখন নাই। গত কয়েক বৎসর হইল নাচের বিষয়ে যে অখ্যাতি হইয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। ঐ নাচের সময়ে ক এক বৎসরাবধি অতিকায় লজ্জাকর ব্যাপার হইত এবং যে ইংগ্রণ্ডীয়েরা সে স্থানে একত্রিত হইতেন তাঁহারা সাধারণ এবং মদ্যপানকরণে আপনারদের ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম"।

বিদেশীদের চোখে চড়ক

কলকাতায় সেকালের মৃত্যু ঘটেছে। একালে পক্ষীর দলের গাওনা নেই, জেলেপাড়ার সঙ নেই, বুলবুলির লড়াই নেই, বেড়ালছানার বিয়ে নেই, জুড়িগাড়ির বাহার নেই, হাফ-আখড়াইয়ের আসর নেই ; আর যা না থাকার জন্য আমাদের চেয়েও বিদেশীদের আপসোস বেশী—চড়ক নেই। গত শতকে বিদেশী পর্যটকরা কলকাতায় এলে চৈত্র পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন চড়ক দেখার জন্য। ভারত সম্পর্কে ইওরোপে যে আধিভৌতিক ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, তার মূলেও অংশত ছিল চড়কের বীভৎস অনুষ্ঠানাদি। দুর্গাপূজার চেয়েও চড়ক তাঁদের বেশী মুগ্ধ করেছে।

এই চড়ক দেখতে এসেই হাচিসন উপলব্ধি করেছেন গঞ্জিকা-মাহাত্ম্য, বিস্ময়বিমুগ্ধ ফরাসী ক্যাপ্টেন মাণ্ডি বাঙালীর ভীতু অপবাদ মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছেন, বিশপ হেবার বাঙালীর শৃঙ্খলাবোধ ইওরোপের চেয়ে বেশী বলে দিয়েছেন সার্টিফিকেট। আর ফ্যানি পার্কস, ভারতকে যিনি 'অমৃতের দেশ' বলে অভিহিত করেছেন, তিনি চড়কের মেলায় সন্ন্যাসীদের 'হরিবল ক্রুয়েলটি' দেখেও সেস্থান ত্যাগ করেননি, কারণ সর্বোপরি অনুষ্ঠানগুলি 'ইন্টারেষ্টিং'। বিশপ হেবার চড়কের শোভাযাত্রা দেখেছিলেন চৌরঙ্গীতে ১৮২৪ সালে। হাজার হাজার মানুষ চলেছে সাজগোজ করে। সন্ন্যাসীদের গলায় আজানুলম্বিত জবাফুলের মালা, পরনে লেঙটি, সর্বাঙ্গ তেল-সিন্দুরে লাল। বড় বাঁশের খুঁটিতে ঝুলছে ঘণ্টা, মুগুর দিয়ে তাই পেটানো হচ্ছে। শোভাযাত্রার মাঝে মাঝে চলেছে বলদবাহিত কয়েকটি স্টেজ। তার কোনটিতে কোন পৌরাণিক কাহিনী পুতুল দিয়ে সাজানো, কোনটিতে ইওরোপিয় নরনারীর ব্যঙ্গমূর্তি, কোনটিতে সদ্য-আমদানি ষ্টীমজাহাজের মডেল। শোভাযাত্রায় নরনারীর সংখ্যা যেমন বিপুল, তাদের শৃঙ্খলাবোধ ততোধিক। A Similar crowd in England would have shown three boxing matches in half an hour and in Italy there would have been half a dozen assassination before night.

বিশপ হেবারের সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এমিলি হেবার। মিসেস হেবার এডিটর্স জার্নালে নিজের অভিজ্ঞতা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। চড়কগাছে ভক্তদের ঘূর্ণীপাক, কাঁটাঝাঁপ, বাণফোঁড়া এবং শোভাযাত্রা তিনি দেখেছেন অদম্য কৌতূহল নিয়ে। কাঁটাঝাঁপ দেখেছেন সামান্য দূর থেকে, কাছে যেতে সাহস হয়নি। "পনর ফুট উঁচু

বাঁশের মাচা থেকে ভক্তরা বিনাদ্বিধায় ঝাঁপ দেয় নিচে, তারপর অক্ষত শরীরে আবার উঠে যায় সেই মাচায়, আবার দেয় লাফ।"

সকালে চৌরঙ্গীর রাস্তায় শোভাযাত্রা দেখেছিলেন। কাতার দিয়ে লোক চলেছে, সঙ্গে ঢাকঢোল কাঁসর ঘণ্টা। তারই মাঝে মাঝে দুএকজন সন্ন্যাসী চলেছে উদ্দাম নৃত্যে পৃথিবী কাঁপিয়ে। এই সন্ন্যাসীদের মধ্যেই মিসেস হেবার দেখলেন তাঁর এক মশালচীকে। তার জিহ্বা ভেদ করে একটি শিক্ এমনভাবে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, মুখের মধ্যে সেই জিহ্বা টেনে নেওয়া সম্ভব নয়। জিহ্বা আমূল বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রক্তক্ষরণ হয়নি, মুখে তার নেই কোন যন্ত্রণার চিহ্ন। তাঁর ধারণা প্রচুর পরিমাণ আফিম খাওয়ার ফলেই তার পক্ষে যন্ত্রণা জয় সম্ভব হয়েছে।

১৮২৪ সালে মিসেস এমিলি হেবার চড়ক শোভাযাত্রায় নরনারীর প্রাচুর্য দেখে অপকটে মন্তব্য করেছেন "I never saw in England such a multitude collected together." আর বিশপ হেবারের মন্তব্য তো আগেই উদ্ধৃত করেছি।

হেবার-দম্পতির ঠিক একবছর আগে কলকাতায় ছিলেন ফ্যানি পার্কস্। তিনি চড়ককে 'The swinging by hooks' বলে উল্লেখ করেছেন।

"নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ পাপমুক্তির জন্য শরীরের বিভিন্ন স্থানে শিক্ ফুটিয়ে অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করে। কেউ কেউ পিঠে বা বুকের পেশীর মধ্যে ছোরা বা তলোয়ার দু তিন ইঞ্চি বিদ্ধ করে নৃত্য করতে থাকে। কেউ জানুদেশে, কেউ বক্ষপঞ্জরে, কেউ দুই বাহুর মাংসপেশীর মধ্যে ছুরি বিঁধিয়ে সেচ্ছায় নির্যাতন বরণ করে।"

শ্রীমতী পার্কস দুরকম চড়কের বর্ণনা দিয়েছেন। একশ্রেণীর চড়কে মাত্র একজন ভক্ত পাক খায়, অপরপ্রান্তে দড়ি বেঁধে তাকে ঘোরানো হয়। আর একশ্রেণীর চড়কে যুগপৎ চারজন ভক্ত পাক খেতে পারে। নাগরদোলা আর চড়ক এক জিনিস নয়। ভক্তের বক্ষপঞ্জরে দুইপাশে একজোড়া লোহার হুক্ বিঁধিয়ে তাকে দড়ি দিয়ে শূন্যে টেনে তোলা হয়, অনেকটা ক্রেনের সাহায্যে জাহাজে মাল তোলার মত। এক একজনকে প্রায় আধঘণ্টাকাল শূন্যে মহাবেগে পাক দেওয়া হয়। এই বীভৎস দৃশ্য বেশীক্ষণ সহ্য করা কোন নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীমতী পার্কস মন্তব্য করেছেন—I was much disgusted but greatly interested.

ক্যাপ্টেন মাণ্ডি চড়ক দেখেছিলেন সুন্দরবনের এক গ্রামে। নৌকাযোগে আসছিলেন কলকাতায়, পথিমধ্যে শুনলেন কানফাটানো ঢাকের বাদ্যি। সদলে ডাঙায় নেমে এগিয়ে গেলেন গ্রামের দিকে। চড়কগাছ দেখেই তো তাঁর চক্ষু চড়কগাছ।

সন্ন্যাসীদের আসুরিক প্রক্রিয়াদি দেখে মাথা ঘুরে গেল তাঁর। আকাশছোঁয়া চড়কগাছে একসঙ্গে চারজন করে ভক্ত পাক খাচ্ছে। শরীরের বিভিন্ন স্থান এফোঁড়-ওফোঁড় করে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে তাদের। মাংসপিণ্ড ভেদ করে সেই বাঁধন একেবারে হাড়ে গিয়ে পৌঁছেচে। মাংসপিণ্ড বিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তাদের মুখে যন্ত্রণাজনিত বিকৃতি নেই। একফোঁটা রক্ত বাইরে গড়িয়ে পড়েনি। বুজরুকী নয়তো? মাণ্ডির দলে একজন বিচক্ষণ ইওরোপিয় চিকিৎসক ছিলেন। সত্য মিথ্যা যাচাই করতে এগিয়ে গেলেন তিনি।

সন্ন্যাসীদের পরীক্ষা করলেন এবং প্রত্যক্ষ করলেন চর্কীপাক। তারপর? তারপর বাঙালীর ভীরু অপবাদ দূর করে দিয়ে ক্যাপ্টেন মাণ্ডি তাঁর ডায়েরিতে অনেক কথাই লিখলেন।

১৮৩৭ সালে ইন্টালীতে চড়কের মেলায় এক দুর্ঘটনা ঘটল। ঘূর্ণায়মান চড়কগাছ থেকে দড়ি ছিঁড়ে একজন সন্ন্যাসী ছিটকে একশো গজ দূরে গিয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটল। আশ্চর্যের কথা একজনকে চোখের সামনে মরতে দেখেও কয়েকমিনিটের মধ্যে আবার এক সন্ন্যাসী চড়কগাছে পাক খেতে শুরু করল। শারীরিক যন্ত্রণার জন্য কোন কাতরতা নেই। একজনকে মরতে দেখেও মৃত্যুভয় নেই, কারণ কি? হাচিসন কারণ অনুসন্ধান করলেন। জানতে পারলেন গাঁজার মাহাত্ম্য। আফিমের গুণাবলী তিনি জানতেন, কিন্তু গাঁজার অমৃততত্ত্ব সেই প্রথম তিনি শুনলেন।

বিদেশীদের চোখে গঙ্গা

মানব-সভ্যতা প্রধানতঃ নদীকেন্দ্রিক। স্বভাবতই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে ও সঙ্গীতে সেই সেই দেশের নদীমাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। প্রাচীন সংস্কৃত ও বঙ্গ সাহিত্যে গঙ্গার মহিমা বর্ণিত হয়েছে অজস্রধারে। নদী কেবল কূলপ্লাবী জলধারামাত্র নয়। ভারতবাসীর কাছে গঙ্গা মূর্তিমতী দেবী। চিরনমস্যা। সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা, গঙ্গৈব পরমাগতি।

বিদেশীদের কাছেও গঙ্গা কম মোহময়ী নয়। ম্যাক্সমূলর থেকে শুরু করে হুইটম্যান পর্যন্ত অনেক বিদেশী বিশিষ্ট গঙ্গাকে কেবল মানসলোকে দেখেই প্রেমে পড়েছেন। ভারতীয় সাহিত্য ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে গিয়ে গঙ্গাকেও তাঁরা অলক্ষ্যে ভালবেসে ফেলেছেন। যাঁরা ভারতে এসেছিলেন, শাসন বাণিজ্য ধর্মপ্রচার বা উদ্দেশ্য-নিরপেক্ষ সফরে, তাঁরাও গঙ্গার দিকে চেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন। ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক বা ব্যবহারিক জীবনে গঙ্গার প্রভাব কত ব্যাপক সেটা লক্ষ্য করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছেন স্লীম্যান। ঠগী দমন করতে গিয়ে বহুকাল গঙ্গাবক্ষে তাঁকে বিচরণ করতে হয়েছিল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেছেন—

"ইংরেজরা বড় জোর এমন এক কবির কল্পনা করতে পারে, যিনি তাঁর জ্ঞানবুদ্ধির চরম প্রয়োগ করে সমুদ্রকে ঘোড়া কল্পনা করবেন। এমন এক ঘোড়া যে তার সওয়ারকে চেনে। কবির কল্পনার সেই সমুদ্রচারী মানুষটি হয়তো সমুদ্ররূপী ঘোড়ার পিঠে চাপড় মারে। হাওয়ায় উড়ন্ত কেশরকে কবি হয়তো সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে উপমিত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি এমন দেশ দেখতে চান যেখানে কোটি কোটি মানুষ একটি রূপসী নদীকে জীবন্ত মানবীরূপে, সার্বভৌম রানীরূপে সম্বোধন করে, তবে তাঁকে ভারতে আসতেই হবে। ভারতবাসীর কাছে গঙ্গা কেবল রূপবতী, সার্বভৌম রানীমাত্র নন, তিনি প্রজাদের প্রার্থনা শোনেন, উপলব্ধি করেন। অথচ গঙ্গার জন্য কোথাও কোন মন্দির নেই, পুজার জন্য কোন পুরোহিত নেই। নদী স্বয়ং এখানে দেবী ভগবতী, তাকেই সবাই প্রত্যক্ষ পুজা করে, নদীর প্রতিভূরূপে কোন দেবীকে নয়। গঙ্গা স্বয়ং দেবী, তিনিই সকলের কল্পনাকে রঙ্গীন করে রাখেন, তিনি স্বয়ং সকলের পুজা গ্রহণ করেন"।

বাংলায় প্রথম ইংরেজ র‍্যালফ্ ফিচ্। পর্তুগীজদের ভয়ে ধুতি-কোর্তা পরে বাঙ্গালী

সেজে তৎকালীন বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান তিনি সফর করেছিলেন। ১৫৮৫ সালের কথা। হুগলীতে সপ্তগ্রামের কাছে এসে গঙ্গা দেখলেন। লক্ষ্য করলেন এই নদীর প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি। তিনি লিখেছেন—

—There the gentiles have the water of the Ganjes in great estimation, for having good water near them. Yet they will fetch the water of the Ganjes a great way off, and if they have not sufficient to drink they will sprinkle a little on them and then they think themselves well.

অর্থাৎ পানের জন্য যথেষ্ট গঙ্গাজল যদি মজুদ না থাকে তবে ফুকোঁটা গঙ্গাজল গায়ে ছিটিয়ে নিলেই সব শুদ্ধ হয়ে যায় বলে বঙ্গদেশীয়রা মনে করে।

র‍্যালফ ফিচের বঙ্গদেশ ভ্রমণের পর গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে। নদীখাত পরিবর্তিত হয়েছে অসংখ্যবার। বহু শস্যসম্ভার, বন্যা ও মড়ক দেখা দিয়েছে দুইতীরে। কিন্তু এই রীতির পরিবর্তন ঘটেনি। পরবর্তীকালে বিশপ হেবার সেই একই ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। নদীয়া জেলার এক গ্রামের পার্শ্ববর্তী নদীর উপর নৌকায় হেবার একদিন বসেছিলেন। লক্ষ্য করলেন, পাশের নৌকা থেকে কলসী বোঝাই কি যেন নামানো হচ্ছে। আবদুল্লা-মাঝিকে প্রশ্ন করলেন। সে জানাল, সম্ভবতঃ হরিদ্বার বা বেনারস থেকে গঙ্গার জল আনা হয়েছে। কারণ গঙ্গাজল না হলে হিন্দুদের দেবপূজা হয় না।

এসব হল ভারতীয়দের দৃষ্টিতে গঙ্গার বিবরণ মাত্র। বিদেশী সাহেবদের কাছে গঙ্গার গুরুত্ব কোন ধর্মীয় কারণে নয়।

গ্র্যাণ্ট অকপটে স্বীকার করেছেন ইংরেজদের গঙ্গাভক্তির আসল কারণ। লণ্ডনের অনুকরণে একদা কলকাতায় গঙ্গার পূর্বপারে তৈরি হয়েছিল স্ট্র্যাণ্ড। সাহেব-মেমদের বৈকালীন ভ্রমণস্থল। গ্র্যাণ্টের মতে কলকাতার স্ট্র্যাণ্ডে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে যে জনসমাগম হয়, তার সঙ্গে তুলনা চলে হাইড পার্কের জনসমাগমের অথবা জ্যাম বা জেলির খোলা শিশিতে পিঁপড়ের সমাবেশের সঙ্গে।

"I can compare to nothing else (unless to see similar scene in Hyde Park) than a little communication which the ants may have discovered with the jam or jelly jar."

তিনি আরও লিখেছেন—"এখানে গঙ্গার সঙ্গে সুদূর ইংলণ্ডের যেন ক্ষীণ যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ভাসমান জাহাজগুলিকে দেখলেই প্রবাসী ইংরেজদের স্বদেশের

কথা স্বতই মনে পড়ে। আর সেই সঙ্গে চলে দেশের বিভিন্ন স্মৃতির রোমন্থন। গঙ্গা হল—connecting link with home, family and friends; recalling the most endured association of the past and novel interesting reminiscence of the voyage.

গঙ্গাকে উপলক্ষ করে বা তাকে পটভূমি করে বিদেশীরা অনেকে কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে আমার সবচেয়ে সুখপাঠ্য মনে হয়েছে শ্রীমতী এমা রবার্টসের দীর্ঘ কবিতা। কাজেই এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়।

ক্যাপ্টেন ম্যাকনটনের কবিতা থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করলে মূলের রসহানি ঘটবে না :

······there's not
Beneath the eternal heaven
A spot
Over which the sun, the moon and the sky
Display a lovelier radiancy
Than where the sacred Ganjes flows,
Land of the Bulbul and the rose.

অর্থাৎ পবিত্র গঙ্গা যে দেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়, বুলবুল আর গোলাপের সেই দেশে সূর্য-চন্দ্র ও আকাশ সবাই মিলে এমন মনোহর দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়, যার সঙ্গে তুলনা চলে এমন স্থান স্বর্গের নীচে আর একটিও নেই।

বিশপ হেবারের কবিতা অবশ্য এককালে স্কুল পাঠ্য ছিল বলে শুনেছি :

If thou my love ! Wert by my side
My babies at my knee
How gaily would our pinnace glide
Over Ganga's mimic sea.

বিদেশীদের চোখে ঠগী

"The joy of killing! The joy of seeing killing done—these are traits of the human race at large. We, white people are merely modified thugs,—thugs freting under the restraint of a not very thick skin."—Mark Twain.

মহাপুরুষদের মৃত্যু নেই, মহামতি রাম ফাঁসুড়েদেরও তাই। অসামান্য প্রতিভা নিয়ে উভয়েরই আবির্ভাব ঘটে। ভগবান দয়াহীন সংসারে যুগে যুগে দূত পাঠিয়ে দেন, কিন্তু আবার মহামতি রাম ফাঁসুড়েদেরও পাঠিয়ে দেন প্রতিদিনই কিছু কিছু। তাঁরা আমাদের মধ্যে আসেন, বাস করেন ও সাধ্যমত উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন। উনিশ শতকে নাকি বন্যার মত মহাপুরুষদের আবির্ভাব ঘটেছিল। মহামতি রাম ফাঁসুড়েরাও এসেছিলেন সে সময় সবচেয়ে বেশী। একালে মহাপুরুষ নেই, কেবল কয়েক হাজার মহামতি রাম ফাঁসুড়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোথাও তাঁরা গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়া সেজে গ্লুকোজে ছাতু মেশাচ্ছেন, কোথাও বা ব্যাঙ্ক-ক্যাশিয়ারের চোখে ধূলো ছিটিয়ে তহবিল হাল্কা করছেন।

এহেন ফাঁসুড়েদের সংখ্যা ও উপদ্রব গত শতকে এত ভয়ানক বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ঠগীদের দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করায় বঙ্গসন্তানেরা উদ্বাহু নৃত্য জুড়ে দিয়েছিলেন। একজনের বক্তব্য এই—"সিন্ধু, পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে জয়পতাকা সমুত্থিত করিয়া ব্রিটিশরাজের যত না গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, মহাশল্যস্বরূপ ঠগী উৎপাত হইতে উদ্ধারপূর্বক ভারতের বক্ষস্থল সুশীতল করিয়া ততোধিক যশোলাভ হইয়াছে সন্দেহ নাই। অন্য কোন মঙ্গলসাধন না করিয়া ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা যদি এখান হইতে জন্মের মত স্বদেশ যাত্রা করেন, তথাপি ভারতবর্ষ এই মহোপকারের নিমিত্ত চিরদিন তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবে সন্দেহ নাই।"

সমসাময়িক কয়েকখানি গ্রন্থে ও কর্নেল স্লিম্যানের দিনলিপিতে ঠগীদের যেসব লোমহর্ষক কাহিনীর বর্ণনা আছে সেগুলি পড়লে ব্রিটিশের প্রতি এই ভক্তি উচ্ছ্বাসের কারণ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। হাচিসন তাঁর প্রবন্ধ শুরু করেছেন এই বলে…

Infanticides, Sattee. Jugannath and human sacrifices all shrink

to a mere vanishing point when compared with horrible crimes of thugee. শুধু নৃশংসতার দিক থেকেই নয়, ব্যাপকতার দিক থেকেও ঠগী-কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাচিসন তো বলেছেন এদের thug না বলে bug বলা উচিত। কারণ কখন যে কোথায় এরা লুকিয়ে থাকে কিছুতেই বলা যায় না, আর ছারপোকার মতই সংখ্যাহীন।

Thugs were found amongst the chief officers of villages, amongst the large landed proprietors, amongst shop-keepers, religious mendicants and even amongst the troops and government officials.

কিন্তু ব্যাপকতা ও ভীষণতা বোঝাবার পক্ষে এ বর্ণনা অকিঞ্চিৎকর। কর্নেল শ্লিম্যানের "রামশিয়ানা" গ্রন্থটি পাঠ করলে কিছু ধারণা করা সম্ভব হবে। শ্লিম্যান তদন্ত করতে গিয়ে এমন গ্রামও পেয়েছেন যেখানে সারা গ্রামকে গ্রাম ঠগীবৃত্তি গ্রহণ করে বসে আছে। হাজার মার খেয়েও কেউ কোন কথা প্রকাশ করে না। এক থানার দারোগা অন্য থানার এলাকায় ঠগী হয়ে নির্দ্বিধায় নরহত্যা করে।

মিসেস স্যালি ভারতে নবাগতা। কলকাতায় ছিলেন কয়েক বছর। তাঁর খানসামা ছুটি নিয়ে দেশে গেল। তাঁর স্বামী তখন মুর্শিদাবাদের পুলিস-সুপার। সেখান থেকে দেড়শো জন ঠগকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় পাঠালেন। ঠগ দেখার জন্য ভিড় জমে গেল। বন্দী ঠগদের মধ্যে মিসেস স্যালি দেখলেন তাঁর খানসামাই কেবল নয়, পুরাতন বাবুর্চিও আছে। আর প্রত্যেকেই অন্তত এক ডজন করে নরহত্যা করেছে। পশ্চিমাঞ্চলে এমন গ্রাম অনেক পাওয়া গেছে যেখানে সারা গ্রামের একজনও ব্যতিক্রম নয়। সবাই ঠগ, সবাই ফাঁসুড়ে। অনেক চেষ্টা করেও কারও মুখ থেকে সামান্যতম স্বীকৃতি আদায় করতে পারা যায়নি। বাধ্য হয়ে কর্নেল মনসিল, কর্নেল শ্লিম্যান প্রভৃতি অফিসাররা সারা গ্রামে আগুন জালিয়ে দিয়েছেন। এবং তাতেও ফল হয়নি। ঠগেরা অনেকেই ধর্মীয় কুসংস্কারবশে বংশপরম্পরায় এই বৃত্তি গ্রহণ করত। তাদের ধারণা ছিল, কোন ঠগের নাম প্রকাশ করলে মা কালী বা ভবানীর অভিশাপ ভোগ করতে হবে। "Destruction was their war cry. The Great Mahadevi was their goddess.

ঠগবৃত্তি ছিল আন্তঃপ্রাদেশিক এবং জাতি-গোত্রহীন।

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ঠগের দল হয়ত নদীপথে ঘুরে বেড়াত। ক্রমান্বয়ে দু বছর বা দশ বছর শিকার চালিয়ে যখন ঘরে ফিরত তখন হাতে অনেক

টাকা। আবার এমন দলও ছিল যারা চিরভ্রাম্যমাণ, কোথাও স্থায়ী আস্তানা নেই, সারাজীবন রত্নাকরবৃত্তি করেই কাটিয়ে দিত।

স্থলপথে যারা ঘুরে বেড়াত তারা দলে থাকত সাধারণতঃ পনর-কুড়ি জন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভেক নিত সহজ সরল গ্রাম্য-ব্যবসায়ীর। সঙ্গে বড় একটি তাঁবু, চার পাঁচটি ঘোড়া, সামান্য কিছু তৈজসপত্র। ঘোড়ার পিঠে সব কিছু চাপিয়ে শিকার-সন্ধানে দিনের পর দিন পথ চলত। পথিমধ্যে শাঁসালো পথিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আলাপ করত গায়ে পড়ে। এই আলাপ করাটাই ছিল আর্ট। আলাপ-চারণায় মুগ্ধ হয়ে পথিক ভিড়ে পড়ত দলের সঙ্গে। দূরপাল্লার যাত্রায় একলা যাওয়ার চেয়ে দলের সঙ্গে যাওয়া অনেক নিরাপদ, বিশেষতঃ সঙ্গে যখন টাকা-কড়ি থাকে।

এর পরের ঘটনা সহজেই অনুমেয়। একটু নির্জন স্থানে গলায় ফাঁস পরিয়ে একটু টান। ইহলীলা খতম। এই ফাঁস দেওয়াও ছিল এক আর্ট। দলের সবাই এ কাজ পারত না। শেখানোও হত না।

এই সব ঠগদের বলে ফাঁসুড়ে ঠগ। এ ছাড়াও ধুতুরিয়া, মেঘপুণ্যা, মঘীয়া, খেকারী, করুই, ঠগভাট ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ঠগ চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। ধুতুরিয়া ঠগেরা ধুতুরা বা কুচলিয়ার বীজ চূর্ণ করে পথিকের খাদ্য-দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিত। গলায় ফাঁস লাগিয়ে বা জলে চুবিয়ে সরাসরি নরহত্যা তারা করত না। মেঘপুণ্যাদের দলে যে সব স্থনরিয়া বা ধনোজী ব্রাহ্মণ থাকত তারা যোগী, বৈরাগী বা সন্ন্যাসীর ভেক নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াত। "ইহারা পথিকদলের মধ্যে পিতামাতা প্রভৃতি বড় বড় লোকদিগকে মারিয়া ছোট ছোট সন্তান-সন্ততিগুলিকে লইয়া বিক্রয় করে। বালিকাদের অধিক মুল্যে নট-জাতীয় বা অন্যান্য ঠগদিগের নিকট বিক্রয় করা ইহাদের একটি বিশেষ কাজ।" ঠগভাটেরা অবশ্য নিরীহ, খুনখারাপীর ধার ধারত না। চুরিবিদ্যাতেই এরা ছিল পারঙ্গম। পরিবারের ছেলেমেয়েদের খুব ছেলেবেলা থেকেই তারা এই মহাবিদ্যা শেখাত।

ভারতের সব প্রদেশেই ঠগদের নিজস্ব সাঙ্কেতিক ভাষা ছিল। বলা বাহুল্য এই ভাষার সাহায্যেই বারবার তারা পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মরক্ষা করত। কর্নেল শ্লিম্যান, বার্থ-উইক প্রভৃতি ইংরেজ কর্মচারীরা বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই ভাষা শিখেছিলেন। ধরা পড়ে যে সব ঠগ আপ্রুভার হত, তারাই দুর্বোধ্য ভাষার শব্দাবলী জানিয়ে দিত। দু একটি নমুনা দিই—

চিং (তরবারি), চিক (মোহর), ঢোন্‌কি (পুলিস), জনস্ জানো (পালিয়ে

ঝাও), দাপনি (ছোরা), বারকা (সর্দার), বিগুল (যাকে হত্যা করা হবে), চামু জানা (গ্রেপ্তার), চাণ্ডু (পাকা ঠগ)।

যে সব ঠগ অ্যাপ্রুভার হল তারা যে কেবল তাদের গুহ্য শব্দতত্ত্ব ফাঁস করে দিল তা নয়, তারা "হত্যাবিষয়ে অদ্ভুত বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত নিহত ব্যক্তির শুষ্ক গলিত এবং অভিনব দেহ সকল বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল। ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবুর নিকটে, ফকিরের আস্তানায়, সন্ন্যাসীর আশ্রমে, দেবালয় ও পান্থশালার পার্শ্বে নদীকূলে ও বৃক্ষমূলে যেখানে-সেখানে মৃতদেহ সকল বাহির হইতে লাগিল।"

খাস কলকাতার চৌহদ্দীর মধ্যে ঠগীদের উপদ্রব বড় একটা হয়নি। স্বভাবতই মফস্বল থেকে কোন ঠগীকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় আনা হলে তাকে দেখার জন্য ভিড় জমে যেত। একালে যেমন চোর ধরা পড়লে তাকে পুলিসের হাতে দেওয়ার আগে বেপরোয়া মারধোর করে জীবন্মৃত করে দেওয়ার রেওয়াজ আছে, কোন ঠগ কলকাতায় এলে তার প্রতিও সেই রকম আচরণ করা হত। অথচ মজার কথা এই, মফস্বলে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরাও এই পেশাকে হীনচক্ষে দেখতেন না।

হাচিসন তাঁর গ্রন্থে দুজন ঠগের ছবি এঁকে রেখেছেন। দুজনকেই কর্নেল শ্লিম্যান গ্রেপ্তার করে কলকাতায় চালান দেন। প্রথম টগ-দর্শনের অভিজ্ঞতা তিনি নিজ ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেননি। ভার্জিল থেকে দুটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন—

'I was astonished, my hair
stood erect
And my voice lingered in
my throat.'

বিদেশীদের চোখে সাহেব-নবাব

এদেশে

পলাশী যুদ্ধের পূর্বে যে কোন ইংরেজ ধনশালী হয়ে স্বদেশে ফিরে যায়নি তা নয়। অনেকেই ফিরেছে। কিন্তু তাতে বৈচিত্র্য ছিল না, দৃষ্টি আকর্ষণ করত না কারও। আর দশজন গ্রাম্য ব্যবসায়ীর মত সেও দেশে ফিরে জমিজমা কিনেছে। কিন্তু তারা 'নবাব' হয়ে দেশে ফিরতে শুরু করেছিল পলাশী যুদ্ধের পর। পলাশীর যুদ্ধ তাদের দৃষ্টিভঙ্গী আমূল পরিবর্তিত করে দেয়। ধনী হলেই চলবে না, মান প্রতিপত্তি খেতাব এসব চাই। ১৭৫৭তে হল পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৬৮তে দেখা গেল সাহেব-নবাবরা দেশে ফিরে দলবদ্ধভাবে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেছে, আর তার মাত্র তিন বৎসর পর (১৭৭১) দেখা গেল হিউফুটের ব্যঙ্গ-নাটক "দি-নাবুব" গ্রন্থে নবাব-চরিত্র নিন্দিত ও উপহসিত হয়েছে। নাটকীয় ক্ষিপ্রতায় পটপরিবর্তিত হয়েছে। পলাশী-যুদ্ধ ইংরেজদের বাংলা তথা ভারতবর্ষের একেবারে অন্তঃস্থলে ঠেলে দেয়। বিপুল ধনসম্পদের মুখোমুখি, সামান্য একটু পরিশ্রম করলেই একেবারে শ্যাংগ্রিলা। ফলে যারা "ছোট ইংরেজ," সামান্য চাকরি সম্বল করে কোন রকমে এদেশে এসে পৌচেছে তারা ভারতীয় আদব-কায়দা কিছু কিছু গ্রহণ করতে শুরু করল, ভারতীয় বিলাসিতাকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে গ্রহণ করে কৃতার্থ হল। যারা "বড় ইংরেজ", রুচিবান, উন্নত সংস্কৃতির ধারক, তাঁরা (শোর, হেষ্টিংস্, ফোর্বস) তাঁরা ফার্সি সাহিত্য, হিন্দুপুরাণ, দর্শন পড়ে সময় কাটাতে লাগলেন।

এই সময় ভারতের মাটিতে আর এক শ্রেণীর ইওরোপিয়ানের আগমন শুরু হল। তারা ভাগ্যান্বেষীর দল। ক্লাইভ ও মীরজাফরের মধ্যে চুক্তি ছিল, কোম্পানির কোন কর্মচারীর নিকট থেকে নবাব নদীপথে যাতায়াতকারী মালের জন্য শুল্ক আদায় করতে পারবেন না। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারী নয়—এমন স্বাধীন ইংরেজ ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করাও কোম্পানি বা নবাবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে শুল্ক-রেহাই ও সরকারী অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে দলে দলে "ইংরেজ ফরাসী জার্মান ও আমেরিকানরা" (১) ইংরেজ সেজে বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে ব্যবসা করতে

---

(১) "English, French, German, American". —Forrest on Clive II.

শুরু করে দিল। পরিধানে ইংরেজ সিপাহীর পোশাক, হাতে ইংরেজদের পতাকা। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে শোনা যাবে, সে কোন বিশিষ্ট ইংরেজের গোমস্তা বা এজেন্ট, চ্যালেঞ্জ করলে নকল পরিচয়-পত্র পর্যন্ত দেখিয়ে দেবে। সাধারণ গ্রামবাসী, বিশেষতঃ সেদিনের সরল গ্রামবাসীদের পক্ষে কে আসল আর কে নকল স্থির করা সহজ নয়। ফলে এই সব ভাগ্যান্বেষীরা গঞ্জে বা নগরে হাজির হয়ে দেশী-ব্যবসায়ীদের বাধ্য করত বাজার দামের চেয়ে ঢের বেশি দাম দিয়ে তাদের মাল কিনতে। বস্তুতঃ এই সব ছদ্মবেশী "ইংরেজ" ব্যবসায়ীদের দুর্বৃত্তপনা দমন করতে গিয়েই মীরকাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের ১৭৬৪ সালে যুদ্ধ বাধে। যাই হোক, হেস্টিংস্ ১৭৭২ সালে নূতন আদেশ জারী করে এদের কলকাতার চৌহদ্দির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিলেন। অবশ্য নীলকর সাহেবরা এই আদেশের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল না। এই আদেশের ফলে ভাগ্যান্বেষী সাহেবদের মফঃস্বলে যাওয়া পুরাপুরি বন্ধ হয়নি বটে, কিন্তু বাংলার গ্রামে গ্রামে "গোরা-সাহেবরা" যে ত্রাসের, যে বীভৎস অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল তা অনেকাংশে দূর হয়।

এদিকে শহরেও দেখা দিল নূতন একশ্রেণী। তারা ভবঘুরে নয়, ভাগ্যান্বেষী নয়, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী। "অল্প-সময়ে অধিক অর্থ" সংগ্রহ করা তাদেরও লক্ষ্য। কোম্পানির বিভিন্ন পদে তাদের ঘনিষ্ঠ-পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আছেন। দেশের সেই "এলোমেলো" অবস্থায় "লুটেপুটে" খাবার জন্য তারা ব্যগ্র। সময় বেশি নেই। কোম্পানির শাসনব্যবস্থা একটু বেশী কায়েমী হয়ে বসলে, নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, আর সহজে পয়সা উপার্জন করা যাবে না। কোম্পানিতে বড় একটি পদ সংগ্রহ করতে পারলে পোয়া-বারো। নবাব হওয়া ঠেকায় কে?

টপহ্যাম লিখছেন বারিংটনকে ১৭৬৫ সালে—

"The Company's Civil Service is the only certain track to a fortune or preferment and much more on the Bengal Establishment than any other"(২) অর্থাৎ কোম্পানির সিবিল সার্বিসে প্রবেশ করাই হল বড়লোক হওয়ার নিশ্চিত পথ। আর এই সব পদের সেরা পদ হল কোন দেশী নবাব বা রাজা, অভাবে কোন বড় জমিদারের দরবারে বৃটিশ রেসিডেণ্টের পদ। এতে লাভ দু-দফা। প্রথমতঃ কোম্পানি নবাবকে যে বৃত্তি দিতেন সেটা রেসিডেণ্টের

(২) Topham to Barrington—Home miscellaneous series 765. P. 153

হাত দিয়ে পৌছাত। ফলে নবাবের নিকট থেকে এটাকা বাবদ কমিশন বা দস্তরী মিলত। দ্বিতীয়তঃ নবাব যখন তাঁর নিজ বিলাসের জন্য কোন বিলাতী জিনিস কিনতেন, সেটাও ঐ রেসিডেন্টই সরবরাহ করতেন। তার জন্যও মিলত কমিশন। শাঁখের করাতের মত দু-দিক দিয়ে কেটে তাঁরা টাকা রোজগার করতেন।

হিকির বন্ধু বব পট যেদিন মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে বৃটিশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলেন, সেদিন তিনি আনন্দের আতিশয্যে ফেটে পড়েন আর কি! He rejoiced for not only did the whole stipend allowed by Government to the Nabob pass through the Resident's hands······he had likewise the further advantage of purchasing and paying for every European article the Nabab wished to have."

মুর্শিদাবাদ থেকে চার মাইল দূরে আফজল বেগে বৃটিশ রেসিডেন্টের বাড়ি। পট ভবিষ্যৎ লাভের কথা ভেবে আগে থেকেই বিশ হাজার টাকা ব্যয় করে বাড়ি সাজাবার ব্যবস্থা করে বসলেন। নিমন্ত্রণ করলেন হিকি ও অন্যান্য বন্ধুদের সেই বাড়ি দেখতে। হিকি সেই বাড়ি দেখে মুগ্ধ। সে বাড়ি নয়, প্রাসাদ···of the completest kind with warm and cold baths belonging exclusively to them and every other luxury of the East.

পোলিশ পর্যটক ম্যাক্সিমিলিয়ান উইকলিনস্কি এই সময়ের (১৭৬৮-৮১) কলকাতার বর্ণনা করেছেন—there were stately palaces where rich furniture pointed to the great wealth of the inmates whose voluptuous life resembled rather that of the Nawabs—they drank out of golden cups the best wines of the world. Over 2000 carriages perpetually rolled in that modern Babylon the governors of which could be compared, as regards pomp, power and magnificience, to real kings."

কলকাতার সাহেব-নবাবদের দৈনন্দিন জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র আছে ম্যাকিনটসের (১৭৭৭-১৭৮১) ভ্রমণ কাহিনীতে। বর্ণনাটি একটু দীর্ঘ—

"সকাল প্রায় সাতটায় দ্বারোয়ান গেটের দরজা খুলতেই সাহেবের সরকার, পিওন, হরকরা, চোপদার, হুঁকাবরদার, খানসামা, রাইটার ও সলিসিটরের দল বারান্দায় এসে জড়ো হয়। হেড-বেয়ারাসহ জমাদার সর্বপ্রথম হলঘরের মধ্য দিয়ে সাহেবের শয়নকক্ষে সকাল আটটায় প্রবেশ করে। সাহেবের পাশ থেকে এক মহিলা উঠলেন,

তাঁকে পাশের গোপন-সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল পাশের কোন ঘরে বা একেবারে বাড়ির বাইরে। সাহেব শয্যা থেকে একটু নড়ে একটি পা বাঁড়াতেই বাইরের অপেক্ষমান সকলেই সাহেবের ঘরে প্রবেশের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। তারপর সালামের পালা। শরীরটাকে বাঁকিয়ে, মাথা নিচু করে, হাতের তালু কপালে ও উল্টা দিকে পিঠ স্পর্শ করে তিনবার তারা সেলাম করল। তিনি চোখ মেলে তাদের দিকে তাকিয়ে বা ঈষৎ মাথা নেড়ে অনুগ্রহপ্রার্থীদের সালাম গ্রহণ করলেন। আধ-ঘণ্টার মধ্যে তাঁর ঢিলা পায়জামা চলে গেল, অঙ্গে উঠল নতুন পোশাক-শার্ট, ব্রিচেস, স্টকিং স্লিপার—সব কিছু। তিনি স্ট্যাচুর মত বসে রইলেন, কিছুই তাঁকে করতে হল না। নাপিত এল, ক্ষৌরকর্ম সমাধা করল, নখ কেটে, কানের ময়লা সাফ করে সে বিদায় নিল। এরপর এল আর এক নফর, হাতে চিলমজী ও বড় বালতি বোঝাই জল নিয়ে। সাহেবের হাতে ও মুখে জল ঢালা ও তোয়ালে দিয়ে সেই তাঁর গাত্র-মার্জনা করাই তার কাজ। অতঃপর মহাশয় হেলতে দুলতে গেলেন ব্রেকফাস্টের ঘরে। গায়ে কেবল ওয়েস্টকোট। খানসামা চা ও টোস্ট এগিয়ে দিল। এবার আগমন হেয়ার-ড্রেসারের। অপর দিক দিয়ে হুঁকাবরদার। প্রায় নিঃশব্দে নলের একটি প্রান্ত সে বাবুর হাতে ধরিয়ে দেয়। হেয়ার ড্রেসার সাহেবের মাথায় যখন টেরি বানাতে ব্যস্ত, সাহেব তখন হুঁকো টানেন, কিছু খান বা পান করেন।

কখন এক সময়ে বেনিয়ানের আবির্ভাব হয়। সাহেবকে সালাম করে সে (অন্যান্য নফরদের তুলনায়) একটু বেশি সামনের দিকে এগিয়ে যায়। উপস্থিত অনুগ্রহপ্রার্থী-দের মধ্যে যাদের গুরুত্ব বেশি, তাদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা থাকে। বেলা দশটা পর্যন্ত চলে এই অনুষ্ঠান। তারপর সেই নফরের দল সারি দিয়ে সাহেবকে নিয়ে যায় পাল্কি পর্যন্ত। পাল্কির আগে আগে ছুটে চলে আট থেকে বারো জনের চোপদার, হরকরা ও পিওন-বাহিনী। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ড্রেস, মাথায় পাগড়ির রং ও কোমরবন্ধ দেখে তাদের পদমর্যাদা বোঝা যায়।”

বর্ণনাটি দীর্ঘ, হয়তো সামান্য একটু আতিশয্যদোষদুষ্ট। কিন্তু মোটামুটি এই হল সাহেব-নবাবের রোজনামচা। পলাশী-যুদ্ধ বৃটেনের হাতে বাংলার রাজশক্তিকে তুলে দিয়েছিল। পলাশী-যুদ্ধ সৃষ্টি করেছিল এই “নবাবদের।” পলাশী-যুদ্ধ বৃটিশ সেনাবাহিনী তথা সিবিলিয়ানদের মধ্যে এনে দিয়েছিল এক নূতন শ্রেণীচেতনা। সর্বোপরি পলাশী-যুদ্ধ সাধারণ শহর কলকাতাকে দিয়েছিল কস্‌মোপলিটান রূপ।

পয়সা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার অনাড়ম্বর জীবনে দেখা দিল বিলাসিতা।

ফলে অনেক সাহেব দেশী নবাবদের অনুকরণ করতে শুরু করলেন। নাচের আসরে যাওয়া ও বাড়িতে নাচের আসর বসানো ছিল নব্য-নবাবদের ফ্যাশান। নাচ যে কিছু বুঝতেন এমন নয়, গানও তাঁদের কাছে বোধগম্য হওয়া দূরের কথা, বিরক্তিকর বলেই মনে করতেন। তবু ফ্যাশান চাই। আগে দেশী মদ "আরক" পান করেই তাঁদের দিন কাটত। এখন আরক হয়ে পড়ল "পুওর ম্যানস ড্রিঙ্ক।" আরক ও হুইস্কি প্রায় একই রকম বলে হুইস্কি পর্যন্ত "জেণ্টলম্যানস্ ড্রিঙ্ক" বলে দীর্ঘদিন স্বীকৃত হয়নি। হুঁকা-সেবন অনেকেরই স্বভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। সম্ভবতঃ তামাকের সুগন্ধই এর কারণ। পকেটে পয়সা আসায় সাহেব-নবাবরা দেশী নবাবদের অনুসরণে নিজ নিজ বাড়িতে হারেম গড়ে তুলতে লাগলেন। আগে ইংরেজদের কেউ কেউ পর্তুগীজ বা অন্যান্য খৃষ্টান নারীদের এদেশে বিয়ে করতেন। নতুন যারা এলেন তাঁরা ইংরেজ ছাড়া অন্য কোন নারী বিয়ে করা সম্মানহানিকর বলে মনে করলেন। বরং টাকা যখন আছে তখন বিয়ের পরিবর্তে উপপত্নী গ্রহণই নিরাপদ। তদানীন্তন ভারতীয় রীতি অনুসারে একাধিক উপপত্নী গ্রহণ নিন্দনীয় ছিল না। পূর্বে কলকাতার মধ্যেই একতলা বাড়িতে কোন রকমে মাথাগুঁজে বাস করতে হত। এখন হাতে পয়সা, অতএব খাস শহর ছেড়ে বাইরে তাঁরা বাগানবাড়ি ও বসতবাড়ি বানাতে শুরু করলেন। গার্ডেনরীচ, বারাসত, ব্যারাকপুর প্রভৃতি স্থানে গড়ে উঠল নতুন নতুন বাগানবাড়ি। কেউ কেউ বিলাস-ব্যসন চরিতার্থ করার জন্য ফরাসি চন্দননগরে, ডেনিশ শ্রীরামপুর বা ডাচ চুঁচুড়াতেও বাড়ি বানালেন। কলকাতার ঐশ্বর্যের ও বিলাস-ব্যসনের খবর বিলেতে পৌঁছবার পর সেখান থেকে অনূঢ়া কন্যারা দলে দলে আসতে শুরু করলেন স্বামী শিকার করতে। তাছাড়া, নতুন যে সব অফিসাররা আসতে লাগলেন, তাঁরা স্ত্রী ও অন্যান্য পরিজনবর্গসহ এলেন। ফলে মহিলাদের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেল। গড়ে উঠল সোসাইটি। সোসাইটির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী-নাচ। আগে গভর্নমেণ্ট হাউসে "বল নাচ" হত, কিন্তু বছরে মাত্র দু-একবার। এখন বারোমাস। বাইরে ক্লাব ঘরে বা বিশিষ্ট সাহেবদের প্রশস্ত হলঘরে নাচের ব্যবস্থা। রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, শীত-গ্রীষ্ম ভেদাভেদ নেই। এমনকি নাচেরও কুল-গোত্রের বালাই নেই। নাচ হলেই হল।

"চরম গরম বা বর্ষার সময়েও এমন একটি সপ্তাহ ছিল না যখন নাচ বাদ পড়েছে। যে ঘরে তার আয়োজন সেখানে পাখা নেই, মৃদু মোমবাতির আলো। 'কোটিলোঁ' নাচতে হলে যে পরিশ্রম হয় তার ফলে নাচিয়েদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে।"

কিন্তু সে পরিশ্রম কেউ গায়ে মাখতো না। হাজার হোক দয়িতার সঙ্গে সাক্ষাতের এই তো সবচেয়ে নিরাপদ সুযোগ। এশিয়াটিকাস কলকাতার নাচের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"নিজেকে সেই অবস্থায় একবার কল্পনা কর। অসহ্য গরমে তোমার প্রেমাস্পদা ম্রিয়মাণ। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পমান। প্রবল অবসাদের জন্য কোমল অঙ্গ সঙ্কুচিত। আর তার দয়িত (নাচের পার্টনার) দুই হাতে মসলিনের রুমাল দিয়ে সানন্দে মুক্তাবিন্দুবৎ মুখের ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছে।" (৩)

বিলাতী নাচ চালু ও জনপ্রিয় হয়ে উঠল বলে দেশী নাচ অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেল না। দেশী নাচ তাঁরা দেখতে যেতেন, বিলাতী নাচ নাচতে যেতেন। তাছাড়া সেনা-বাহিনীতে, যেখানে শ্বেতাঙ্গিনী ললনা দুর্লভ, সেখানে দেশী নাচের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রইল। নিজেদের অভিজাত প্রমাণ করবার জন্য সদ্য-জাতে-ওঠা ইংরেজরা প্রায়ই নিজ নিজ বাড়িতে দেশী নাচের ব্যবস্থা করতেন। আমন্ত্রণ করতেন অন্যান্য ইওরোপিয়দের।

পরিবর্তনের দ্বিতীয় জোয়ার এল ১৭৬৯ সালে। বাংলা দেশের জেলায় জেলায় তখন ইংরেজ "সুপার ভাইজার" নিয়োগ করা হয়। হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন ১৭৭২। ঐ বৎসর কোম্পানি নবাবের নিকট থেকে দেওয়ানি স্বহস্তে গ্রহণ করে। সুপারভাইজারদের নাম হয় কালেক্টর। কালেক্টরদের সরকারী কাজ ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার ছিল। হেস্টিংস জেলাপর্যায়ে অধিকাংশ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন ভারতীয় দেওয়ানদের উপর। কালেক্টর কেবল জেলার সদরে বসে টাকা গুনতেন আর বিচার করতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির রাজস্ব ও কোম্পানির বাণিজ্যে অর্জিত টাকা গোনা অপেক্ষা তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে অর্জিত টাকা গুনতেই ভালবাসতেন বেশি। এই বাণিজ্যে লাভ হত বিপুল। ফলে তাঁরাও সিবিলিয়ন থেকে "নবাবে" পরিণত হলেন। কর্নওয়ালিশ ১৭৮৭ সালে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে দিলেন। এমনকি কোম্পানির রাজস্ব আদায় ও কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনাকে

(৩) "Imagine to yourself the lovely object of your affection ready to expire with heat, every limb trembling and every feature distored with fatigue, and her partner, with a muslin handkerchief in each hand, employed in the delightful office of wiping down her face, while the big drops stand imparted upon her forhead." —Asiaticus.

দুটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত করে ফেললেন। ওয়েলেসলির আমলে (১৭৯৮) দেখা গেল প্রত্যেক অফিসারের ক্ষমতাই আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সেক্রেটারী বোর্ড অব রেভেন্যু বা কালেক্টর অব বার্ডোয়ান ইত্যাদি নামগুলি বেশ গালভরা হলেও তাঁরা বাঁধা মাইনের সরকারী কর্মচারী। ওদিকে কোম্পানির কর্মাসিয়াল ডিপার্টমেন্টে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের কোন জৌলুস নেই। চিনির বলদের মত কেবল চিনি বয়ে বেড়ায়, কিন্তু ভোগাধিকার নেই। শাসন ব্যবস্থায় তারা নাক গলাতে পারে না। গ্রামের ব্যাপারী বেনিয়ানরাও তাদের রক্তচক্ষুকে ডরায় না। ১৮১৩-তে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার চলে যায়। ১৮৩৩ সালে কোম্পানির বাণিজ্যিক পরিচয় একেবারে লুপ্ত হয়। কোম্পানি তখন কেবল শাসক, বণিকের মানদণ্ড আর হাতে নেই, কেবল রাজদণ্ড।

এর থেকে দেখা যায়, সাহেব-নবাবদের আয়ুষ্কাল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, জোয়ারের মত তাদের আবির্ভাব, আবার ভাঁটার টানে তাদের তিরোভাব।

বিদেশীদের চোখে সাহেব-নবাব

ওদেশে

বিলেতের হঠাৎ-নবাবদের কথা বলেছি। সৎপথে অর্থোপার্জন করে তারা কেউ নবাব হননি। পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাবকে অপসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা একে একে নবাব হতে শুরু করলেন।

যে ক্লাইভ একদা বার্ষিক পাঁচ পাউণ্ড মাহিনায় কলকাতায় চাকরি নিয়ে আসে, কালক্রমে সে-ই হয় 'ওয়েলদিয়েস্ট অব হিজ ম্যাজেস্টিস সাবজেক্টস্।' সিরাজের পর একদিন মীরজাফরেরও পতন হল, মীসকাসেম লাভ করলেন সিংহাসন।

১৭৬৪ সালের ২৩শে অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব সম্পূর্ণ পরাস্ত হলেন।

ইতিমধ্যে ডাচরা পরাজিত হয়ে বিদায় নিয়েছে চুঁচুড়া থেকে। ১৭৬০ সালে লেঃ কর্নেল আয়ার কূট ফরাসী সেনাপতি লালীকে ওয়ান্দিওয়াশের যুদ্ধে পরাজিত করেন। ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের যে বাসনা ডুপ্লে-র মনে জেগেছিল, তাও শেষ হল একদিন। ক্লাইভের তখন পোয়াবারো। তিনি তখন কিং-মেকার। এই সময়ের অবস্থা তিনি পরবর্তীকালে পার্লামেণ্টে আত্মদোষক্ষালন চেষ্টায় বলেছিলেন—"পলাশী-যুদ্ধের জয়লাভ আমায় কোন্ অবস্থায় বসিয়েছিল ভেবে দেখুন। আমার খেয়াল-খুশির উপর একজন বড় নবাবজাদা নির্ভরশীল। সে দেশের সেরা ধনীরা আমার মুখের একটুকরো হাসির জন্য রেষারেষিতে ব্যস্ত, কোষাগারের দ্বার কেবল আমার জন্যই উন্মুক্ত। ডাইনে ও বামে আমার দুপাশে কেবল স্তূপীকৃত সোনা ও মণি-মাণিক্য।"

মীরজাফর নিজেকে নিরাপদ করার জন্য কোম্পানির কর্মচারীদের কাছে খুলে দিয়েছিলেন তোশাখানার দ্বার। তার থেকেই নবাবীয়ানার সূচনা। কে কত টাকা পেয়েছিলেন তার তালিকা এই রকম।

গভর্নর ড্রেক ৩১৫০০, ক্লাইভ ২১১,৫০০, ওয়াটস্ ১১৭,০০০, কিলপ্যাট্রিক ৬০,৭৫০, ম্যানিংহ্যাম ২৭০০০, বীচার ২৭০০০, বোড্ডাম, ম্যাকেট ও কোলেট প্রত্যেক ১১৩৬৭, এমিয়ট ও পার্কস ১৫৩৬৬, ওয়ালশ ৫৬২৫০, স্ক্র্যাফটন ২২৫০০ লুসিংটন ৫৬২৫, গ্র্যাণ্ট ১১২৫০ পাউণ্ড।

বাংলা দেশে ইংরেজ শাসন ইওরোপের সেভেন ইয়ার্স ওয়ার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কায়েম হয়। ওদিকে কর্ণাটকেও তারা সুপ্রতিষ্ঠিত। সম্রাট শাহ-আলম এলাহাবাদে কোম্পানির ছত্রছায়ায় দিনাতিপাত করতে লাগলেন। মারাঠারা পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্ষোভে আক্রোশে খণ্ড-বিচ্ছিন্নভাবে শুরু করল লুঠতরাজ। উত্তরে আফগান ও পাঠানরা বিলুপ্ত হল আত্মঘাতী কলহে। দক্ষিণে হায়দর আলী ও টিপু ফরাসীদের উস্কানীতে ইংরেজ-আশ্রিত কর্ণাটকের নবাব মহম্মদ আলী ও হায়দরাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে থাকে। এককথায় বাংলা বিহারের বাইরে তখন চলছে অরাজকতা। অসংখ্য সামন্ত নৃপতি। প্রত্যেক নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই কলহের সুযোগ নিয়ে ইওরোপের বিভিন্ন দেশের ভাগ্যান্বেষীরা ভারতে এসে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে থাকে। কেউ সেনাদল পরিত্যাগী, কেউ জাহাজী নাবিক, কেউবা বোম্বেটে জলদস্যু, কেউ নিছক ব্যবসায়ীরূপে এদেশে আসে ও দেশীয় নৃপতিদের সেবা করে অর্থ সঞ্চয় করে। মারাঠা-নৃপতি মহাদজী সিন্ধিয়ার সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হয়েছিলেন পেরোঁ নামক এক অখ্যাত নাবিক। বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ থেকে পলাতক এক আইরিশম্যান পরবর্তীকালে জেনারেল জর্জ টমাস নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন, এমনকি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাছাড়া এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা যখন যে সামন্তের কাছ থেকে অধিক অর্থ পেতেন, তারই দলে যোগ দিতেন। তাছাড়া ছোট ছোট পেশাদার বাহিনী গঠন করে অনেকেই সামন্তদের কাছে নিজ বাহিনীকে ভাড়া খাটাতেন। হ্য-ব্যয়নি, রেনল্ড, পেড্রো ম্যাডাক ও ওয়াল্টার, রেনহার্ড প্রভৃতির খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মূলে এই ইতিহাস।

পলাশী যুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যদিও কোম্পানির কর্মচারীদের বেপরোয়া নবাবীয়ানার সূচনা, তবু শাসন-ব্যবস্থা পুরোপুরি কায়েমী করতে ও দেশীয় ধনীদের দুর্বলতা ও কোম্পানীর আইন মাফিক পাওনা ফাঁকি দেওয়ার রন্ধ্রগুলি বুঝে নিতে সময় লেগেছিল আরও কয়েক বৎসর। হোসম্যান তাঁর "নাবুবস্ ইন ইংলণ্ড" গ্রন্থে সাহেব-নবাবদের বসন্তকাল হিসাবে ১৭৬২ থেকে ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত গণ্য করেছেন।

ইওরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ভাগ্যান্বেষীদের মধ্যে যাঁরা পরবর্তীকালে বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন, তাঁরা পরিশ্রম করেছেন, বিপদের ঝুঁকিও নিয়েছেন অল্পাধিক। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের নবাব হওয়ার জন্য

এত পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়নি। কর্মচারীরা যে মাহিনা পেতেন তাতে বিলাসিতা দূরের কথা, দুবেলা ভালমত অন্ন সংস্থান হওয়াও বোধ করি সম্ভব ছিল না। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কছে থেকে উপহার বা নজরানা না পেলে এবং তৎসহ কোম্পানির ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেসরকারী বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ না থাকলে হয়তো কেউ ভারতে সে সময় আসতেই চাইতো না। 'অবাধ সুযোগ' বলেছি এজন্য যে কোম্পানির লণ্ডনস্থ ডিরেক্টররা বেসরকারী বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে দিলেও ভারতস্থ কর্মচারীরা, এমনকি খোদ গভর্নর পর্যন্ত বেসরকারী বাণিজ্যে লিপ্ত থাকতেন। একমাত্র দেশীয় কর্মচারীদের "উপরি" আয়ের কোন সুযোগ কোম্পানি দেয়নি।

ধনী হওয়ার এই সহজ অথচ নিশ্চিন্ত পন্থাটি যখন জানাজানি হয়ে গেল তখন প্রতিযোগিতা পড়ে গেল চাকুরি নেওয়ার। যে-কোন চাকরি, যত কম বেতনেই হোকনা—কেবল ভারতে যাওয়ার সুযোগ পেলেই হল। প্রয়োজন হলে ঘুষ দিতেও রাজী। পাব্লিক এডভার্টাইজার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বের হত—

WRITERS PLACE TO BENGAL WANTED

A Writers place to Bengal for which One Thousand Guineas will be given. There is not a third person in this business and the Money is ready to be paid down, without any written negotiation.

এই পত্রিকাতেই একস্থানে মন্তব্য করা হয়েছে যে, "গত বৎসর প্রতি রাইটার-শিপ দুই থেকে তিন হাজার পাউণ্ডে বিক্রয় হয়েছে, কিন্তু জনৈক ডিরেক্টরের ফেভ্‌রিট সুলতানো একটি রাইটারের পদ মাত্র পাঁচশো টাকায় বেচেছেন।"

এতক্ষণ যা আলোচনা হল তা থেকে বিলেতের সাধারণ মানুষ বাংলা তথ্য ভারতকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখতে পলাশী যুদ্ধের পর অভ্যস্ত হয়েছিল, সেটা অনুমান করা যায়। আর অর্থগৃধ্নু ইংরেজ যেমন ছিল, উদার রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ইংরেজের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। প্রকৃত ব্যাপার যখন জানাজানি হয়ে গেল, তখন সাধারণ মানুষের টনক নড়ল। অচিরে বিলেতের সাধারণ মানুষ বেশ উপলব্ধি করল যে, ভারত থেকে যে সম্পদ আহরণ করা হয়, তাতে উপকৃত হয় কেবল কোম্পানির মালিক ও কর্মচারীরাই। সাধারণ মানুষের সেই সম্পদে কোন অধিকার থাকে না। স্বভাবতই তারা হল ক্ষুব্ধ। পার্লামেন্টেও কোম্পানির কার্যকলাপের

সমালোচনা শুরু হল। ১৭৬৬ সালে লর্ড চ্যাথাম কোম্পানি পরিচালন-ব্যবস্থা পার্লামেণ্টের তদারকীতে আনার জন্য বিল প্রস্তুত করলেন। কোম্পানি বেগতিক দেখে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে এক চুক্তিসম্পাদন করল। এর ফলে সরকার প্রতি বৎসর কোম্পানির কাছ থেকে ৪০০০০০ পাউণ্ড রাজস্ব পাওয়ার অধিকারী হলেন।

কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা গেল না। জনসাধারণ নামক যে মানবপুঞ্জ দুর্বোধ্য অথচ অপ্রতিরোধ্য অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করে থাকে সব দেশে, তাদের মুখ বন্ধ করতে কবে কোন্ রাজশক্তি সক্ষম হয়েছে! কোম্পানির কর্মচারীরা তো নগণ্য। জনসাধারণের মৃদুগুঞ্জন ও কটু-সমালোচনার সঙ্গে সানাইয়ের পোঁ ধরল সংবাদপত্রগুলি। হঠাৎ-ধনী ইংরেজ-নবাবচরিত্র নিয়ে থিয়েটারে কমেডিয়ানরা মস্করা করতে শুরু করলেন, বিশেষ বিশেষ নবাবের নামে নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল, আলোচনাকে আরও মুখরোচক করে তোলার জন্য কোন কোন হঠাৎ-নবাবের নামে "হীন-বংশোদ্ভব" বলেও কুৎসা রটনা করা হল।

"Worthy offspring of a barber
Squeez'd twixt powder-puffs and leather".

সার টমাস রামবোল্ড সাধারণ অবস্থায় চাকরি শুরু করে পরবর্তীকালে মাদ্রাজের গভর্ণর হয়েছিলেন। দেশে যখন নবাব হয়ে ফিরলেন তখন গুজব রটল, তিনি নাকি আগে ছিলেন জুতো-পালিশওলা, এখন নবাব। তাঁর নামে ছড়া কাটা শুরু হল—

"When Mackreth served in Arthur's crew
He said to Rumbold "Black my shoe"
He humbly answered "yea, Bob"
But when returned from India's land
And grown too proud to brook command,
His stern reply was "Na-bob."

পয়সা হলেই মানুষ মর্যাদা চায়। বড়বাজারের লোহাকারবারী চায় রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হতে, সিমেণ্টের চোরাকারবারী চায় বিধানসভার সদস্যপদ। আর পয়সা হলেই সেটা প্রতিবেশীদের পরোক্ষে জানানো, অর্থাৎ চমকে দিয়ে সম্ভ্রম সৃষ্টিরও চেষ্টা থাকে। বিলেতেও তাই। বড়লোক হয়ে দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা চেষ্টা করতেন নিজ দেশে "বাবু" রূপে পরিচিত হতে এবং পার্লামেণ্টের সদস্য

হতে। পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হওয়ার জন্য সাধু-অসাধু সর্ববিধ পন্থাই তাঁরা নির্দ্বিধায় অবলম্বন করতেন। এইভাবে ক্লাইভ, রামবোল্ড, সাইক্স্ ও কুখ্যাত কুসীদজীবী বেনফিল্ড কেবল যে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেছিলেন তাই নয়, নিজেদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার মতলবে বহু সদস্যের ভোট পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতেন। ১৭৬০ থেকে ১৭৮৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৩০জন ইংরেজ-নবাব পার্লামেণ্টের সদস্যপদ লাভ করেছিলেন।

আর সম্পত্তি কিনে 'ভদ্রলোক' সাজার ঘটনাও অনেক ঘটেছে। বারওয়েল নবাব হয়ে দেশে ফিরেই কিনে ফেললেন এক বিরাট জমিদারী। লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের বাড়ি ও জমিদারীর দাম এক লক্ষ টাকা। বারওয়েল তাই দিলেন। হেস্টিংসের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু এবং কাউন্সিলের সভ্য। দেশে ফিরে তাঁর মেজাজের পরিবর্তন ঘটে। কখনো কোনো ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হলে দেরি করে যেতেন, এবং প্রতিবেশীদের সহ্য করতে পারতেন না। আগে হ্যালিফ্যাক্সের বাগান-বাড়িতে সবারই প্রবেশাধিকার ছিল। নতুন মালিক বারওয়েল বাড়ির চাকরদের হুকুম দিলেন সব প্রবেশ-দ্বার বন্ধ করে দিতে। ফল দাঁড়ালো এই যে, তাঁর সমবয়স্করা সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলতে লাগল এবং পাড়ার ছেলেরা তাঁকে পথে সাজগোজ করে চলতে দেখলেই শিস্ দিয়ে বা শেয়াল-ডাক ডেকে উপহাস করত।

আর এক নব্যবাবু হলেন মেজর চার্লস মারশাক্। দেশে ফিরেই তিনি লর্ড ক্যাডোগানের কাভারশ্যাম এস্টেট কিনে ফেলেন। তিনিও তাঁর বাগান-বাড়িতে "সাধারণের প্রবেশ নিষেধ" লটকেছিলেন, আগে কাভারশ্যাম এস্টেটে যে-সব দাস-দাসী চাকরি করত, নতুন প্রভু সর্বাগ্রে তাদের বরখাস্ত করলেন। নিয়োগ করলেন নতুন দাস-দাসী।

বৃদ্ধা ফরাসী দাসী, সুইস ভ্যালেট, ব্ল্যাকবয়, জেণ্টু কোচম্যান, মুলাটো ফুটম্যান, নিগ্রো বাটলার ! তাদের মুখের ভাষাও বেশ উঁচু জাতের। অনেক সন্ধানের পর মাঝে মাঝে দু-এক স্থানে ইংরেজী শব্দ খুঁজে পাওয়া যায়, তবে সেও কেবল ভুল করার জন্যই। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, তারা তাদের প্রভু মিঃ মারশাককে খাঁটি ইস্ট ইণ্ডিয়াম্যান বলে অভিহিত করে। কিন্তু মেজর মারশাক-এর বদলে তারা উচ্চারণ করে মেজর ম্যাসাকার। আর 'ইম্প্রুভমেণ্ট' কথাটির বদলে ব্যবহার করে "ডিভাসটেসন।"

বিলেতের তদানীন্তন ইংরেজ-সমাজ নিঃশব্দে সব কিছু হজম করেনি। আইনে এই

অর্থোপার্জনের জন্য শাস্তিবিধান করা হয়নি বটে, কিন্তু সমাজ ক্ষমা করেনি। হঠাৎ-নবাবরা ধীরে ধীরে প্রায় "একঘরে" হয়ে গিয়েছিলেন। অসংখ্য কবিতা ও নাটকে তাদের বিদ্রূপ করা হয়েছিল। গ্রামের অখ্যাত কবি ছড়া বানিয়েছিলেন তাদের নিন্দা করে। ১৭৭৩ সালে প্রকাশিত "দি নবাব অর এশিয়াটিক প্লাণ্ডারাস" নামে ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ব্যঙ্গ-কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে মাত্র দুটি ছত্রে নবাব-চরিত্র সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে,

It is a strong symptom they forgot to feel
Their breasts are stone, their minds as hard as steel.

অনেক সময় নাচের আসরে কোন মহিলা যদি কাউকে "হঠাৎ নবাব'" বলে বুঝতে পারতেন তবে তার সঙ্গে নাচতে অস্বীকৃত হতেন।

নাচের আসরে প্রকাশ্যে মহিলা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অধিক অপমান পুরুষের জীবনে আর কি হতে পারে? ব্যাপারটা ঘটেছিল আঠারো শতকে। কাজেই রুচি ছিল অধঃপতিত। যে কোন ধনীকে লোকসমক্ষে হেয় প্রমাণ করার জন্য পাড়ার লোক তার জন্মসূত্র সন্ধান করে অপবাদ রটাতে দ্বিধা করতো না। আগেই বলেছি সার হিউ ফুট তাঁর নায়ক সার ম্যাথুকে জন্মসূত্রে দইওয়ালার পুত্র বলে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন ছড়ায় দেখা যায় কাউকে মুচির ছেলে, কাউকে দাসীগর্ভজাত বলে অভিহিত করা হয়েছে। কাউন্টেস অব ইয়ারমাউথের নামে গুজব রটানো হয়েছিল মেছুনীর কন্যা বলে ও লর্ড কোর্টনে-কে বলা হয়েছিল তিনি একজন ফরাসী ভ্যালেটের (চাকর) সন্তান। টাউন এণ্ড কান্ট্রি ম্যাগাজিনে ১৭৭১ সালে "এক নবাবের স্মৃতিকথা" শিরোনামা দিয়ে এক কাল্পনিক নবাবের নামে মিথ্যা অথচ মুখরোচক গল্প বানানো হয়েছিল। ভূমিকায় বলা হয়েছিল—আমাদের নায়কের পিতা ছিলেন নাপিত। একভদ্রলোকের বাড়িতে চাকরের কাজ নিয়ে তিনি জীবন শুরু করেন ও পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক ডিরেক্টরের সুনজরে পড়ে রাইটারের পদ পান। ব্যক্তি-স্বাধীনতার দেশ ইংলণ্ডে সেদিন পর্যন্ত পিতৃ-পরিচয় তুলে গালি দেওয়া অবাধে চলেছিল। ইংরেজ-নবাবদের প্রতি এই সামাজিক ঘৃণা অন্তত ভারতের প্রতি বৃটিশ জনসমাজের সহানুভূতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

বিদেশীদের চোখে ফিরিঙ্গি

দেশী লোকেরা কখনো বলত ট্যাঁশ, কখনো ফিরিঙ্গি। এছাড়া আরও বহু নামে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাহেবরা নানা শব্দে তাদের অভিহিত করেছেন।

টোপাস, মুস্তি, ক্রিওল, পর্তুগীজ, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডো-বৃটন, মেস্তিজ, কাস্তিজ, ইত্যাদি কথা একই অর্থে ব্যবহৃত। পূর্বে যে-সব ইংরেজ ভারত সম্পর্কে বই লিখেছেন, তাঁরা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলে ভারতে দীর্ঘদিন বসবাসকারী যে-কোন ইংরেজকে বোঝাতে চেয়েছেন। পদ যাই হোক, রক্তের দিক থেকে খাঁটি ইংরেজ।

বিশ শতকে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলতে মিশ্রবর্ণের নরনারীদের বোঝায়। রক্তে তারা কুলীন নয়। কথাটি ঊনার্থক। কিন্তু এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বহু আগে ফিরিঙ্গিদের উদ্ভব হয়। ফিরিঙ্গি বলতে বোঝায় পর্তুগীজ ভারতীয় মিশ্রণ হলওয়েলের ব্যাখ্যা হল সরকারী ভাষ্য, কাজেই সেটা মেনে নেওয়া যায়। তাঁর মতে —"ফিরিঙ্গিরা পর্তুগীজ ও ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রণে উৎপন্ন। ধর্মে খৃস্টান হলেও ইংলণ্ডের রাজা অপেক্ষা মোগল সম্রাটের উপর তাদের আনুগত্য বেশি। রয়েল চার্টারে এদের হিন্দু বা মুসলমানদের ন্যায় নেটিভ বলে গণ্য করা হয়েছে।" (১)

হাচিসন বলেছেন ইউরেশিয়ান—"এ মিকশ্চার অব ইওরোপিয়ান এণ্ড নেটিভ ব্লাড"। তাদের স্বভাববৈশিষ্ট্যের কথাও তিনি বলেছেন—"জাতি হিসাবে তারা ভালো-ভালো পোশাক পরতে ভালবাসে। বড়ই অনুকরণপ্রিয়। নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে বড়ই সচেতন। হাস্যোদ্রেককারী অলীক মর্যাদাবোধ এত প্রবল যে, রাইটারের চাকরি ছাড়া আর কোন চাকরি তারা নেয় না। জুতো তৈরি, দর্জির কাজ, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী

---

(১) "By Feringy I mean all the black mustu Portuguese Christian residing in the settlement as a people distinct from natural and proper subjects of Portugal ; and as a people who sprung originally from Hindoos or Mussalman, and who by the law of nations cannot by their conversion to Christianity be exempted from their allegiance to the Mogul their natural lord, any more than a British subject is freed from his allegience to the king of England by embracing the Mohomedan faith and consequently this race of people are comprehended in in the Royal Charter under the word Natives as much as the Hindoos or Mussulman."

Holwell's letter
Consultations, June 16, 1755

ইত্যাদি প্রয়োজনীয় অর্থকরী কাজে তারা হাত দেয় না। অথচ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই। তাদের নিজের সমাজ তথা সমগ্র দেশের অলঙ্কাররূপে গণ্য করা যায়, এমন গুণবান ব্যক্তি অনেক আছে। সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে তাদের অবদান মূল্যবান। প্রসঙ্গত কিড্ ও ডি. রোজারিওর (ডিরোজিও) নাম করা যায়" (১)

হেবার এদের বলেছেন "হাফকাস্ট"। তিনি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে সমগ্র বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন—"ইওরোপিয়রা ব্যবসা-বাণিজ্য বা সরকারী কার্যোপলক্ষে ভারতে আসে। সঙ্গে স্ত্রী থাকে না; বাধ্য হয়ে জৈবধর্মের তাগিদে তারা লিপ্ত হয় অসৎ সংসর্গে, দেশী মহিলাদের সঙ্গে। অথচ ভারতে খাঁটি ইওরোপিয় অনাথা মেয়ের অভাব নেই। তাদের সম্ভাব্য পাত্রের সন্ধান করার জন্য মাঝে মাঝেই ইওরোপে পাঠানো হয়। কিন্তু প্রায়ই ইওরোপে পাত্র জোটে না। ব্যর্থমনোরথ হয়ে তারা আবার ভারতে ফিরে আসে।

"আমি ভারতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে এমন একজনকেও দেখিনি যিনি হাফ-কাস্টদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে, তাদের বর্তমান দুর্দশা এবং এই কলোনির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ভঙ্গের আশঙ্কায় উদ্বেগ প্রকাশ না করেন। ভারতে বসবাসকারী অনাথা শ্বেতাঙ্গদের বিয়ের ব্যাপারে এত আপত্তি কেন? যে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা সবাই করছেন, এতে সেই বিপদ অন্তত দূর হবে"

অবস্থার কত অবনতি ঘটেছিল সেটা "স্কেচেস অব ইণ্ডিয়া" গ্রন্থের গ্রন্থকার খোলাখুলি লিখে গেছেন। এমন অপ্রিয় সত্যভাষণ সমকালীন আর কোন ইংরেজ লেখকের রচনায় দেখা যায় না। তিনি লিখেছেন—

"ভারতের ইওরোপিয়রা ব্যাপকভাবে উপপত্নী গ্রহণ করে। বিবাহিত পরিবারের লোকজন উপপত্নী গ্রহণকারী ব্যাচিলরদের বাড়ি যাওয়া মোটেই পছন্দ করে না। উপপত্নী যদি ইওরোপিয়ান হয়, তবুও তাঁকে হীনচরিত্রা বলে পরিহার করে। "যদি হিসাব দিয়ে বলি যে, বিবাহিতরা ছাড়া বাকি ইওরোপিয়দের তিন-চতুর্থাংশ উপপত্নী গ্রহণকারী, তবে অত্যন্ত শোভন ও সত্যভাষণ করা হবে।

(১) "As a people they are very fond of dress, very vain and imitative, exceedingly jealous of their dignity and consequence, and from a false and rediculous feeling of pride they confined themselves to the profession of writers, to the exclusion of all the more useful trade, such as shoe-makers, tailors, carpenters, brick-layers etc. Many of them are however highly git ed, talented and useful men, as ornamental to Society as beautiful to their fellow-creatures." —Hutchison.

আরও একটু সাহস করে যদি বলি যে, এই সব ব্যক্তির (উপপত্নীগ্রহণকারী ইওরোপিয়গণ) অর্ধাংশ গড়ে দুটি সন্তানের পিতা, তবে আদৌ বাড়িয়ে বলা হবে না এবং অবৈধ সংস্রবজাত "ডেমি-বেঙ্গলী (আধা-বাঙালী) বর্ণসঙ্কর শিশুদের বিপুল সংখ্যা থেকে তার ভবিষ্যৎ বিপদের পরিমাণ আন্দাজ করে নেওয়া যায়।"

এর পর স্বভাব বর্ণনা—"দেশী অধিবাসীদের যাবতীয় কুসংস্কার ও দোষ তারা আত্মসাৎ করেছে, কেবল ভীরুতা ছাড়া। ইওরোপিয়ানদের অধ্যবসায়, ঔদার্য, সত্যানুসন্ধিৎসা বর্জন করে এরা কেবল তাদের দোষ ত্রুটি গ্রহণ করেছে। নানাশ্রেণীর মিশ্রণে এদের উদ্ভব—কারও মা হিন্দু, কারও মা মুসলমান, কারও মালয়ী। এই বৃহৎ অসন্তুষ্ট গোষ্ঠী যদি ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবে কী না ঘটতে পারে! দক্ষিণ আমেরিকায় যা ঘটেছে ভারতেও যদি তাই একদিন ঘটে যায়, তবে অবাক হবার কি আছে?

"এদের আছে কী? অর্থ নেই, মর্যাদা নেই, আত্মোৎসর্গের কোন সুযোগ নেই। এই সর্বরিক্তের দল বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে। এ যেন এক নাট্যমঞ্চ, যেখানে সবাই সবকিছু আশা করতে পারে। কিন্তু ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার পুরাতন নগণ্যতায় ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

শেষ মন্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে এই বর্ণসঙ্করদের পটভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

বস্তুতঃ ইংরেজ এদের আসবার বহু আগেই ইউরেশিয়ানদের উদ্ভব হয়েছে এদেশে। পর্তুগীজরা সবার আগে এসেছিল। দস্যুতা, নারীহরণ, দাস-ব্যবসায় ধর্মপ্রচার সর্বকাজেই তারা ছিল অগ্রণী। দেশী নারীদের সঙ্গে তারা বেপরোয়া সংসর্গ স্থাপন করে। ফলে ইউরেশিয়ানেদের উদ্ভব হয়। তারপর ফরাসিরা এসেও সেই পথ অনুসরণ করে। ইংরেজদের মধ্যে কিন্তু বর্ণের আভিজাত্যবোধ প্রবল থাকায় তাদের সঙ্গে ভারতীয়দের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে সবচেয়ে কম।

আঠারো শতক থেকে রোমান ক্যাথলিক মিশনারী ও কিছু উদারচেতা ইংরেজ অবহেলিত ইউরেশিয়ানদের সামাজিক মর্যাদাদানের চেষ্টা করে। সিয়ের লুয়েব (Sieur Luillier) লিখেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা ১৭০২ সালে—"টোপাস নামক ভারতীয় বালকদের ফরাসি পোশাক পরিয়ে রোমান-ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করেছে মিশনারীরা"। (১)

---

(১) "Topasses" were Indian boys brought up and clothed in the French fashion and instructed in the Catholic faith by Missionaries.

—Sieur Luillier : A voyage to the East India.

ড্যানিশ মিশনারীরাও অনুসরণ করেছিল সেই পথ। বস্তুতঃ সেদিনের সেই অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় সমাজের রীতি ছিল ইওরোপিয় পোশাক যে কেউ পরে, সেই খৃস্টান। মাথায় হ্যাট, পায়ে বুট, পরিধানে সাহেবি পোশাক, মুখে যে-কোন ইউরোপিও ভাষা থাকলেই ইওরেশিয়ান। যে-সব পর্তুগীজ দীর্ঘদিন ভারতে ছিল তারাও পরবর্তীকালে ইউরেশিয়ান বলে গণ্য হয়েছে। আর যে-সব ভারতীয় সেকালে খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের জাতে তোলার জন্য পর্তুগীজ মিশনারীরা ইউরেশিয়ান বলে চালু করে। তাদের পোশাক হত ইওরোপিয়, মুখে ভাঙ্গা পর্তুগীজ বুলি, গায়ের রঙ অবশ্য কালো, কাজেই ইউরেশিয়ান বলে চালু করাই সুবিধা। পক্ষান্তরে তখন যাঁরা খৃস্টান হতেন তাঁরাও ইওরোপিয়ানদের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের লোভে নিজেদের ইউরেশিয়ান বলতে দ্বিধা করতেন না। ১৭৯০ সালেও দেখা যায়, মাথায় টুপি ও পরিধানে ইওরোপিয় পোশাক পরিহিত পর্তুগীজ ও ভারতীয় সবাইকে টোপাস বলা হত। মেজর ব্ল্যাকিসটন তাঁর "টুয়েল্‌ভ ইয়ার্স মিলিটারি এডভেঞ্চার্স ইন হিন্দুস্তান" গ্রন্থে লিখেছেন, "গায়ের রঙ যতই কালো হোক, মাথায় হ্যাট থাকলেই তাকে ভাস্কো-ডা-গামার কোন অনুচরের বংশধর বলে গণ্য করা হয়"। (৪)

আঠারো শতকের শুরু থেকেই পর্তুগীজদের পথ অনুসরণ করে ফরাসি ও ইংরেজরাও ইউরেশিয়ানদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। ফরাসিদের মনে বর্ণবিদ্বেষ কোনদিনই ছিল না। ডুপ্লে স্বয়ং বিয়ে করেছিলেন চন্দননগরের একজন ক্রিওল রমণীকে। ভারতীয় ও ফরাসি মিশ্রণকে ক্রিওল বলা হত। ১৭৯০ সালে গ্র্যাণ্ডপ্রি লিখেছেন, পণ্ডিচেরীতে মাত্র দুটি কুলীন ফরাসি পরিবার আছে। তার মধ্যেও একটি পরিবারের একটি পুত্র দেশী রমণী বিয়ে করে কুলভঙ্গ করেছে। আঠারো শতকের শেষে ইউরেশিয়ানদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। এ্যাব দ্যুবয় এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা কালে লিখেছেন যে, ভারতে পর্তুগীজ মাত্রই ইউরেশিয়ান। খাঁটি পর্তুগীজের সংখ্যা নগণ্য এবং তারাও দীর্ঘদিন ভারতে অবস্থানের ফলে চরিত্র নষ্ট করেছে।"

আঠারো শতকের আগে যে-সব ইওরেশিয়ানের জন্ম, তাদের প্রায় সবাই অবৈধ সংসর্গজাত। দুই পক্ষের মধ্যে বিয়ে হত খুব কম। অবশ্য স্কিনার বা হিয়ার্সের

(৪) "Any man of colour however dark, who wears a hat, passes for a descendant of the companions of the renowned Vasco-da-Gama".

Major Blakiston.
P. 270

মত কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তি অভিজাত রাজপুত বা মোগল কন্যাকে বিয়ে করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই অবৈধ সংসর্গ স্থাপনে অগ্রণী হয়েছিল প্রথম দিকে পর্তুগাজ দস্যু ও বাণক সম্প্রদায়। তারপর সৈনিকরা। ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ইংরেজ ও ফরাসি উভয় পক্ষকেই নিজ নিজ দেশ থেকে সৈন্যবাহিনী আনতে হয়। যখন যেখানে সেনাদলের শিবির স্থাপিত হয়েছে, তখন সেখানেই তারা নিম্নশ্রেণীর দেহ-পসারিণী নারীদের সঙ্গে সংসর্গ স্থাপন করেছে। তারপর যুদ্ধ শেষে তারা চলে গেছে। নাবিকের দল অনুসরণ করেছে সেই পথ। জাহাজ বন্দরে অবস্থানকালে তারা সেখানকার সহজলভ্যা নারীদের সংস্রবে আসে। আবার জাহাজ বন্দর ত্যাগ করে দূরপথে রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বন্দরের বন্ধন কাটিয়ে চলে যায়। পশ্চাতে রেখে যায় তার রক্তবাহী সন্তান-সন্ততিদের। মাদ্রাজে এই ঘটনা ঘটেছিল সর্বাধিক।

পলাশী যুদ্ধের পর কলকাতা তথা সারা ভারত হয়ে উঠল ইওরোপের কুলগোত্রহীন ভ্যাগাবণ্ডদের শ্রীক্ষেত্র। সবাই এখানে আসে ভাগ্যান্বেষণে। সবারই ধারণা, এদেশের মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে সে 'নাবুব' হবেই। তাদের অধিকাংশই বিত্তহীন। তারা বিয়ে করত ইওরেশিয়ান কন্যাদের। তাছাড়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর লোকেরাও বিয়ে করত ইউরেশিয়ানদের। কিন্তু কোম্পানির অফিসার বা অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীরা বা শহরের অন্যান্য ভদ্রলোক ইংরেজরা তাদের বিয়ে করতেন না। কারণ স্বকৃতভঙ্গ হলে সমাজে খাতির মিলবে না। তাঁরা বিয়ে করতেন খাঁটি শ্বেতাঙ্গিনীদের, কিন্তু ইউরেশিয়ানদের গ্রহণ করতেন উপপত্নীরূপে; যেমন হিকি করেছিলেন। ইউরেশিয়ানদের আভিজাত্য-সচেতনতা ইংরেজরা কোন্ দৃষ্টিতে দেখত সেটা আগেই বলেছি। ইউরেশিয়ান কন্যা বিয়ে করলে ভদ্র সোসাইটিতে নিমন্ত্রণ জুটবে না, গভর্ণর জেনারেলের বাড়িতে কোনদিন ডাক পড়বে না। টেনাণ্ট লিখেছেন—

Marriages with officers were unpopular, because the parties were often excluded from society. But as the girls were unfitted by education for marriage with boys of their own class, they often became officers' mistresses.

মিসেস ফেণ্টন লিখেছেন—'It is very strange the prejudice existing here against half-castes.'

ইনস মনরো লিখেছেন (১৭৮০)—

'Portuguese girls, a few Moorish and Pariah women and those who have lost caste fell to European soldiers as temporary wives.'

পরবর্তী বিশ বছরের কথা লিখেছেন উইলিয়মসন। পর্তুগীজ বা ইউরেশিয়ান আয়ারা many of whom became house-keepers to single gentleman. বিশপ হেবার ও অন্যান্যরা লিখেছেন উনিশ শতকের কথা।

এ পর্যন্ত যাদের কথা বলা হল তারা ছিল সৈনিক, ভাগ্যাবণ্ড বা সেনাদল-বিতাড়িত ভাগ্যবিড়ম্বিত ব্যক্তি, নাবিক বা বণিক। ইংলণ্ডে যেমন তাদের কোন সঙ্গতি ছিল না, এদেশেও নেই। তাদের ছিল কেবল লালসা। পরিত্যক্ত সন্তান-সন্ততিদের জন্য অন্ধকার ভবিষ্যৎ ছাড়া কোন সম্বলই রেখে যায়নি। কিন্তু যে-সব পদস্থ ধনবান ইংরেজ ভারতীয় বা ইউরেশিয়ান মহিলাদের বিয়ে করেছিলেন বা উপপত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাদের পুত্রকন্যারা সব সময় অবহেলিত হয়নি। এদের সন্তানদের মধ্যে যাদের গাত্রবর্ণ মোটামুটি ফর্সা তাদের বিলেতে পাঠানো হত লেখাপড়া শেখার জন্য। ১৮০০ সালে পামার লিখেছেন হেস্টিংস্‌কে—"দুজনের গায়ের রঙ প্রায় ইংরেজদের মত ফর্সা। কিন্তু তৃতীয় জনের গায়ের রঙ কালো। তাকে বিলেতে পাঠাতে গেলে ধরা পরে যাবে (too dark to escape detection)."

বিলেতে তারা যতদিন পড়াশুনা করত, ততদিন তারা ছিল নাবুবের পুত্র। পয়সার অভাব হত না। লেখাপড়া শেষ করে যখন দেশে ফিরে আসত, তখন শুরু হত সত্যকার ট্র্যাজেডি। বাপের পয়সায় বিলেতে থাকাকালে তারা দারিদ্র্য কাকে বলে জানতো না। সেখানে তারা ভদ্রপরিবেশে উন্নত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়েছিল। রুচি হয়েছিল মার্জিত। আর দেশে ফিরে এসে হল স্বপ্নভঙ্গ। কপালে কোন বড় চাকরি জুটল না। জুটল সাধারণ কেরানীগিরি। দেশে ফিরে এসে দেখল তার ধনবান পিতা ভারত ছেড়ে ইংলণ্ড রওনা হয়েছে। সঙ্গে অর্জিত পয়সা নিয়ে গিয়েছে। ফলে বাপের তদ্বিরের জোরে যে ভাল চাকরি জোটাবে, সে পথ বন্ধ। বাপের আমলে হাতে পয়সা ছিল। এখন পয়সা নেই। অতএব কেউ খাতির করে না। অথচ বিলেতে লেখাপড়া শেখায় নজর হয়েছে উচ্চ। সাধ অনেক, সাধ্য নেই। তার উপর ১৭৯২ সালে নতুন আইন জারি করে হাফ-কাস্টদের সরকারী চাকরিতে গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল।

যারা বিলেতে যাবার সুযোগ পেল না, তাদের জন্য কলকাতা ও মাদ্রাজে

অনেকদিন থেকেই অরফ্যানেজ চালু ছিল। ১৭৮২ সালে অফিসার-পুত্রদের শিক্ষার জন্য নতুন যে আইন হয়, তদনুসারে অফিসারদের বেতনের একটি অংশ কেটে নেওয়া হত। কিন্তু তাতে লেখাপড়ার সুবিধা হলেও চাকরির সুবিধা হয়নি। ফলে লেখাপড়া কিছু শিখে বা না শিখে তারা হল সওদাগরি অফিসের কেরানী বা দোকানের শপ-এ্যাসিস্ট্যান্ট। কেউ গেল সেনাবাহিনীতে, কেউ পুলিসে। সেনা-বাহিনীতে যুদ্ধের জন্য নয়, ব্যাণ্ড ব্যাগ পাইপ বাজাবার জন্য এদের নেওয়া হত। পরবর্তীকালে সঙ্গীতে, খেলাধূলায় ও ইঞ্জিনীয়ারিঙে এদের অনেকেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে অন্ততঃ দুজনের কথা আজও বাঙালী মাত্রই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তাঁদের একজন আণ্টুনি ফিরিঙ্গি নামে বিখ্যাত। অন্যজন উনিশ শতকী রেনেসাঁর পথিকৃৎ ডিরোজিও। তাঁদের সমকালীন একজন বিশিষ্ট বাঙালী রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে ঐ দু'জনের সম্পর্কে যা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করলাম।

"তাঁহার নাম আণ্টুনি ফিরিঙ্গী। একজন ফিরিঙ্গী হিন্দু-কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল এই আশ্চর্য। শুনা গিয়াছে, আণ্টুনি ফরাস-ডাঙ্গার একজন সম্ভ্রান্ত ফরাসির পুত্র। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ফরাসডাঙ্গার বিখ্যাত গাঁজিয়ালদের সংসর্গে পড়িয়া বয়ে গিয়েছিলেন। তৎপরে কবিওয়ালাদিগের দলে প্রবিষ্ট হইয়া একজন বিখ্যাত কবিওয়ালা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দুর্গার প্রতি উক্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—

যদি দয়া করে তরো মোরে এ ভবে, মাতঙ্গি!
ভজন সাধন জানিনে, মা! জেতেতে ফিরিঙ্গী

পুনরায় আণ্টুনি ফিরিঙ্গী বলে, নিদানকালে মা
দিও চরণ দুখানি, দিও চরণ দুখানি।"

অতঃপর ডিরোজিও সম্পর্কে—

"ডিরোজিও সাহেব একজন ফিরিঙ্গী ছিলেন। তাঁহার পিতা একজন ইটালীয়ান ও মাতা এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি (হিন্দু) কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা তাঁহাকেই অধিক চিনিত, প্রধান শিক্ষককে অত চিনিত না। তিনি প্রগাঢ় বিদ্যা ও অকৃত্রিম স্নেহ দ্বারা ছাত্রদিগকে এমন বশীভূত করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাহারা ছাড়িতে চাহিত না। তিনি অতি প্রিয়ম্বদ ও সুকবি ছিলেন।……

তাঁহার এই দেশে জন্ম। কিন্তু অন্যান্য ফিরিঙ্গীরা যেমন বলে—'মোদের বিলাত', তিনি সেরূপ বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশজ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা বোধ করিতেন। তাঁহার একটি কবিতাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে কবিতাটি তাঁহার রচিত ভারতের একটি পুরাতন কাব্যের মুখবন্ধ।

স্বদেশ আমার। কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
ভূষিতা ললাট তব; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার, হায়! সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দিগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এইমাত্র পুরস্কার গণি,
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি"

দুঃখের বিষয় এই যে, একজন ফিরিঙ্গী ভারতবর্ষকে এমন প্রেমের চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু এক্ষণকার কোন কোন হিন্দু সন্তানকে সেরূপ করিতে দেখা যায় না। ডিরোজিওর স্বদেশানুরাগ, তাঁহার সদাশয়তা, তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যা ও জ্ঞান দেখিয়া তাঁহার কতকগুলি ছাত্র এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা সর্বদাই তাঁহার সহবাসে থাকিতে ভালবাসিত। তিনিও তাহাদিগের সহবাসে সর্বদা থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণপূর্বক বাঙালীদিগের সংসর্গে এরূপ বাঙালী হইয়া যান যে, তিনি যে সাহেবের পুত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।"

ফোর্ট উইলিয়মের ভূমিকা

লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ সালে লিখেছিলেন, সেক্রেটারিয়েটের অফিসার বা কেরানীরা পরিশ্রম করে যথেষ্ট। রাজ্যশাসনক্ষমতাও তাদের আছে, কিন্তু সে হল অশিক্ষিতপটুত্ব। নিজের গুণ। প্রকৃতপক্ষে দেশশাসনের উপযোগী কোন শিক্ষা তাদের নেই। ব্যক্তিগত বুদ্ধির জোরে তাঁরা বহু অসুবিধা জয় করে থাকেন বটে, কিন্তু চিরদিনই সবার মধ্যে সেই চরিত্রবল বা বুদ্ধির প্রাখর্য্য থাকবে এমন আশা করা যায় না। যে বয়সে মানুষ লেখাপড়া শেখে, সেই বয়সে কোম্পানির কর্মচারীদের স্কুল কলেজ ছেড়ে চাকরি নিয়ে ভারতে আসতে হয়। শাসনকার্য সম্পর্কে কোন জ্ঞান কারো নেই। দু-একজন ভারতে আসার আগে কোন কমার্সিয়াল-অফিসে বসে নকলনবিশীর (কপিং ক্লার্ক) কাজে হাত পাকিয়েছে। কিন্তু এই অবস্থায় আত্মসন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকা যায় না। অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কিসের উপর ভরসা করা চলে? দেশশাসনের ভার যখন নিতেই হয়েছে, তখন কোম্পানিকে সর্বতোপায়ে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

ওয়েলেসলি জানতেন, লণ্ডনের ডিরেক্টরবর্গের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না। সেখানে দলাদলির আবর্তে পড়ে তাঁর পরিকল্পনা ধামাচাপা পড়ে যাবে। কাজেই স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন কলেজ। নাম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

উদ্দেশ্য—কোম্পানির নবাগত কর্মচারীদের ভারত শাসনের উপযোগী শিক্ষাদান। ওয়েলেসলির বক্তব্য—নবাগত তরুণ কর্মচারীর প্রথম তিন বছর এদেশে কোন গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজ থাকে না। কাজেই সেই তিন বৎসর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করে ভারত সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে নিলে তার নিজের ও কোম্পানি দু'য়েরই উপকার হবে। ছাত্ররা কোম্পানির কর্মচারী হিসাবে যে মাইনে পাবে, তারই কিয়দংশ শিক্ষার ব্যয় হিসাবে কেটে নেওয়া হবে। প্রত্যেক ছাত্রের পাঠ্য-বিষয় হল ভারতের ইতিহাস, আইন ও কয়েকটি প্রাচ্য ভাষা। তাছাড়া সাধারণ শিক্ষা ত আছেই; যেমন—আন্তর্জাতিক আইন, নীতিশাস্ত্র, সাধারণ ইতিহাস, ভূগোল। কলেজের ডিসিপ্লিন সম্পর্কিত কানুনগুলি মোটামুটিভাবে অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজকে অনুসরণ করে হবে।

লণ্ডনের ডিরেক্টররা কলকাতায় কলেজ পত্তনের ব্যাপারটি সুনজরে দেখেননি। আসল কারণ কোম্পানির ডিরেক্টরদের স্বার্থগত দলাদলি। অজুহাত—অকারণ ঝামেলা বৃদ্ধি। কোম্পানির বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি ওয়েলেসলিকে সমর্থন জানালেন বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। ওয়েসেলি স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়ে কলকাতায় কলেজ পত্তন করবেন, ডিরেক্টরদের পূর্ব সম্মতি না নিয়ে—এও অসহ্য। কাজেই কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মকে কোণঠাসা করা হয়েছে। সেখানে কেবল বঙ্গদেশস্থ তরুণ ইংরেজ সিবিলিয়নদের পড়ানো হবে, মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের কর্মচারীরা এর এক্তিয়ার-বহির্ভূত।

কোম্পানির ডিরেক্টরবর্গ অবশ্য শেষ পর্যন্ত লণ্ডনেই এক নতুন কলেজ খুলে বসলেন ১৮০৬ সালে। হার্টফোর্ড ক্যাস্‌লে অবস্থিত এই কলেজের নাম হল "দি ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ"। ১৮০৯ সালে কলেজ স্থানান্তরিত হল হেলিবেরিতে। কলেজটি বেঁচে ছিল মোট পঞ্চাশ বৎসর, ১৮৫৭ সালে আয়ুষ্কাল শেষ হয়। যদিও ফোর্ট উইলিয়মের বিরোধিতা করার মধ্য দিয়েই এই কলেজের জন্ম হয়, তবুও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকেই হেলিবেরির ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ অনুকরণ করে। এখানেও পাঠ্যসূচী দুভাগে বিভক্ত—প্রাচ্য ও ইওরোপিয়। প্রাচ্যবিদ্যা বলতে শেখানো হত কেবল ভাষা। দুবছরের কোর্স, চারিটি টার্মে বিভক্ত। প্রথম টার্মে সংস্কৃতভাষায় হাতেখড়ি, দ্বিতীয় টার্মে শুরু হত ফার্সি শিক্ষা এবং তৃতীয় টার্মে সাধারণতঃ হিন্দুস্থানী বা অন্য কোন ভাষা। প্রথমে পনর থেকে বাইশ বৎসর পর্যন্ত ছিল ভর্তির বয়ঃসীমা। ১৮৩৩ সালে নিম্নতম বয়স স্থির হয় সতের। কিন্তু তাতেও একই ক্লাসে ছাত্রদের উচ্চতম ও নিম্নতম বয়সের মধ্যে পার্থক্য থেকে যায় প্রচুর।

এ্যাডিসকোম্বেতে ছিল আর এক কলেজ, সেখানে কোম্পানির সেনাবাহিনীকে শিক্ষাদান চলত। এখানে গৃহীত শেষ পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে ঠিক করা হত,—কে কোন্ শাখায় কাজ করবে—আর্টিলারি, ইনফ্যানট্রি বা ইঞ্জিনীয়ারিং। ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে সরাসরি লোক নিয়োগ করতেন কোম্পানির ডিরেক্টরেরা। ছাই ফেলতে ভাঙ্গাকুলো ছিল এই বাহিনীর। হেলিবেরিতে যে ছাত্র "সবচেয়ে বোকা ও অলস" প্রমাণিত হত, তাকেই নির্দ্বিধায় পাঠানো হত ঘোড়সওয়ার-বাহিনীতে। এখানকার কাজে যোগ্যতার প্রশ্ন অবান্তর।

কিন্তু কলেজে ছাত্র হয়ে আসতো কারা? ডিরেক্টরদের আত্মীয়তা ছাড়া এ কলেজে ছাত্র হওয়া সম্ভব ছিল না। বয়স কম, পাঠ্যবিষয় বিপুল; তদুপরি যে-সব

বিষয় তাদের শিখতে হত, কর্মক্ষেত্রে তাদের কোন মূল্য ছিল না। তাছাড়া লেখাপড়ায় ভাল হওয়ার চেয়ে, ছাত্ররা চেষ্টা করত স্বভাবে ভাল ছেলে হতে। তাতে পাস-করার সুবিধা হত। বিপদ এই যে, ডিরেক্টরগণ লোক নিয়োগের ব্যাপারে নিজেদের প্রভাব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। একটি শূন্য পদের জন্য চারজন প্রার্থীকে রেকমেণ্ড করা হত, আর তাদের মধ্যে হত প্রতিযোগিতা। সব চেয়ে সেরা যে, (অর্থাৎ যার খুঁটির জোর বেশি) তার কপালে জুটত চাকরি। অবশ্য এ নিয়ম চালু হয়েছিল ১৮৩৩ সালে। ১৮৫৩ সালে গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট অনুসারে স্থির হল—ডিরেক্টরদের কোন মাতব্বরি চলবে না। সবাইকেই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে চাকরি গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

যারা হেলিবেরির ছাত্র নয়, তারাও এই পরীক্ষায় যোগ দিতে পারবে। মেকলের ধারণা ছিল, ভারতে রাজ্যশাসনের জন্য লণ্ডনে বসে কোন শিক্ষালাভের দরকার নেই। সাধারণ লেখাপড়ায় একটু ভাল হলেই চলে। হেলিবেরিতে যে শিক্ষা ও পরীক্ষা-গ্রহণ পদ্ধতি প্রচলিত, তার এক নাম আত্মীয়পোষণ ; অপর নাম অযোগ্যকে খুঁটির জোরে উচ্চপদে বসানো। অথচ হেলিবেরির বাইরে গ্রেটবৃটেন নামক বৃহৎ একটি দেশ আছে, সেখানে ভাল স্কুল-কলেজের অভাব নেই। প্রকৃত মেধাসম্পন্ন বহু ছাত্র আছে যারা উপযুক্ত সুযোগ পেলে কর্মক্ষেত্রে প্রভূত যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে। কাজেই ভারতে কোম্পানির চাকরিলাভের অধিকার বৃটেনের সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হোক।

অবশ্য অপর পক্ষে হেলিবেরির অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বপক্ষেও কিছু যুক্তি ছিল। প্রথমতঃ সকলেই এক কলেজের ছাত্র হওয়ায় পারস্পরিক প্রীতি-সদ্ভাব গড়ে ওঠে স্বাভাবিকভাবে। যাকে বলা হয় "ফ্যামিলি স্পিরিট" অর্থাৎ পারিবারিক আত্মীয়তা-বোধ—তাই দেখা দেয় ছাত্রদের মধ্যে এবং স্বার্থগত ঐক্য বজায় রাখার দিকে লক্ষ্য থাকত সকলের। দ্বিতীয়তঃ, বাবা, কাকা বা অন্যান্য আত্মীয়গণ কর্তৃক মনোনীত হওয়ায় তাঁদের প্রতি ছাত্রদের কিছু কর্তব্য বা দায়িত্ব থাকত।

যাই হোক, ১৮৫৩ সালে কোম্পানির চাকরিতে যোগদানের পরীক্ষার সুযোগ সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা হল। প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে হত বলে, ১৮৫৩ সালের পর যাঁরা কোম্পানির কর্মচারী হয়ে ভারতে এসেছিলেন তাঁদের ঠাট্টা করে বলা হত "কম্পিটিশনওয়ালা"। ঠিক দশ বছর পর দেখা গেল, একজন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোম্পানির প্রজা হয়েও ইণ্ডিয়ান-সিবিল সার্ভিসে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

হেলিবেরি প্রসঙ্গ আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, এর থেকে অন্ততঃ বুঝতে কষ্ট হবে না, কোন্ শ্রেণীর জীবকে ভারত শাসনের মহৎ ও বিপুল দায়িত্ব দিয়ে এদেশে পাঠানো হত। এই অর্ধ-শিক্ষিত, ডিরেক্টরদের আশ্রিত আত্মীয়বর্গ ভারতকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখবে সেটা পুর্বেই অনুমান করে নেওয়া যায়।

হেলিবেরি কলেজের পরীক্ষা-পদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন ঐ কলেজেরই এক ছাত্র, বেঙ্গল-সিভিল সার্ভিসের রবার্ট নীডহ্যাম। ১৮৪০ সালে ইনি ছাত্র হিসাবে সেখানে ভর্তি হন। তিনিই লিখেছেন পরীক্ষার হলে সকলেরই মুখ যেত শুকিয়ে, স্মৃতিশক্তি সহসা হত লুপ্ত। পরীক্ষার হলে প্রবেশ করার আগে যে দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস ছাত্রদের ছিল তা ধীরে ধীর অপসৃত হয়ে গেল। অবশ্য কিছু কিছু ভাগ্যবান ছাত্র নিজেদের স্মৃতিশক্তির উপর আস্থা না রেখে মাথার বদলে পকেটে করে উত্তর টুকে আনতেন—

Modestly distrusting the retentive powers in their brains, have preferred the less perplexing method of carrying their information in their pockets, rather than their heads.

কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হত না। লম্বা মুখ ভয়ে ও হতাশায় আরো লম্বা হয়ে যেত।

পরীক্ষা পর্ব এক সময় শেষ হয়ে যেত। এবার ফলাফল। এদিন হল আশা-ভঙ্গের দিন। উৎকণ্ঠার শেষ নেই। সকলের পক্ষেই দুর্দিন। যারা পাস ক'রে ভাল পদ পেল, তারা আরও ভাল পদ না পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। আর যে সামান্য কিছু পেল, যথোচিত যোগ্যতার পুরস্কার তাকে দেওয়া হয়নি বলে সেও দুঃখ করবে। আর কেউ হয়ত কিছুই পেল না। প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু অভিযোগ থাকবে, প্রত্যেকের হৃদয়েই জ্বলবে হতাশার আগুন। এযেন লটারিতে ভাগ্য-পরীক্ষা—"The lottery tickets are distributed and all are discontended with their fate."

এরপর বিদায়ী ছাত্রদের আনুষ্ঠানিকভাবে উপদেশ দেওয়া শুরু হয়। একালে যেমন সমাবর্তন উৎসবে সদ্য-স্নাতকদের উদ্দেশে চ্যান্সেলর বা ভাইসচ্যান্সেলর বা অপর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি উত্তর-জীবনের করণীয় ও পালনীয় সম্পর্কে জ্ঞান-বিতরণ করেন, এও সেই রকম। হেলিবেরির পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের বোঝানো হয় তাদের সদ্য-আহৃত জ্ঞান-সম্পদের সুবিধা কোথায় ও কেন। "হিন্দুস্থানী শিখলে ভারতে চাকরদের সঙ্গে বাক্যালাপে সুবিধা হবে, সংস্কৃত পরিশ্রম করে শিখলে বাংলা বলা

সহজ হবে, ফার্সি শিখলে ভবিষ্যতে ইস্পাহানে বড় চাকরি নিয়ে বাণিজ্য-মিশনে যোগ দেওয়া চলবে, ইংলিশ চ্যান্সেরী আইন সম্বন্ধে একটু জ্ঞান থাকলে ভারতে পেনাল-কোড প্রয়োগ করতে অসুবিধা হবে না, ইংরেজি লিখতে অভ্যাস করলে বন্ধুদের ভাল চিঠি লিখতে পারবে সহজেই, আর অঙ্ক শিখলে টাকা গুনতে সুবিধা হবে।" শেষেরটাই হল আসল লক্ষ্য। গুনবার মত অঢেল টাকা চাই।

এটা সন্দেহাতীত যে হেলিবেরি ছিল স্বজন-পোষণের একটি বড় ঘাঁটি। শিক্ষা-দান বা শিক্ষালাভ কোনটিই আন্তরিকভাবে সম্পন্ন হত না। প্রত্যেকেই আসত খুঁটির জোরে, আসতো সৎ-অসৎ যে-কোন পন্থায় অর্থোপার্জন করে অল্প সময়ে ধনী হতে। চাকরি গ্রহণ ছিল ভারতে আসার পাসপোর্ট। সেটা নিমিত্তমাত্র। লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য টাকা। এত টাকা যা দুহাতে গুনে শেষ করা যাবে না।

কলকাতার অদূরে বারাসতে ছিল ক্যাডেট-কলেজ। তরুণ সৈন্যদের সেখানে পড়ানো ও সমরবিদ্যা শেখানো হত। সেখানকার ছাত্রদের নৈতিক মান যে খুব উন্নত ছিল এমন নয়। জেনারেল হিয়ার্স এখানে ছাত্র ছিলেন। তাঁর সময়ে এখানে সেনা-সংখ্যা ছিল পাঁচশো। স্মরণীয়, বিলেত থেকে বাছাই হয়ে তারা এখানে এসেছে, তা সত্ত্বেও তাদের কোন কাজে শুভ্র রুচির পরিচয় মিলত না। হিয়ার্স লিখেছেন, মাতলামি ও খুনোখুনি ছিল সেখানকার নিত্য ঘটনা। অনেক ঘটনার উল্লেখও করেছেন।

তিনি লিখেছেন—"সত্যকথা বলতে কি, কলকাতা থেকে মাত্র ১৬ মাইল দূরে এই বারাসতে শয়তানের দোসর পাঁচশো ছাত্র থাকত। ভোর রাত্রে ঘোড়ায় চেপে তারা ছুটত তাড়িখানায় বা অন্য দোকানে। শহরের লোকেরা তাদের আপদ-বালাই মনে করত। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, একবার কলকাতার চীফ জাস্টিস হুকুম দিলেন যে, যদি এদের কাউকে পুলিস গ্রেপ্তার করে আর দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে তিনি তাদের হয় ফাঁসির হুকুম দেবেন বা দেশে ফেরত পাঠাবেন। একজন ক্যাডেটকে সত্যিই দেশে পাঠানো হয়েছিল। একদল চাকর খোল করতাল সহ গান করায় এই সৈন্যটির নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। তাদের বিতাড়নের মতলবে, সৈন্যটি তার নিজের ঘরেই আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে তাকে বিচারের পর দেশে (বিলেতে) ফেরত পাঠানো হয়।"

বারাসত, হেলিবেরি বা এডিসকোম্বের কলেজ ছিল লক্ষ্যভ্রষ্ট। একমাত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজই ছিল প্রকৃত শিক্ষাস্থল। 'ডিসিপ্লিন' নামধেয় যে নৈর্ব্যক্তিক অথচ সহজবোধ্য আচরণ প্রণালী বোঝায়, সেটা এখানে অনুসৃত হত।

রাইটার থেকে কেরানী

কেরানী হল নেটিভ ক্লার্ক, সাহেব হলে বলে রাইটার। এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন উইলিয়মসন ১৮১০ খৃস্টাব্দে। তফাত নেই কিছু। তবু গরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে যেমন ড্রাইভার বলা চলে না, কেরানীকে তেমনি বলা চলত না রাইটার। উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর এ দুয়ের চৌহদ্দী ছিল স্বতন্ত্র। রাইটার বলতে কেবল একটি শ্বেতাঙ্গ মানুষ নয়, প্রভূত মর্যাদা ও ততোধিক আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন অভিজাতমন্য একটি বিশিষ্ট মানুষ। নিজের দেশে যাই হোক, এদেশে এলে রাইটার কেউকেটা ব্যক্তি। ছ'মাস পার হতে না হতে তিনি নিজস্ব পাল্কি কেনেন, ব্যক্তিগত পাইক বরকন্দাজ নিয়োগ করেন এবং অদৃষ্ট প্রসন্ন থাকলে এস্টেট পর্যন্ত কিনে থাকেন।

কিন্তু কর্মচারীদের কোন প্রকার বিলাসিতাকে কোম্পানীর লণ্ডনস্থ ডিরেক্টরবর্গ প্রশ্রয় দিতেন না। পূর্বেও নয়, পরেও নয়।

সপ্তদশ শতকে কলকাতা শহর পত্তন হওয়ার কিছু পূর্বে দেখা যায় কোম্পানীর বিভিন্ন কুঠিতে বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী, ভকিল, তাগাদগীর, পোদ্দার, এমন কি দেশীয় রাইটার পর্যন্ত চাকরি করেছে। এদের প্রত্যেককেই কোম্পানীর কাগজপত্রে 'ডোমেষ্টিক সার্ভেণ্ট' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এদের ঠিক উপরে ছিলেন সিনিয়র মার্চেণ্ট, মার্চেণ্ট, ফ্যাক্টর ও রাইটার।

১৬৭৯ খৃস্টাব্দে সুবে বাংলার বিভিন্ন কুঠিতে কোম্পানীর বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা ও তাদের বেতন সম্পর্কে একটি নির্দেশনামা সম্প্রতি দেখেছি। এই তালিকায় দেখি সিনিয়র মার্চেণ্টের সংখ্যা পাঁচজন, মার্চেণ্ট তিনজন, চ্যাপলেন একজন, সার্জন একজন, ফ্যাক্টর সাতজন ও রাইটার বারোজন। বেতন সিনিয়র মার্চেণ্টদের ৪০৲ টাকা, মার্চেণ্টদের ৩০৲ টাকা, চ্যাপলেনের ১০০৲ টাকা, সার্জনের ৩৬৲ টাকা, ফ্যাক্টরদের ২০৲ টাকা এবং রাইটারদের ১০৲ টাকা।

কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক এই সময় ছিলেন সিনিয়র মার্চেণ্ট, তাঁরও বেতন ছিল ৪০৲ টাকা। ভকিল, মুৎসুদ্দী, বেনিয়ান, তাগাদগীর বা দেশীয় রাইটারগণ 'ডোমেষ্টিক সার্ভেণ্ট' হলেও এদের বেতন দেওয়া হত না। এই নির্দেশনামায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, কোন দেশীয় কর্মচারীকে ছাঁটাই করা চলবে না, তাতে কোম্পানীর দুর্নাম বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তাদের বেতন দেওয়া হবে না। তারা টাকায় এক পয়সা

হারে দস্তুরি পাবে। যদি কোন মার্চেন্ট এর বেশী কিছু দেন তবে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই কর্মচ্যুত হবে। ঢাকায় নিযুক্ত ভকিলের খরচ বেশী, কাজেই তাঁকে কিছু বেশী দেওয়া যেতে পারে।

পলাশী যুদ্ধের প্রায় একশত বৎসর পূর্বেকার বেতনের হার উল্লেখ করলাম। ইওরোপীয় রাইটারদের মাসিক বেতন দশ টাকা হলেও সেদিনের জীবনযাত্রার মান অনুসারে দশ টাকা নেহাত কম নয়। কোম্পানীর কর্মচারীদের বামহস্তের উপার্জনের পথও তখন বেশী উন্মুক্ত হয়নি।

রাইটাররা নাবুব (Naboob) হতে শুরু করলেন এর একশত বৎসর পরে দ্বৈতশাসনের আমলে। নবাব-শক্তি পরাজিত। মীরকাশিম ও মীরজাফর রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্টদের খুশী করবার জন্য। দেশীয় জমিদার ও ভূমধ্যকারীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারীরা দুহাতে টাকা উপার্জন করছেন। বেআইনী ভাবে উপার্জিত এই অর্থের পরিমাণ ও অত্যাচারের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানা যেত না, যদি ফ্রান্সিসের সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরোধ না বাধত, এবং ইংলিশ পার্লামেণ্টে হেষ্টিংস ও ইম্পের বিচার না হত। হেষ্টিংসের সমগ্র শাসনকালই ছিল কোম্পানীর কর্মচারীদের রাম-রাজত্বের কাল। ভারতে আসবার জন্য ইংরেজ যুবকরা তখন পরম উৎসুক। যেভাবেই হোক একটি চাকরি বাগিয়ে কোনরকমে একবার ভারতে পৌঁছতে পারলে হয়—তারপর নবাব হওয়া ঠেকায় কে! ভারত থেকে একবার কেউ ফিরে এলে প্রতিবেশীদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন ওঠে, রাতারাতি সেই পরিবারের প্রতিষ্ঠা ও প্রতি-পত্তি বৃদ্ধি পায়। ভারতে যাবার এই আকুল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে 'পাব্লিক এডভার্টাইজার' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে—

WRITER'S PLACE TO BENGAL WANTED

A writer's place to Bengal, for which one thousand Guineas will be given. There is not a third person in this business, and the money is ready to be paid down without any written negotiation.

কোম্পানীর অধীনে ভারতে চাকরি পাওয়ার সহজতম পন্থা হল কোম্পানীর সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়া।

"পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর সৈন্যরাই শাসনযন্ত্র পরিচালনার মূলশক্তি।

সৈন্যবাহিনীর এই দুই শাখা থেকেই বড় বড় পদগুলিতে লোক নিয়োগ করা হয়। জজ, কমিশনার, ম্যাজিস্ট্রেট, রেভেন্যু অফিসার, সেক্রেটারী, পলিটিক্যাল রেসিডেণ্ট তো বটেই, অন্যান্য স্টাফ এপয়েণ্টমেণ্টও হয় এদের মধ্য থেকে। এর ঠিক নিচের স্তরের চাকরিতে নিয়োগ করা হয় ইউরেশিয়ানদের।" [হাচিসন]

১৮১৮ খৃস্টাব্দে কোম্পানীর ভারতস্থ কর্মচারীদের নাম, পদ, বেতন, কার্যকাল ইত্যাদি সম্বলিত একটি রেজিস্টার প্রকাশিত হয় কোম্পানীর লণ্ডনস্থ সদর দপ্তর থেকে। এই রেজিস্টারে কোম্পানীর সিভিল সার্ভেণ্টদের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যায় তখন বাংলায় ২৪০ জন সিনিয়র মার্চেণ্ট, ২৮ জন জুনিয়র মার্চেণ্ট, ৩৬জন ফ্যাক্টর ও ২০জন রাইটার কাজ চালাতেন। কোম্পানী তখনও প্রধানতঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, শাসন ক্ষমতা হাতে এলেও শাসনযন্ত্র তখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা নেই, অতএব কর্মচারীদের কাজ নেই। রাইটারদের সংখ্যা সেজন্য মার্চেণ্টদের চেয়েও কম। ভারতের মৌ-ভাণ্ডার তখনও নিঃশেষিত হয়নি।

একবার সিভিল সার্ভিস নিয়ে কেউ ভারতে এলে পারতপক্ষে দেশে ফিরে যেতে চাইত না। যে ২৪০জন সিনিয়র মার্চেণ্টের কথা পূর্বোক্ত রেজিস্টারে উল্লিখিত হয়েছে, তাঁদের কার্যকালের কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না।

শেরম্যান বার্ড (ঢাকার সিনিয়র জজ) কোম্পানীর চাকরি নিয়ে ভারতে আসেন ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে। দেখা গেল ৫৩ বৎসর পরেও তিনি বহাল তবিয়তে চাকরি করছেন। অগাস্টাস ব্রুক (বেনারসের সিনিয়র জজ) কোম্পানীর চাকরি নিয়ে ভারতে এসেছিলেন ১৭৬৮ খৃস্টাব্দে। দীর্ঘ ৬১ বৎসর পরে ১৮৩০ সালেও দেখা গেল তিনি চাকরি করে যাচ্ছেন।

রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ নামগুলির উপর এক নজর চেয়ে দেখলে বেশ বুঝতে পারা যায়, কোম্পানীর চাকরি তখন বৃটেনের কয়েকটি বিশিষ্ট পরিবারের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছিল। বার্ড, সিসেলি, প্লাউডেন, মঙ্কটন, বারওয়েল, স্টুয়ার্ট, ডিক, ফ্রেজার, লিণ্ডসে, রাসেল পদবীধারী কর্মচারী অন্তত চারজন করে এবং বেইলি, ক্যাম্পবেল, ডয়েলী, গ্র্যাণ্ট, হ্যারিংটন, ল, ম্যাকেনজী, মিডলটন, মোলনী, মনিনিস্‌বেট, স্কট, সেক্সপীয়র ও টড পদবীধারী কর্মচারী তিনজন করে ভারতে কাজ করছে। একই অফিসে একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি চাকরি করছেন এমন নজিরও আছে। এঁরা প্রত্যেকেই সিভিল সার্ভেণ্ট, কেউ রাইটার নন। এই তালিকায় কোন ভারতীয়

কর্মচারীর নাম নেই। ভারতীয়:কর্মচারীরা তখন পর্যন্ত স্থানীয় ভিত্তিতে ইওরোপীয় অফিসারদের অধীনে ব্যক্তিগত কর্মচারীরূপে যোগ দিতেন।

এতক্ষণ রাইটারদের কথা বলেছি। এবার কেরানীদের কথা বলি। কেরানীদের সম্পর্কে ইওরোপীয়রা বিশেষ আলোকপাত করেনি কেউ। কেরানীচরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন উইলিয়মসন, তাদের ছবি এঁকেছেন ডয়লী। তখন পর্যন্ত (১৮১০) কেরানীদের একমাত্র গুণ তাদের পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা। দ্রুত ইংরেজী বলতে এবং লিখতে পারা সত্বেও কেরানীদের অধিকাংশই একবর্ণ ইংরেজী বুঝত না। অথচ নিজেদের ইংরেজীজ্ঞানের পরিচয় দেবার জন্য তাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। ডিক্সনারী থেকে ভাল ভাল শব্দ বাছাই করে তারা প্রয়োগ করার সুযোগ খুঁজত।

(It may appear strange, but it is perfectly true that many crannies who can read and write English with fluency and correctness, do not understand one word in ten ! Some of them merely copyists, and are utterly ignorant as to the sense or purport of letters they transcribe in the highest style of penmanship. Others again affect great erudition, which they are desirous of displaying on all occasions. They pore over dictionaries until they think themselves perfectly finished.)

এদের নিজস্ব ইংরেজীর একটু নমুনাও উইলিয়মসন তুলে দিয়েছেন। তিনি যে কিছু অতিরঞ্জন করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং বাঙ্গালী কেরানীরা ভুল ইংরেজী লিখলেও তাতে লজ্জার কিছু নেই। স্মরণ রাখা দরকার, তখনও ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে মেকলের আবির্ভাব ঘটেনি, দেশে একটিও ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পক্ষান্তরে বহু ইংরেজ দীর্ঘকাল এদেশে বসবাস করা সত্বেও একবর্ণ বিশুদ্ধ বাংলা বলতে পারতেন না, এমন নজিরও প্রচুর আছে।

বাঙালী কেরানীদের পোশাক সম্বন্ধে উইলিয়মসন যে বর্ণনা দিয়েছেন, একালের তুলনায় সেটা বেশ কৌতুকাবহ। তাঁরা সাদা সাদা পোশাক পরতেন। হাঁটু পর্যন্ত তোলা ধুতি, কোঁচার একটি প্রান্ত রাখালী ভঙ্গীতে কোমরে বাঁধা। জামার ঝুল হাঁটুরও নিচে গিয়ে ঠেকেছে। কোঁচার একটি প্রান্ত কখনো কোমরে জড়ানো, আবার কখনো ঘাড়ের উপর ফেলে রাখা থাকে। মাথার পাগড়ী আকারে ছোট হলেও বেশ দৃঢ় সংবদ্ধ। মাথা আদ্যোপান্ত কামানো। চাঁদিটুকু বাদ দিয়ে বাকী মাথা পাগড়ী

দিয়ে ঢাকা। অনাবৃত চাঁদির পিছন দিক থেকে এক ইঞ্চি মোটা টিকি, তাতে সেটা প্রায়ই গিঁট দেওয়া অবস্থায় ঝুলে থাকে। এই টিকিতে হাত দিলে বা তার সম্পর্কে মন্তব্য করলে সে ভয়ঙ্কর চটে যায় এবং প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা করে বসে।

একালের ট্রাউসার বুসসার্টপরা কেরানীরা তাঁদের পূর্বসূরীদের বেশ বৈচিত্র্যের কথা একবার ভেবে দেখুন তো। তখনও কেরানীকুলে কায়স্থরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। নবাবী আমলেও হিন্দু কর্মচারীদের মধ্যে কায়স্থরাই ছিল সব চেয়ে কুলীন। হাচিসন উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে লিখেছেন·········from the ranks of the Hindoos issue that great class of enterprising and educated men called Kayasthas or writers, who discharge most important duties in Government law courts and mercantile offices."

বিদেশীদের চোখে দেশী নাচ

"কলকাতায় গেলে, অথচ সেখানে নাচ দেখনি? তবে আর কি দেখলে কলকাতার?" প্রশ্নটি প্রেষ্টিজ-ঘটিত। হোমে ফিরলে সেকালে ইংরেজদের পাড়া-প্রতিবেশীর কাছ থেকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হত। কলকাতায় গেলে কি কি দেখতে হবে, তার একটি তালিকা জর্জ পারবেরী তাঁর 'হ্যাণ্ডবুক অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে:

Perhaps there is nothing in India to which the stranger looks forward with more interest than the Nautches.

কলকাতায় এমন একটা সময় ছিল যখন সমাজে অভিজাত হিসাবে নাম কিনতে হলে বাড়িতে 'নাচ দিতে' হত। জাতে ওঠার সহজতম সোপান ছিল এটা। আর নাচের আসরে নিমন্ত্রিত হওয়া তো মর্যাদার স্বীকৃতি। ভি. আই. পি. ছাড়া কাদের কপালেই বা জুটতো সেই দুর্লভ সম্মান। নাচের আসরে যোগদানের জন্য মান্যগণ্য বাবুদের তো বটেই, বিশিষ্ট সাহেবদের সস্ত্রীক উপস্থিত হওয়ার জন্য স্বয়ং গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসার রেওয়াজ ছিল।

পলাশী যুদ্ধের পরে সাহেবরা যখন সহসা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে 'নাবুব' হয়ে উঠলেন, তখন দেশী রাজা-বাদশাহের অনুকরণে তাঁরাই হলেন দেশী নাচের পৃষ্ঠপোষক। দেশীয় জমিদার বা নবাবরা সাহেবদের আপ্যায়নের জন্য দুটি ব্যবস্থা করতেন, একটি প্রচুর মদের ব্যবস্থা, আর একটি হল নাচ। মিসেস কিণ্ডার্সলি (১৭৫৪) এক চিঠিতে লিখেছেন—when a black man has a mind to complement a European, he treats him to a Nautch". অবশ্য নাচ তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি। নাচের চেয়ে নর্তকীদের কটাক্ষ, চটুল হাসি ও অন্যান্য অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদির সমজদার বেশি: (It is their languishing glances, wanton smiles and attitude not quite consistent with decency, which are so much admired.)

ইওরোপীয়ানদের অনেকেই তাঁদের গ্রন্থে নাচের আসরের বর্ণনা দিয়াছেন। সকলেই যে খুব পছন্দ করেছেন, এমন নয়। নাচ ভাল লাগলেও গানের প্রশংসা প্রায় কেউই করেননি। বীরবল যে ইওরোপীয়ানদের সম্পর্কে বলেছিলেন,—'তোমাদের

বিদেশীদের চোখে দেশী নাচ

গানের আলাপ আমাদের কাছে বিলাপমাত্র, সাহেবরাও 'হিন্দুস্থানী মিউজিক' সম্বন্ধে সেই কথা বলেছেন। একই রমণীকে নৃত্য ও সঙ্গীত উভয়ই পরিবেশন করতে দেখে অবাক হয়েছেন কেউ কেউ। 'হিন্দুস্থানী মিউজিক' নাকি নাচ ছাড়া জমে না। মিসেস পার্লবি-র চোখে নাচ খুব খারাপ লাগেনি কিন্তু গান শুনে তাঁর মনে হয়েছিল "শব্দটি কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে, না, নাক থেকে বেরুচ্ছে।"

তখনকার দিনে সবচেয়ে বিখ্যাত নর্তকী নিকির নাচ তিনি দেখেছেন। নিকিকে তিনি "ক্যাটালিনি অব দি ইস্ট" বলে অভিহিত করেছেন। হাচিসনও নিকির সম্পর্কে ঐ বিশেষণই প্রয়োগ করেছেন। নিকিকে বাদ দিয়ে সেকালের কোন নাচের আসর আভিজাত্য লাভ করত না। দেশ-বিদেশ থেকে ডাক আসত তার, কিন্তু কলকাতা শহর ছেড়ে বাইরে কোথাও মুজরো করতে যেতো না সে।

পার্লবি কলকাতায় এসেছিলেন ১৮২৩ খৃস্টাব্দে, তার এক বছর পর ১৮২৪ খৃস্টাব্দে কলকাতায় আসেন বিসপ হেবার। শেষোক্ত জনও নিকির নাচ দেখতে গিয়েছিলেন। ডায়েরীতে তারিখ পর্যন্ত লেখা আছে, ১৮ই নভেম্বর। স্থান বাবু রূপরাম মল্লিকের বাড়ি। নাচের বর্ণনাটা তিনি লেখেননি, লিখেছেন মিসেস হেবার। বাবু রূপরাম মল্লিকের নূতন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ উৎসব উপলক্ষে গৃহস্বামী নাচ দেন। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে লেডী ম্যাকনটনের কথা মিসেস হেবার উল্লেখ করেছেন। পার্লবি নাচ দেখার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন রামমোহন রায়ের বাড়িতে। রামমোহন তখনও 'রাজা হননি, তখনও তিনি 'রিচ বেঙ্গলী বাবু' মাত্র।

পার্লবি যে নাচ দেখতে গিয়েছিলেন তা ছিল অনেক নর্তকীর দলবদ্ধ নাচ। তাদের নিম্নাঙ্গের পেটিকোট সোনারূপার কারুকাযখচিত একশো গজ চওড়া, সাদা মসলিনের অতি স্বচ্ছ এক আবরণ। পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বিত সাটিনের ট্রাউজার, মাথার উপর সোনারূপার চুমকীবসানো দোপাট্টা, হাত ও গলা 'নেটিভ' গহনায় ঠাসা। পায়ের মল পর্যন্ত পার্লবির দৃষ্টিতে অপরূপ মনে হয়েছে। নৃত্যের তালে তালে শোনা যায় নূপুর-নিক্কণ, তারই সঙ্গে তাল দিয়ে দেশীয় বাদ্যকরদল তাদের বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলে। এবার মিসেস হেবারের চোখ দিয়ে দেখা যাক। রূপরাম মল্লিকের নতুন বাড়ি আর তার বাইরের আলোকসজ্জা দেখে বিস্ময়ের চমক লেগেছিল তাঁর মনে। প্রাসাদতুল্য বাড়ি, ঠিক মধ্যস্থলে নাচঘর। সিলিং থেকে ঝুলছে ঝাড়লণ্ঠন, মেঝেতে মূল্যবান কার্পেট পাতা। হলের মধ্যে দুটি গ্যালারী, উপরের গ্যালারীর সম্মুখ দিক ভেনিসিয়ান কাচ দিয়ে ঢাকা। তার মধ্য দিয়ে পুরনারীরা নাচ দেখবেন।

মিসেস পার্লবির নাচ ভাল লেগেছিল, কিন্তু গান ভাল লাগেনি। অবশ্য মিসেস হেবারের ঠিক বিপরীত। তাঁর গান ভাল লেগেছে, কিন্তু "হাত ও মাথার সেই কষ্টকৃত বিপুল আন্দোলন"কে নাচ বলা যায় কিনা তৎসম্পর্কে তাঁর মনে যথেষ্ট সন্দেহ। তবে হ্যাঁ, নর্তকীর বাহাদুরী আছে। হাত ও মাথা নানা ভঙ্গীতে আন্দোলিত হলেও পা স্থির থাকে এক জায়গায়। হিন্দুস্থানী নাচের এ এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য। নটীর পোশাক সম্পর্কে অনেকে বিরূপ মন্তব্য করলেও মিসেস হেবার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন।

"অশালীনতার স্পর্শবর্জিত এমন নৃত্য আমি ইংলণ্ডেও দেখিনি। তাদের (ভারতীয় নটীদের) নাচের পোশাক রুচিসুন্দর—মুখ, পায়ের পাতা ও হাত ছাড়া আর কোন অংশই অনাবৃত নয়।"

"I never saw public dancing in England so free from everything approaching to indecency. Their dress was modesty itself, nothing but their faces, feet and hands being exposed to view."

ক্যাপ্টেন মাণ্ডিও প্রশংসা করেছেন এই পোশাকের। তিনি ছিলেন জাতিতে ফরাসী, নিজ দেশের ধ্রুপদী নৃত্যকলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি বলেছেন ইতালীয়ান বা ফরাসী নৃত্যশিল্পীদের তুলনায় ভারতীয় নৃত্যশিল্পীদের পোশাক অনেক বেশী রুচিসুন্দর।

"The dress of Indian dancing girl is infinitely more decent than that of our French or Italian figurantes......"

অবশ্য উর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র স্বচ্ছ হওয়ায় তিনি একটু কটাক্ষ করেছেন।

ক্যাপ্টেন মাণ্ডি সমজদার ব্যক্তি, রসিকসুজন। আসর জমাতে হলে কি কি করতে হয় তার স্থলুক-সন্ধান দিয়েছেন তিনি তাঁর গ্রন্থে।

"নাচঘরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি সম্বন্ধে নর্তকীকে আগে থেকে সাবধান করে দিলে, নাচওয়ালী ঘাবড়ে যাবে। নাচ হয়ে দাঁড়াবে "স্টুপিড ডিসপ্লে" মাত্র। আবার যদি তাকে 'বাহবা' 'বাহবা' করে বেশী উৎসাহ দেওয়া হয়, তবে নাচওয়ালী বাড়াবাড়ি করে বসবে, এমন কি নাচের নামে এমনভাবে অঙ্গভঙ্গী করবে যেটা অমার্জিত, অশোভন, অশালীন।"

ক্যাপ্টেন মাণ্ডির দেখবার চোখ আছে। শুধু নর্তকী নয়, তার সদাসঙ্গিনী বৃদ্ধাটির ভূমিকা সম্বন্ধেও তাঁর কৌতূহল ছিল। বলেছেন—"প্রত্যেক নর্তকীর সঙ্গে থাকে একজন বৃদ্ধা। সে তার মূল্যবান অলঙ্কার, পোশাক বহন করে, আসরে যেসব সোনার

মোহর নজরানা পড়ে সেগুলি সংগ্রহ করে তুলে রাখে। নর্তকীর স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে তার দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ, এমন কি তার চরিত্র রক্ষার দিকেও সদাসতর্ক দৃষ্টি। তার নাচ ও রূপ সম্পর্কে সমাগত ভদ্রমহোদয়রা কে কি বলছে, তার কান খাড়া রয়েছে সেদিকে।"

হাচিসনের দৃষ্টি ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। চোখ ও মন উন্মুক্ত রেখে তিনি নাচের আসরে গিয়েছিলেন। নিকির নাচ তিনি যখন দেখতে যান তখন তার দীপ্তি ম্লান, কণ্ঠস্বরের সে ভুবনমোহিনী মাধুর্য আর নেই। অন্যান্য সাহেবদের মত হাচিসনও হিন্দুস্থানী নাচ বা গান কোনটিই উপলব্ধি করতে পারেননি। সমবেত বাবুরা উত্তেজিত কণ্ঠে যেসব শব্দ নর্তকীর উদ্দেশে প্রয়োগ করেছিলেন তার'দু-চারিটি সংগ্রহও করতে পেরেছিলেন —'শাবাশ, বাঃ বাঃ, ক্যা-খুব' ইত্যাদি। পরে জেনেছিলেন এই শব্দগুলি অব্যয় নয়, এগুলি অর্থবহ। শাবাশ মানে হল 'হ্যাপিনেস টু ইউ', বাঃ বাঃ মানে হল "এডমিরেবল, ক্যা-খুব মানে হল 'হাউ-চারমিং'।

কিন্তু বাবুদের এই শাবাশধ্বনি নগরনটীর জীবনে আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। নটীজীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য হাচিসন অনেক চেষ্টা করেছেন এবং যেসব তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তা একদিকে যেমন লোমহর্ষক, অপরদিকে তেমনই অশ্রুসিক্ত বিষাদবিধুর। হাচিসনের গ্রন্থ যিনি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন তিনি ছিলেন একজন নীতিবাগীশ পাদ্রী। "একজনের অশ্রুসিক্ত কাহিনী পাঠ করে পাঠকদের আনন্দ উপভোগ" করাকে তিনি নীতিগর্হিত বিবেচনা করে, মুদ্রিত গ্রন্থ থেকে লোমহর্ষক অংশটুকু বাদ দিয়েছিলেন, প্রকাশ করেননি। গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে কেবল দুঃখসিক্ত অশ্রুসজল জীবনযাপনপ্রণালী।

সেকালের কলকাতায় নটীদের বাস ছিল বড়বাজারের এক প্রায়ান্ধকার গলিতে। নবাবদের হারেমের চেয়েও কঠোর বিধিনিষেধের লৌহ-যবনিকার অন্তরালে দীর্ঘ-নিশ্বাসে ভারী হয়ে উঠত তাদের আকাশ-বাতাস। "এই নিভৃত প্রকোষ্ঠে কয়েকটি ভীরু কোমল হৃদয়াধিকারিণী, মুক্তির আশায় দিন গুনছে, পুরুষত্বহীন প্রায়বৃদ্ধ একদল ব্যক্তির রক্তচক্ষুর কঠোর শাসন থেকে কে তাদের উদ্ধার করবে? কাজল-নয়না পরিহাসপ্রিয়া সুন্দরীরা ভেলভেটের নরম উপাধানের উপর যৌবনভার ন্যস্ত করে বয়সোচিত রূপ-মাধুর্য তিল তিল করে অপব্যয় করে চলেছে—গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের সময়েও একটুকরো হাওয়ার প্রবেশাধিকার নেই সেখানে, রাত্রের উষ্ণতা আরও তীক্ষ্ণ। তাপদগ্ধ নিস্তব্ধ দিবাভাগে তাদের একমাত্র সঙ্গী সুগন্ধী হুঁকা এবং মধুরসসিক্ত পান।

"এখানে এই গোপন প্রকোষ্ঠের একদিকে ঝকমকে ব্রোকেডের পোশাক, আর একদিকে ধূলিমলিন আসবাবপত্র ; একদিকে পুরুষত্বহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, আর একদিকে উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী ; একদিকে দুঃখমন্থর রুদ্ধবায়ু, আর একদিকে বিলাসের পসরা—সব কিছু মিলিয়ে এক বিচিত্র মিলনক্ষেত্র।

"রূপার কারুকার্যখচিত পাখার তলায় তারা এলিয়ে দিয়েছে বরতনু, বাইরের আলোবাতাসের দিকে একবার চেয়ে দেখবার আকুল আকাঙ্ক্ষা তাদের চোখে। কিন্তু সে অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের অধিকার মাত্র একটি—হিন্দুস্থানী সেতার হাতে নিয়ে একঘেয়ে তানকর্তব সাধন। ধর্ম ও দেশাচার অনুযায়ী কোনপ্রকার চাপল্য-প্রকাশ তাদের কাছে নিষিদ্ধ। এই বিশ্ব তাদের কেউ নয়, সেই ছেলেবেলা থেকে এই বিশ্ব তাদের নয়নপথ থেকে অপসৃত।"

ইওরোপীয় পরিচালিত ইংরেজি পত্রিকা ক্যালকাটা জার্নালে (২২-৯-১৮১৯) দুর্গাপূজার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মহারাজা রামচন্দ্র রায়, বাবু নীলমণি ও বোষ্টমদাস মল্লিক মহাশয়দের বাড়িতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে রীতি অনুসারে সাহেবরাও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই উপলক্ষে যে বিপুল-বিচিত্র আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছিল তা দেখে সাহেবদের চক্ষুস্থির। আরও মজার কথা, এই উৎসবে নৃত্য-গীত পরিবেশনের জন্য যে-সব গায়িকাদের আনা হয়েছিল, তাদের রূপ-লাবণ্যতো বটেই, এমন কি নৃত্য-গীতও সাহেবরা উপভোগ করেছিলেন। বুঝে বা না-বুঝে যাই হোক।

…"বিপুল অর্থব্যয় করে তাঁরা এবারের উৎসবের জন্য এই এলাকায় সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্না গায়িকাদের এনেছিলেন। যাঁরা এই আসরে নিকির যাদুকণ্ঠের কখনও করুণ-দরদী কখনও মধুর-সম্মোহিনী সুর শুনেছেন বা আশরুণের কোমল-মিষ্টি গান শুনেছেন, তাদের পুনরায় "মিষ্টি সুরের মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ" হবার লোভে এইরকম উৎসবে আবার আসার জন্য তাগিদ দেবার দরকার হবে না।

"এবারের উৎসব আরও গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে উৎসবের উদ্যোক্তারা জনসমক্ষে সর্বপ্রথম নতুন এক 'প্রাচ্যের সুধাকণ্ঠী'কে উপস্থিত করেছেন। এই মোহময়ী তরুণীর নাম নুরবক্‌স্। এই তন্বী মেয়েটিকে যারাই একবার দেখেছে তারাই তার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমরা শুনে সুখী হলাম যে, তার পেশাগত (নৃত্য-গীত) গুণও যথেষ্ট। সমঝদারেরা বললেন,—ঠিকমত রেওয়াজ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের ফলে একদিন এই তরুণীটি প্রাচ্যের সেরা গায়িকাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করবে এবং নিকি-আশরুণের পাশে সম্মানের আসন পাবে।"

ক্যালকাটা জার্নালে (২২-১০-১৮১৯) প্রকাশিত "সম্পাদকের প্রতি পত্রে" জনৈক আর্মেনিয়ান তৎকালীন জনৈকা নর্তকী সম্পর্কে যা লিখেছেন তার অনুবাদ:

"—মহাশয়,

গত শনিবার 'হরকারু' পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে দেখলাম বুনি ওরফে বন্নুজান নাম্নী জনৈকা নর্তকীর প্রচুর প্রশংসা করা হয়েছে। আপনি সত্যানুসন্ধী, কাজেই আপনার তথা জনসাধারণের অবগত্যার্থে জানাই যে ঐ নর্তকী আদৌ কাশ্মীরী নারী নয়। এই কলকাতাতেই সে জন্মেছে এবং লালিত হয়েছে। কলুটোলার ভুলু নামক এক ব্যক্তির গৃহে রতন নাম্নী জনৈকা রমণীর সে কন্যা। ভুলু এখনো সেখানে বাস করে, তার সুন্দর বাড়িটি ইউরোপীয় স্টাইলে তৈরি। মেয়েটির বাবা (আমি ভুলু ও রতনের কাছে যা শুনেছি) হল আসলে একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী। তার মা কন্যাকে নিজের কাছেই রাখে। কাজেই তখন থেকেই মেয়েটিকে কাশ্মীরী বলে চালানো হচ্ছে। গত বুধবার মেয়েটির বিয়ে হয়েছে এক মোগল ব্যবসায়ীর সঙ্গে, তাও মাত্র তিনমাসের জন্য। এই বিয়ের শর্তানুযায়ী ব্যবসায়ীটি তাকে নগদ এককালীন দু'হাজার টাকা দিয়েছে ও মাসিক দু'শো টাকা দেবে। মেয়েটির পাতানো শালা ফৈয়াজ বক্সের বাড়িতে ঐ বিবাহ উপলক্ষে খানাপিনা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয়েছিল। রীতি অনুসারে এই উপলক্ষে শহরের যাবতীয় নর্তকী উৎসবে যোগ দেয় এবং বিনামূল্যে নৃত্য-গীত পরিবেশন করে।"

বিদেশীদের চোখে দেশী আমোদ

পলাশী-যুদ্ধের পরেও বেশ কিছুদিন মুর্শিদাবাদের নবাবই ছিলেন বড় তরফ। ইংরেজদের মনের অজ্ঞাত আশঙ্কা তখনও দূর হয়নি। নবাব যিনিই হোন, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর খাতির অব্যাহত। নবাবী-আমোদের জন্য আমীরী মেজাজের, বিপুল অর্থ তথা বিপুলতর প্রতিপত্তির দরকার, যেটা ইংরেজদের তখনও নেই। পরবর্তী দশ বছর সাহেবদের নবাব হওয়ার যুগ। নানা কৌশলে অর্থ সংগ্রহ করে ধনবান হওয়াই কেবল লক্ষ্য নয়। সেই অর্থ অজস্রধারায় ব্যয় করে সাধারণের নিকট থেকে নবাবী খাতির আদায়ের চেষ্টাও ছিল। সুরাটে কুঠিস্থাপনের কাল থেকেই ইংরেজদের খানার টেবিলে কাবাব পোলাও, দো-পেয়াজী, ভাত-খিচুড়ি ও আমের চাটনি (পিটার মণ্ডি, ১৬৩৩) স্থান পেয়েছিল, এখন সেটাই অধিকতর মর্যাদার সঙ্গে সাহেবদের পাতে উঠল। বেনিয়ান প'রে হুঁকা টানার হুজুগ আগের চেয়েও বৃদ্ধি পেল। নবাবদের অনুসরণে অপ্রয়োজনেও অসংখ্য দাস-দাসী তাঁরা নিয়োগ করলেন। ওদিকে নবাব ও জমিদাররা প্রায়ই সাহেবদের আমন্ত্রণ করতেন তাদের বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদে যোগ দেওয়ার জন্য। তাঁরাও যোগ দিতেন সাগ্রহে। দুটি আমোদে সাহেবদের আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। প্রথম পশুর লড়াই, দ্বিতীয় নাচের আসর। যেখানেই তামসিক উল্লাস, সেখানেই ইংরেজ। পশুর লড়াইয়ের কথা যেসুইট পাদ্রীরা তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আকবরের আহ্বানে প্রায়ই এ দৃশ্য তাঁরা দেখতেন। পরবর্তীকালে সে দৃশ্য অনুষ্ঠিত হত বিভিন্ন নবাবের রাজধানীতে। অযোধ্যায় নবাব কর্তৃক আয়োজিত এক পশুর লড়াই দেখার জন্য কর্নেল চ্যাম্পিয়ন আমন্ত্রিত হন। তিনি লিখেছেন :

"সারা শহর ভেঙ্গে কত লোক জড়ো হয়েছে দুর্গ মধ্যে। বাঘের সঙ্গে আজ হবে মহিষের লড়াই, হাতির সঙ্গে গণ্ডারের, আর দুটি উটের মধ্যে। এক বিস্তীর্ণ বর্গক্ষেত্র বেড়া দিয়ে ঘেরা। এই হল রণক্ষেত্র। তার মধ্যে কাটা-দরজা দিয়ে ছ'টি মহিষ নিয়ে ছজন লোক হাজির। একটু পরে ছেড়ে দেওয়া হল একটি বাঘ। সম্মুখে এমন লোভনীয় খাদ্য থাকতেও বাঘ ছ'টি নধর মহিষের কোনটিকেই আক্রমণ করল না। অগত্যা একটি মহিষ চড়াও হল তার উপর। কিন্তু অনেক চেষ্টা

করেও খেলা জমল না। আবার একটি বাঘ ছেড়ে দেওয়া হল। এ বেচারী আকারে বড় হলেও খোঁড়া। একটি মহিষ তাকে শিঙের উপর তুলে সজোরে আছাড় মারা সত্ত্বেও বাঘ প্রতিরোধের কোন চেষ্টা করল না। বরং ভদ্র মনোভাব (নোবল স্পিরিট) প্রকাশ করল। তারপর সে নিজে নিহত হল।

এর পর উটের লড়াই। দু'জনে পরস্পরের পা জড়িয়ে ধরে লড়াই। তেমন আকর্ষণীয় কিছু নয়। ইতিমধ্যে, লড়াইয়ের জন্য আনীত একটি হাতি হঠাৎ ক্ষেপে গেল। মত্ত অবস্থায় তার পায়ের চাপে মারা গেল পাঁচজন। হাতিটি ছুটে গিয়ে দৃঢ়সংবদ্ধ রণক্ষেত্রের বেড়া ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। তারপর ছুটে গিয়ে পার্শ্ববর্তী এক বাগানবাড়ির ছাদ ভেঙ্গে ফেলে। মাহুতবেচারী অনেক চেষ্টা করে তাকে শান্ত করে। একটি গণ্ডার আনা হয়েছিল লড়াইয়ের জন্য। কিন্তু তাকে মোটেই নড়ানো গেল না।"

কর্নেল চ্যাম্পিয়ন দুর্ভাগা। কিন্তু মুডি সাহেব ঐ অযোধ্যার নবাবের সৌজন্যেই মানুষের সঙ্গে বাঘের লড়াই দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। শেষে মুডির মনে প্রশ্ন জেগেছিল—এই বীরের দেশে পরশাসন টিকবে তো?

মুর্শিদাবাদ নবাববাড়িতেও পশুর লড়াই হত। কিন্তু কোন বিদেশীর ডায়েরীতে তার বর্ণনা পাইনি। বাংলা দেশ বিখ্যাত ছিল ভাঁড়ের জন্য। "মস্করা" কথাটি এখন লঘু-পরিহাস অর্থে ব্যবহৃত হলেও, মূল শব্দ হল পর্তুগীজ "ম্যাসকারেড", অর্থ ছদ্মবেশ ধারণ। আঠারো শতকের শেষ দিকে মস্করার অনুষ্ঠান (ছদ্মবেশ ধারণপূর্বক কৌতুক সৃষ্টি) বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অবশ্য নাচ-গান ছিল প্রধান আকর্ষণ, আনুষঙ্গিক হিসাবে হত মস্করার ব্যবস্থা। আঠারো শতকের শেষ দিকে কলিকাতা ও অন্যান্য বড় শহরে ইংরেজদের সোসাইটি গড়ে ওঠে। ফলে সাহেবপাড়ায় দেশী নাচের কদর কমে যায়। খাঁটি ইংরেজ রমণীর কোমর জড়িয়ে নাচার সুযোগ পেলে কোন্ সাহেব আর দর্শকরূপে দেশী নাচ দেখবে! ক্যান্টনমেন্টগুলিতে দেশী নাচের জনপ্রিয়তা বহুদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। কারণ সেনা-ছাউনীতে নারী কম, কাজেই সোসাইটি নেই। ১৭৯৪ সালে কার্ডিনার ভারতে আসেন। তাঁর সময়ে ইংরেজরা দেশী নাচ তেমন পছন্দ করত না, তবে বিলেত থেকে "নতুন বন্ধু কেউ এলে বন্ধু ও বন্ধুপত্নীকে শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্যের সঙ্গে দেশী নাচ দেখানোর রেওয়াজ ছিল।"

দেশী লোকেরা যেদিন দেখল, সাহেবরা আর নাচ দেখে না, নিজেরাই স্ত্রী-পুরুষ মিলিতভাবে নাচে, তখন অবাক হয়ে গেল। হাণ্টার তাঁর জার্নালে লিখেছেন—

"গ্রামবাসীরা আমাদের নাচতে দেখে তো অবাক। তারা বলাবলি করতে লাগল যে, আমরা (সাহেবরা) পয়সা খরচ করলেই তো নর্তকী পেতে পারি। নিজেদের নাচার দরকার কি ?"

উনিশ শতকের শুরু থেকেই সাহেবপাড়ায় দেশী নাচ আর নিত্যঘটনা নয়। পয়সা ব্যয় করে তাঁরা আর বাড়িতে নাচের আসর বসান না। দেশী জমিদার বা নবাবরা যখন আমন্ত্রণ করেন কোন উৎসব উপলক্ষে, তখনই তাঁরা নাচ দেখেন। ভাল লাগে বললে মিথ্যা বলা হয়। তবু ভদ্রতার খাতিরে যেতেই হয় এবং বহু অর্থব্যয়ে সংগৃহীত বিলিতী মদের আকর্ষণ তো আছেই।

এই যে ভদ্রতা রক্ষার জন্য নাচ দেখতে যাওয়া এবং পান-পর্ব শেষ করে নর্তকীদের প্রতি অবজ্ঞার হাসি হেসে চলে আসা—এটা দেশীয় নর্তকীদের সম্ভ্রমে আঘাত করেছিল। নর্তকীদের কেউ কেউ ছিল কমেডিয়ান। হাস্য-কৌতুকে পারদর্শী। তাছাড়া পর্তুগীজদের অনেকেই ছিল কৌতুকাভিনয়ে পটু। তারা বিভিন্ন আসরে পয়সা পেলেই যোগ দিত আনন্দ বিতরণের জন্য। সাহেবীপোশাক প'রে সাহেবদের আচার-আচরণের প্রতি কটাক্ষ করায় তাদের জুড়ি ছিল না। মারিয়া গ্রাহাম কলকাতায় এক মহারাজার বাড়িতে নাচের আসরে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। প্রথম রাত্রে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দেশী নাচ ভাল লাগেনি তাঁর। দ্বিতীয় রাত্রে আর তিনি যাননি। তিনি লিখেছেন—

"শুনলাম সে রাত্রে কয়েকজন পর্তুগীজ ও দেশী অভিনেতা ইওরোপীয়ান সেজে আমাদের নাচ-গান এমন কি আমাদের আচরণ পর্যন্ত নকল করে লোক হাসিয়েছে।"

শ্রীমতী ফ্লোরা এ্যানি ষ্টীল স্বয়ং এক কৌতুকাভিনয়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন,—দুজন সাদা মুখোশ-পরা মানুষ পরস্পরের কোমর ধরে ওয়ালজ নাচের ভঙ্গীতে পা টিপে টিপে আসরে হাজির হল। একজনের অঙ্গে ইংরেজ বিচারপতির পোশাক, মাথায় কোঁকড়ানো উইগ, পরিধানে স্বচ্ছ মসলিনের পোশাক। এত স্বচ্ছ যে বুকের ও পায়ের চুল পর্যন্ত দেখা যায়। আর একজনের মাথায় কক্-হ্যাট কিন্তু পরিধানে স্টাফ ইউনিফর্ম। সাহেবদের আচার-আচরণের প্রতি কটাক্ষ করে তারা দুজনে যে অভিনয় করল সেটা সহ্য করা যায় না।

আর একজন লিখেছেন রাজী ও কল্যাণী নাম্নী দুই নর্তকীর কথা, যারা সাহেবরা আসর ছেড়ে গেলেই ইংরেজী পোশাক পরে অঙ্গভঙ্গী সহকারে ক্যারিকেচার শুরু করে দিত। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, কোন আসরে রাজী ও কল্যাণী

উপস্থিত থাকলে সাহেবরা সে আসরের ধারে-কাছেও ভিড়ত না। আসলে ইওরোপীয়দের মেয়ে-পুরুষের সম্মিলিত নাচ ভারতীয় চোখে অশোভন মনে হত। কাজেই তার প্রতি ব্যঙ্গ করে এই কৌতুকাভিনয়।

নাচ দেখার ব্যাপারে ইওরোপীয় মহিলাদের আগ্রহ ছিল পুরুষদের চেয়ে বেশী। সমালোচনা তাঁরা করেছেন অকপটে, কিন্তু পুরুষদের মত অবজ্ঞা প্রদর্শন বা ব্যঙ্গ করতে মেমদের দেখা যায় নি। মিসেস কিণ্ডার্সলি (১৭৫৪), মিসেস শেরউড (১৭৯৯), মিসেস গ্রাহাম (১৮১০), লেডী নুজেন্ট (১৮১২), মিসেস পার্লবী (১৮২৩), মিসেস ফেণ্টন (১৮২৬)—সবাই নাচের কথা অল্পাধিক লিখেছেন। পুরুষ মহলে আঠারো শতকের শেষদিকে নাচের কদর কমে যায়। নাচের জনপ্রিয়তা তখন কেবল ক্যাণ্টনমেণ্টগুলিতে সৈন্যদের কাছে। সাহেব-মহলে একদা হাফিজের কিছু রুবাইৎ, কিছু উর্দু গজল ও নর্তকীদের অন্যান্য বহু গান বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অনেকেই সেই গান অনুবাদ করেছেন। বাইজীদের গান সংগ্রহে কেরীর খ্যাতি ছিল, তিনিও অনুবাদ করেছেন। দেশী নর্তকীদের প্রতি কটাক্ষ করে কেউ কেউ কবিতাও লিখেছেন।

সাধারণতঃ সারা রাত্রিব্যাপী নাচের আসর বসত। "নতুন প্রতিভা" কেউ আবিষ্কৃত হলে সেই সুন্দরী, সুকণ্ঠী হত আলোচ্য বিষয়। ফাঁকে ফাঁকে মস্করা, কৌতুকাভিনয়। মিসেস শেরউড মুর্শিদাবাদ নবাব-বাড়িতে সেকালের কৌতুকাভিনয়ের কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। একালের বিচারে সেদিনের হাস্য-পরিহাস বড় স্থূল, বড় রসজ্ঞানহীন বলে মনে হবে, কিন্তু সেদিন তাই ছিল আমাদের ভরসা, নিস্তরঙ্গ জীবনে একমাত্র হিল্লোল। মিসেস শেরউডেরও ভাল লাগে নি। কিন্তু বঙ্গ-সংস্কৃতির পূর্বপট সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের কাছে এই বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর প্রামাণিক বর্ণনারূপে মূল্যবান। তিনি লিখেছেন :

"অতঃপর এক ডজন ভাঁড় ও বিদূষকের আগমন-নির্গমন ঘটল। তারা যে সব কায়দা প্রদর্শন করল তাতে রসের কিছু ছিল না। একটি প্রহসন হল—একটি ঘোড়ার মালিকানা সম্পর্কে ইংরেজ বিচারপতির বিচার। একজন মানুষ ঘোড়া সেজে হাঁটু মুড়ে বসে, পিছনে ঘোড়ার মতই লেজ, পিঠে জিন। দুজন দাবিদার। দুজনেই তার পিঠে চড়তে চায়। কিন্তু নকল দাবিদার ঘোড়ার পিঠে চড়লেই ঘোড়া দাঁড়িয়ে ওঠে, দাবিদার পড়ে যায় মাটিতে। এই পড়ে যাওয়াই হল রসিকতা। একজন অশ্ববেশী মানুষকে লেজ নাড়তে ও মুখে চিঁহিচিঁহি আওয়াজ ছাড়তে দেখে যদি কারও হাসি পায়, হাসতে পারে। দ্বিতীয় অনুষ্ঠানও প্রায় অনুরূপ—

প্রধান কৌতুকাভিনেতা নবাবের কাছে গিয়ে বলল—শাহানশাহ, আপনার জন্য এক অভিনব রাস্তা বানিয়েছি। আপনার প্রজাদের রাস্তার উপর শুইয়ে তৈরী হয়েছে এই পথ। হুকুম করুন, রাস্তাটি পরীক্ষা করি। নবাবের পক্ষ থেকে একজন অনুমতি দিল। লোকটি রাস্তার উপর দিয়ে বীরদর্পে কয়েকবার চলাফেরা করল। তারপর হঠাৎ দেখা গেল, শায়িতদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়েছে। তারই পিঠে পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল কৌতুকাভিনেতা। একেবারে পপাত ধরণীতলে। এই পতনটাই নাকি হাসির ব্যাপার। উপস্থিত সবাই হেসে লুটোপুটি। কিন্তু নবাব গম্ভীর। কারণ নবাব যদি অল্পেই তুষ্ট হন, তবে এদেশে সাধারণের কাছে তাঁর সমাদর কমে যায়।"

এবার আর একজন, বুকে তার একটি বর্শা আমূলবিদ্ধ। রক্তে সর্বাঙ্গ লাল। তার সেই অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করলাম। মিঃ শেরউড পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভেবেছিলেন, সত্যিই কেউ বর্শা দিয়ে তাকে আঘাত করেছে, সে এসেছে নবাবের কাছে অভিযোগ জানাতে। এই সিরিয়স ফার্সের অনুষ্ঠান অন্যান্যদের চেয়ে ভাল।

করুণ মুখে সে নবাবের সামনে এসে দাঁড়াল। তাঁর পিছনে এল একদল পুরুষ গায়ক। পূর্বের গায়িকাদের মত তাদেরও গানের বিষয়বস্তু হল নবাবের প্রশস্তি-কীর্তন—"তুমি তোমার বাপের চেয়েও মহান। যদিও তোমার তেমন অর্থ নেই। বহু বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ আজ তোমায় তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছে। কেউ ঘোড়ায় চেপে, কেউ ঘোড়ার গাড়িতে, কেউ নৌকোয়, কেউ পাল্কিতে।"

মিসেস শেরউড এর পরই চলে আসেন।

কলকাতায় থিয়েটারের আদিপর্ব

জেমস ডগ্‌লাসের মতে ভারতে প্রথম থিয়েটার স্থাপিত হয়েছিল বোম্বায়ের গ্রীনে সম্ভবত ১৭৬৬তে। কলকাতার সাহেবরা তখনও পাঁচালী ও যাত্রাগানের আসর দূর থেকে দেখে আশ মেটাচ্ছেন। নাচের পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁরা আমন্ত্রণ পেলেন অনেক পরে।

কলকাতায় থিয়েটার না হওয়ার কারণ হল কোম্পানির ডিরেক্টরদের মনোবৃত্তি। লণ্ডনস্থ ডিরেক্টরবর্গ থিয়েটারকে কোনদিনই উৎসাহ দেন নি। তাঁদের ধারণা ছিল থিয়েটারকে প্রশ্রয় দিলে কোম্পানির কর্মচারীরা বিলাসী হয়ে উঠবে। বিশেষত ভারতের মত দেশে যেখানে পয়সা হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়।

সেজন্য কলকাতায় কোম্পানির বড়বাবুদের নাকের ডগায় বসে থিয়েটার করার সাহস ছিল না কারও। লণ্ডনে খবর পৌছলে চাকরি হারাবার সম্ভাবনা ছিল। তবু প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও সাহেবেরা ১৭৭৫ সালে কলকাতায় নিয়মিত অভিনয়ের জন্য থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করলেন। থিয়েটার স্থাপনের জন্য শহরের ইওরোপীয়ানদের মধ্যে চাঁদা তোলা শুরু হল। হাজার টাকার শেয়ার একশো বিক্রি করে তৈরি হল থিয়েটার হল। এই থিয়েটার পত্তনের জন্য একলক্ষ টাকা ব্যয় করার মধ্য দিয়ে সেকালের কলকাতার সাহেবদের আর্থিক অবস্থা কত সচ্ছল ছিল বেশ বঝতে পারা

১৭৮২ পর্যন্ত কলকাতার স্টেজে পুরুষেরাই অভিনয় করত স্ত্রী ভূমিকায়। হার্টলি-হাউসের লেখিকা মন্তব্য করেছেন—'অকুণ্ঠিতচিত্তে আমি বলতে পারি, পুরুষেরা স্ত্রী ভূমিকায় এমন চমৎকার অভিনয় করেছেন যে আমার ধারণা হয়েছিল সত্যিই মহিলারা অভিনয় করছেন। ·········আমার মনে হয় নৈতিক শুচিতা রক্ষার জন্য লণ্ডনের স্টেজেও পুনরায় এই রীতি প্রবর্তন করা উচিত। এখানকার স্টেজের দৃশ্যসজ্জা, অভিনেতা-অভিনেত্রীবৃন্দের পোশাক—এককথায় চমৎকার'।

আগেই বলেছি কোম্পানির লণ্ডনস্থ ডিরেক্টরবর্গ ভারতে থিয়েটার স্থাপন বা অভিনয় করাকে কোনদিন উৎসাহ দেননি। কলকাতায় যখন পরে সত্যিই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল, তখনও কোম্পানীর মনোভাব অপরিবর্তিত। ১৭৯৩ সালে লণ্ডনের বিখ্যাত প্রযোজক লো-লুই ভারতে একটি থিয়েটার দল নিয়ে যাবার অনুমতি চাইলেন।

সেকালের নিয়মানুসারে কোম্পানির কাছ থেকে লাইসেন্স না পেলে বিলেতের কেউ ভারতের মাটিতে পা দিতে পারত না। লুইয়ের আবেদন বাতিল হল। কোম্পানি অজুহাত দেখালেন, সুন্দরী অভিনেত্রীদের চোখে দেখলে কোম্পানির জুনিয়র অফিসারদের মাথা ঘুরে যাবে।

কোম্পানির অনুমান মিথ্যা নয়। তখনকার কলকাতায় ইংরেজ সমাজে মহিলার সংখ্যাই ছিল কম। তার উপর যদি সুন্দরী অভিনেত্রীরা এদেশে আসে তবে হুল্লোর পড়ে যাবে। এর থেকে শুরু হবে নৈতিক অধঃপতন।

চৌরঙ্গী থিয়েটারের কথায় আবার ফিরে আসি। এই থিয়েটার আর্থিক দিক দিয়ে কোনদিনই তেমন সাফল্যলাভ করেনি। ১৮১০ সালে উইলিয়মসন লিখেছেন—

"প্রতিষ্ঠানটির ঋণের পরিমাণ এমনই বৃদ্ধি পেল যে শেয়ারের মূল্য হ্রাস পেতে পেতে হয়ে দাঁড়াল অর্ধেক। যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁরা সবাই ছিলেন ধনীর দুলাল। তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করবে কে? অভিনয়ের জন্য তাঁদের নিত্য-নূতন পোশাক চাই, প্রত্যেকবার রিহার্সালের আগে ও পরে চাই রাজকীয় খানাপিনা, আর চাই বন্ধুদের জন্য ফ্রি-টিকিট। এত বায়না মিটিয়ে দেখা যেত আয়ের চেয়ে ব্যয় হয়েছে বেশি। অথচ এদিকে "হাউস-ফুল" হয় না বড় একটা। সারা বছরে বড় জোর দশটি নাটক অভিনীত হত। সারা বছর বলতে অবশ্য মাত্র তিনমাস,—ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি।

এদিকে শেয়ার যাঁরা কিনেছেন তাঁরা সুদ চান। সুদ দেওয়া সম্ভব হয় না বলে তাঁদের খুশী রাখতে হয় টিকিট দিয়ে। তাঁরা চাইতেন সিলভার টিকিট,—সবচেয়ে মর্যাদাসূচক। সপরিবারে যাওয়া যেত এই টিকিটে। এই টিকিট দিতে গিয়ে আয় কমে গেল আরও। দেনার বোঝা হল বৃদ্ধি।

অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য থিয়েটার কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে একজন ম্যানেজার নিয়োগ করলেন। তাঁকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হল। এতে উন্নতি হল অবস্থার।

কলকাতার থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু অম্লমধুর স্মৃতি।

১৮৩৫ খৃস্টাব্দে কলকাতার খৃস্টান মহলে একবার খুব রক্ষণশীলতার ঢেউ আসে। নৃত্য অভিনয় ইত্যাদির সঙ্গে কোনও প্রকার যোগাযোগ রাখা তাঁরা ধর্মবিরুদ্ধ বলে মনে করতেন। একবার রেজিমেণ্টের শৌখিন ক্যামেরিয়ান্স সম্প্রদায় চৌরঙ্গী থিয়েটার ভাড়া নিয়ে অভিনয় করলেন এবং টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থ তাঁরা দিতে চাইলেন ইওরোপীয়ান অরফ্যান অ্যাসাইলামকে। অ্যাসাইলাম কমিটির সদস্যা মিস ইডেন, ফ্যানি পার্কস্ প্রমুখ কয়েকজন এই অর্থগ্রহণ করতে সম্মত হলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই কমিটির অপর কয়েকজন সদস্যা এই মর্মে এক ফতোয়া দিলেন যে, এই রকম "আনক্রিশ্চিয়ান ম্যানারে" যে অর্থ অর্জিত হয়েছে, সে অর্থ গ্রহণ করলে ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হবেন। কাজেই টিকিট বিক্রয়লব্ধ ৬৪০ টাকা অবিলম্বে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। ব্যাপারটি এখানেই থামেনি।

টাকা প্রত্যাখ্যান করায় সেনাবাহিনীর যে-সব অফিসার টিকিট কিনেছিলেন, তাঁরা চটে গেলেন। তাঁরা ভয় দেখালেন ভবিষ্যতে এই অনাথ আশ্রমকে তাঁরা কোন রকম সাহায্য করবেন না। গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড পর্যন্ত এই অবস্থায় বিব্রত বোধ করলেন।

এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরেই চৌরঙ্গী থিয়েটার পুড়ে গেল। লোকে রটিয়ে দিল ঈশ্বর রুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে মিসেস লীচ আবার সেই অর্ধদগ্ধ ভবনে থিয়েটার পত্তন করলেন। অভিনেত্রীরূপে পাদপ্রদীপের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন তিনি নিজে।

একবার জনৈকা অভিনেত্রী তাঁর মসলিনের পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে জোনাকি পোকা ভরে নিয়ে অন্ধকারে স্টেজে হাজির হয়ে নৃত্য জুড়ে দিলেন। চারিদিক অন্ধকার, মানুষ দেখা যায় না। মনে হল আকাশের বুক থেকে একদল তারা নেমে এসে স্টেজে নৃত্য শুরু করেছে।

বেকন তাঁর 'ফার্স্ট ইম্প্রেশন অব হিন্দুস্থান' গ্রন্থে একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। 'গ্যাম্বলার্স ফেট' অভিনীত হচ্ছে। নায়িকা জুলিয়া জার্মেনকে একস্থানে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে ধড়াস্ করে পড়তে হবে। পড়লেন তিনি। বেশ সশব্দেই পড়লেন। চারিদিকে হাততালি পড়ে গেল। এরকম স্বাভাবিক পতন স্টেজে দেখাই যায় না।

জুলিয়া নববধূর সাজে সজ্জিত, মাথায় তার পরচুলা। সেই পরচুলা ঘোড়ার লেজ কেটে তৈরী। পতনের সঙ্গে সঙ্গে পরচুলাও পড়ল মাথা থেকে খসে। দর্শকেরা এবার হেসে আকুল। বেচারা অভিনেতা পরচুলা পরবার জন্য মাথাটা বেশ করে কামিয়ে নিয়েছিল। সেই কামানো মাথা ফুট লাইটের আলোয় চকচক্ করে উঠল।

নায়ক আলবার্ট স্বকৌশলে পা দিয়ে পরচুলা ভূপতিত নায়িকার কাছে এগিয়ে দিল। নায়িকা শুয়ে শুয়েই সেটি যথাস্থানে লাগাবার চেষ্টা করল। তারপর মূর্ছার ঘোর কেটে যেতে আবার যখন উঠে দাঁড়াল, দেখা গেল পরচুলা তার মালিকের অঙ্গলগ্ন হয়েছে বটে, তবে মাথায় না ঝুলে সেটি ঝুলছে কাঁধ থেকে। দর্শকরা আবার হাসলেন।

কলকাতায় প্রথম থিয়েটার স্থাপিত হয় রাইটার্স বিল্ডিংসের পিছনে লায়ন্স রেঞ্জে। দ্বিতীয় থিয়েটার থিয়েটার রোড ও চৌরঙ্গী রোডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, নাম চৌরঙ্গী থিয়েটার (১৮১৩)। এর পর হল সাঁ-সৌসি (১৮৪০)। অভিনয় শুরু হয়েছিল ১৮৪১ সালে। এই থিয়েটারে বিখ্যাত অভিনেত্রী মিসেস লীচ অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান। এখানেই এখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক স্টকলার সাহেব তাঁর আমলের থিয়েটার সম্পর্কে বহু মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। দুটি ঘটনা উল্লেখ করি। হেনরী মেরিডিথ সাহেব কোর-ড্রামাটিক নামে শৌখিন দল তৈরি করেছিলেন। চৌরঙ্গী থিয়েটার ভাড়া নিয়ে সেখানেই অভিনয়-ব্যবস্থা। একবার ফ্রান্স থেকে আগত এক বিখ্যাত থিয়েটার দলের সামনে কোর-ড্রামাটিককে দলকে অভিনয় করতে হয়। এই দলের একজন অভিনেতা ছিলেন গভর্নর জেনারেলের এডিক্যাম্প। তিনি পার্ট মুখস্থ করতেন না, স্মৃতিশক্তি ছিল দুর্বল। পাট মুখস্থ করতে বললেই বলতেন, স্টেজে মেরে দেবেন।

অভিনয় শুরু হল। স্টকলার ও 'স্টেজমারা' অভিনেতাটি হাজির হলেন। দুমিনিট না যেতেই ভদ্রলোক পার্ট গেলেন ভুলে। স্টকলার নিজের ডায়ালগ বলে অপেক্ষা করছেন অপরের ডায়ালগ শুনবার জন্য। অভিনেতাটি বললেন—"আমার কথা—

আমার কথা প্রকাশ্যে বলা যায় না। লোকে যে শুনতে পাবে। চল বাইরে গোপনে তোমায় বলি।" বলে স্টকলারকে টেনে স্টেজের বাইরে নিয়ে গেলেন।

আর একবার জুলিয়াস সিজার অভিনয় হচ্ছে। সিজার কেসিউসকে বললেন—"এ্যাণ্ড প্রে স্যার, হোয়াট হ্যাভ য়ু টু সে ফর ইওরসেলফ?" কথাটি নাটকে নেই, নিজের পার্ট ভুলে যাওয়ায় সিজার স্টেজে ম্যানেজ করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কেসিউস সামলাতে পারলেন না। তিনি পাল্টা বললেন—"হোয়াট হ্যাভ য়ু টু সে ফর ইওরসেলফ?"

ফাঁকি ধরা পড়ে গেল। দর্শকেরা হাসিতে ফেটে পড়লেন।

প্রথম বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করার কৃতিত্ব একজন রাশিয়ানের। হেরাসিম লেবেদেভ দুটি ইংরাজী নাটক বাংলায় অনুবাদ করে বাঙালী নট-নটীদের সাহায্যে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ২৫ ডুমতলায় (ধর্মতলা) তিনিই নির্মাণ করেন স্টেজ। নাটক দুটির ইংরাজী নাম ছিল 'ডিসগাইস' ও 'লাভ ইজ দি বেস্ট ডক্টর।'

"এই কমেডি দুটি অনুবাদের পর সেই সংবাদ প্রচারের প্রয়োজন হল। গভর্নর জেনারেল সার জন শোরের নিকট আবেদন করলাম সে দুটি জনসমক্ষে হাজির করবার অনুমতির জন্য। মঞ্জুর হল সে আবেদন। তারপর কোম্পানির থিয়েটার ম্যানেজারের (সেনাবাহিনীর নিজস্ব থিয়েটার) কাছে কয়েকজন নট-নটী ধার দেবার জন্য অনুরোধ জানালাম। তারা সেই অনুরোধ রক্ষা করা দূরের কথা, আমার উদ্যোগ আয়োজনকে ঠাট্টা করল। নাটক মঞ্চস্থ করার আগেই মনস্থির করে ফেললাম। স্থির সিদ্ধান্ত করলাম নিজেই থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করব। ২৫ নম্বর ডোমতলার ভাড়া বাড়িতেই তিনশো দর্শকের উপযোগী করে তৈরী করব অভিনয় মঞ্চ। সেই থিয়েটারের নিজেই হব একাধারে স্থপতি পরিচালক ও ম্যানেজার"।

করেছিলেন সে কাজ প্রতিজ্ঞামত। একদিকে স্টেজ নির্মাণ, অন্যদিকে অভিনয় শিক্ষাদান। "সেই অসংখ্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শিক্ষা দিতে লাগলাম—তিনটি মেয়ে ও দশটি ছেলে।"

অভিনয় সত্যই শুরু হল একদিন। ১৭৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর প্রথম অভিনয় রজনী। তারিখটি বাংলা নাট্য-ইতিহাসে স্মরণীয়। পূর্ব-পশ্চিম সহযোগিতার এই হল তৃতীয় দৃষ্টান্ত। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলেই বাঙালী, নাটক-রচনায় ও ভারতচন্দ্রের কবিতা সঙ্গীতাকারে পরিবেশনায় প্রধান সহকারী গোলকনাথ দাস।

এর পুর্বে পুর্ব-পশ্চিম সহযোগিতার আর এক বিরল দৃষ্টান্ত উইলিয়ম কেরী-রামরাম বসু এবং উইল্‌কিন্‌স্‌-পঞ্চানন কর্মকার। অভিনয় দেখতে লোকের ভিড় হয়েছিল প্রচুর। "দর্শক সমাগম এত হল যে, আমার প্রেক্ষাগৃহ যদি তিনগুণ প্রসারিত করা হত তবুও তাতে তিলধারণের স্থান হত না। আমার এই সাফল্যের ফল দাঁড়াল এই যে, প্রতিযোগী কোম্পানি থিয়েটারের পুর্বেকার উপহাস এখন বিদ্বেষে পরিণত হল। শত্রুর হাত থেকে সাবধান থাকার মত বুদ্ধি আমার মাথায় ছিল না।"

লেবেদেভ ধনী ছিলেন না। নেহাত জিদের বশে সর্বস্ব নিয়োগ করে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অভিনয়ে সাফল্য হল, দর্শক সমাগম হল প্রচুর। কিন্তু মাত্র দুই রজনীর অভিনয়ে সেই বিপুল ব্যয়ের অর্ধেকও উশুল হল না। কাজেই তিনি পুনরায় অভিনয়ের অনুমতির জন্য আবেদন জানালেন গভর্নর জেনারেলের কাছে।

সে অনুমতি তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু জোসেফ ব্যাটল নামক এক দুষ্টগ্রহ তাঁর সঙ্গী হয় এসময়। এই ছোকরা পুর্বে কোম্পানির থিয়েটারে কাজ করত, পরে লেবেদেভকে অনুরোধ করে তাকে তাঁর দলে গ্রহণের জন্য। লেবেদেভ সরল বিশ্বাসে তাকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করেন। ছোকরা ছিল আগের থিয়েটারের সিন-পেণ্টার। দৃশ্যপট আঁকতো ও অল্পাধিক অভিনয় করত। লেবেদেভের দলে যোগ দেয় ও পরে ধীরে ধীরে চক্রান্ত করে লেবেদেভকেই কোম্পানি থেকে অপসারিত করে।

লেবেদেভের আপন কথায় তাঁর অভিজ্ঞতা—

"On the 27th day of the month of November 1795, according to the advice, the comedy called 'Disguise' was staged in one act for the first time. It was abridged because very few Europeans understood Bengali language due to difficulty. It was therefore thought that a long act will be boring, but as every scene was presented without any confusion, there was some murmur for the shortness of the matter which did not give full satisfaction, not taking into consideration the unforeseen and the inevitable. But I was much encouraged by those who knew of my herculean labours and pressed for a second presentation of the play. The assembly was so numerous that had my theatre been thrice as big in size, it would still have

remained quite filled-up. After this, the redicule of the manager of the other theatre changed into hatred and it did not enter my head to take precaution against my enemies. After a few days worthy of remembrance, one of the chief judges Mr. Jhon Hyde, who fell into eternal blissful sleep on 8th July 1796, sent me a note of hand for the second time, no less than to enquire if I had translated the whole comedy. The request contained in the note was soon complied with. With the help of Mr. John Hyde and later specially with the help of his living successor Mr. Hyde, on the 21st March 1796, the same comedy—'The Disguise' was staged in three full acts for the second time, and the play was very much appreciated by all the impertial audience.

.........in two successful presentations of the play I recovered only half of my expenses. This was again spent with a hope to recover the entire expenses. This was again spent with a hope to recover the entire expenses with profit. I made a request to the same Gevernor General for permission to present the comedy in Bengali and English languages, so that it may be more pleasing to the public and better for learning the languages.

"I did not contemplate and remember, while I was taking all these pains, that in the kingdom ruled by merchants or with the lustre of gold and even blood with silver lustre in theatrical people greedy for riches will inflame hatred, make them nervous and incite them to defame and harm me and bring about the ruin of a praiseworthy venture of a foreigner."

Herasim Lebedeff

[A Grammar of the pure and mixed East Indian Dialects— Firma K. L. Mukhopadhyay edition]

সাহেবপাড়ার বিয়ে

মেয়ের পাত্র জুটছে না? ভাবনা কি, ইণ্ডিয়ায় পাঠিয়ে দাও। গাড়ি জুটবে, বাড়ি জুটবে, সিন্দুক বোঝাই মোহর জুটবে, খেঁদি-বুঁচি কেউ পড়ে থাকে না সে দেশে। এখানে সুইপারের বেটি, আর কলকাতার মাটিতে পা দিতে না দিতে হয়ে যায় শাহজাদী।

কোম্পানির প্রথম যুগে ইংরেজ মহিলার সংখ্যা এদেশে ছিল খুব কম। যা দু-একজন ছিল তাদের নিয়ে স্বামীরা সদাশঙ্কিত। ব্যারাকে ব্যারাকে ব্যাচিলরের দল। দেশী মদ খায়, আর দেশী মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে। ইওরোপীয় মহিলা না থাকায় সোসাইটি নেই, সোসাইটি নেই বলে এটিকেটের বালাই নেই।

উনিশ শতকের শুরু থেকেই 'হোম' থেকে অবিবাহিত কন্যারা ভারতে আসতে শুরু করে একে একে। উদ্দেশ্য মাত্র একটি—স্বামী চাই এবং সেই সূত্রে দু-হাতে উড়োবার মত অঢেল পয়সা চাই। গ্র্যাণ্ডপ্রি জাতিতে ফরাসী। সেকালের ভারতস্থ ইংরেজদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

The Englishmen who are inclined to every sort of speculation, send year after year annual large cargoes of females who are tolerably handsome and are seldom six months in this country without getting husbands.

পোলিশ পর্যটক ম্যাক্সমিলিয়ান উইকলিন্স্কি এদেশে ছিলেন ১৭৬৮ থেকে ১৭৮১ পর্যন্ত। তিনিও লিখেছেন—The most beautiful girls of England and of all the parts of India continually arrived there in order to tempt fortune.

জাহাজঘাটায় জাহাজ এসে দাঁড়ালেই ভিড় জমে যেত ইংরেজ যুবকদের। হোম থেকে কি কি জিনিস এসেছে দেখতে যাওয়া ছিল উপলক্ষ্য, সজীব পণ্য কিছু এসেছে কিনা দেখাই ছিল লক্ষ্য। যদি এসে থাকে কেউ তবে দূর থেকে আলতো এক নজর দেখেই তৃষ্ণা মেটাতে হত। কাছে গিয়ে আলাপ করতে সাহস করত না।[১] অনেক-

(১) "On the summit of the ghaut we percieved several groups of young gentlemen both in civil and military guise. They were conversing and anxiously

কাল বিদেশে থাকায় এটিকেট দুরস্ত নয় কেউ। কোন্ বংশের মেয়ে, কার বাড়ি গেস্ট হবে জানা নেই সে খবর। অতএব দূর থেকে এক নজর বাঁকাচোখে চেয়েই তৃষ্ণা মেটাতে হত তখনকার মত। তারপর কাকমুখে খবর ছড়িয়ে পড়ত। কার মেয়ে, কোথায় উঠেছে, কেমন দেখতে, নাক-সিঁটকে চলে কিনা, নজর কেমন—সব খবর ফিসফিস করে আদান-প্রদান হতে থাকে। যাঁর বাড়িতে এসে মেয়েটি উঠেছে, তাঁর খানসামা-বেয়ারাদের কিছু বকশিশ কবুল করলেই সব খবর পাওয়া যায়। তারপর সম্ভাব্য পাত্ররা সেই বাড়ির আশেপাশে ছুঁক ছুঁক করে ঘুরে বেড়ায়। অকারণে অপ্রয়োজনেও গৃহস্বামীর কাছে এসে "হাউ-ডু-ডু" করে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে।

সেকালের কলকাতায় ইংরেজ সমাজে ক'নে দেখার একটি বিশিষ্ট রীতি ছিল। কলকাতা বললাম এজন্যই যে বোম্বাই বা মাদ্রাজে বড় একটা জাহাজ ভিড়ত না। বিয়ে করতে হলে আপ-কান্ট্রির সাহেবদের কলকাতায় এসে হা-পিত্যেশ করে মাসের পর মাস বসে থাকতে হত। সাহেবদের এই ক'নে দেখার রেওয়াজ ছিল হিন্দু-সমাজের ক'নে দেখার চেয়েও লজ্জাকর ব্যাপার। সমসাময়িক লেখক ও পত্রিকা-সম্পাদকরা এই রীতির নিন্দা করেছেন। ইংরেজদের শালীনতাবোধ ইণ্ডিয়ায় এতদূর অধঃপতিত হল কি করে ভেবে সবাই দিশাহারা। কোম্পানির ডিরেক্টররা এ নিয়ে বহু আলাপ আলোচনা করেছেন। তাঁদের সমালোচনা ও নিন্দাবাদের ফলে উনিশ শতকের মধ্যপাদে এই রীতি লোপ পায়। পাত্রী কলকাতায় এসে পৌছানোর পর গৃহস্বামী (হোস্ট) পরপর তিন সন্ধ্যায় সম্ভাব্য পাত্রদের ক'নে দেখার সুযোগ করে দিতেন। কন্যাকে যথারীতি সেজেগুজে বৈঠকখানায় বসে থাকতে হত। কাউকে সময় দেওয়া আছে হয়তো ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা। কারও জন্য বরাদ্দ আছে সাড়ে ছ'টা থেকে সাতটা। আবার কারও জন্য নির্ধারিত হয়েছে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা। ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকবে না, পাত্র নিভৃতে আলাপ-পরিচয় করবে পাত্রীর সঙ্গে। হয়ত প্রথম নজরেই পাত্রের পছন্দ হয়ে গেল, কিন্তু পাত্রীর মন গলল না। আবার হয়ত পাত্র দ্বিতীয় দিনেও মনস্থির করতে পারল না, কিন্তু তৃতীয় সন্ধ্যায় প্রথম দর্শনেই হৃদয় গলে একেবারে জল। আগেই বলেছি, ক'নে দেখার এই

---

watching, as it seemed to me, the movements on board our lately arrived vessel. The mystry was soon explained, for a Sirkar told me—'when Missy Beebee (young ladies) come new from Europe, then always plenty young gentlemen come to ghaut to see."

—"Memoirs of a Cadet (1838)"

রীতি ইওরোপীয় শালীনতাবিরোধী। সমসাময়িক সমালোচকরা এর সঙ্গে দোকানের জিনিস কেনাবেচার তুলনা করেছেন। নবাগত ইংরেজ কন্যাদের সম্পর্কে এশিয়াটিক জার্নালে (১৮৩৮) জনৈক লেখক মন্তব্য করেছেন—

"A batch of new arrivals are like the hams and cheeses imported by the same vessels, they will not keep to another season."

এই সমালোচকদের মতে—

An Ango-Indian marriage is quite a vini vidi vici sort of thing. A few glances rapidly interchanged commence and complete the conquest.

অথচ এদেশের কনভেণ্টে বহু ইওরোপীয় অরফ্যান গার্ল লালিত-পালিত হত। তাদের দিকে কেউ ফিরেও চাইত না। কারণ সহজবোধ্য। টাট্‌কা পেলে কে আর বাসি জিনিস নিতে চায়। বিশপ হেবার তাঁর জার্নালে এই অরফ্যান গার্লদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন—

"অথচ ইওরোপীয় অরফ্যান গার্লের অভাব নেই। তাদের বিয়ের জন্য মাঝে মাঝে জাহাজে চাপিয়ে বৃটেনে পাঠানো হয়। সেখানে অধিকাংশেরই পাত্র জোটে না। ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে আবার তারা ভারতেই ফিরে আসে।"

আঠারো শতকের শেষ দিকে ইওরোপীয় সোসাইটি কলকাতায় একটু একট করে দানা বাঁধতে থাকে। সোসাইটি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের ইওরোপীয় ঘরনীরা হোম থেকে বিবাহোপযোগী ভাইঝি বা বোনঝিদের আনাতে শুরু করতেন। প্রতিশ্রুতিবান পাত্র দেখলে তার ঘাড়ে নিজের ভাইঝি বা বোনঝিকে ঝুলিয়ে দেবার জন্য চেষ্টা করত। সোসাইটির আলাপ-আলোচনার এক চমৎকার বর্ণনা আছে ইস্ট ইণ্ডিয়া স্কেচ বুকে—

'মিসেস মার্লের ব্যাড়িতে মজলিস বসেছে। নবাগতা এই ইংরেজ পাত্রী যাকে এখন পর্যন্ত কেউ চোখেও দেখেনি, তার সম্পর্কে আলোচনায় আসর সরগরম।

—"দেখুন মিসেস মার্লে, আপনার সঙ্গে আমি একমত নই।" বললেন মিসেস ক্লিনবি —"আপনি যতটা শুনেছেন আসলে ততটা নয়। মেয়েটির গায়ের রঙের কথা যদি বলেন, তবে জেনে রাখুন, ইণ্ডিয়ার জলবায়ুতে পিঙ্ক-হোয়াইট রঙ টেকে না, ব্লু-হোয়াইট হলে কিছুদিন টিকতে পারে।"

—"ঠিক বলেছেন", মিসেস ওয়াটান্‌বী সায় দিলেন—"আর এইরকম একখানি শ্রীচরণ"—মিসেস হ্যারিস মুখ খুললেন—"সেদিন মেয়েটিকে আমি খালি পায়ে দেখেছি। যেন গোদ হয়েছে।"

ক্যাপ্টেন প্রোবি বললেন—"না না ঠিক তা নয়, আমি তাকে হোমে যখন দেখেছি, তখন তার হাত-পা দুটোই বেশ সুন্দর। ঠিক মিসেস ও'নীলের মত দেখতে।"

"—কি বললেন? ও'নীল! আপনি তাহলে মিসেস ও'নীলের চেহারাটাই ভুলে গেছেন"—মন্তব্য করলেন হোম থেকে সদ্য আগত মিসেস শ্লেটার।

—"আমি তো তাকে দেখেছি। অস্বাভাবিক লম্বা গড়ন। খুব কম হলেও পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। মেয়ে মহলের দৈত্য আর কি।"

—"তাহলে তাঁর উচিত কোন রিটায়ার্ড আর্মি ক্যাপ্টেনের পাণিগ্রহণ করে হোমে ফিরে যাওয়া"।

ক্যাপ্টেন প্রোবি পাত্রীটির অনুকূলে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাধা দিলেন মিসেস ক্লিনবি—"তোমরা পুরুষরাই তো মেয়েগুলোর মাথা খেয়ে দাও। দু'দিন যেতে না যেতে এমন করে তাদের ফ্লাটার কর যাতে হীরে-মুক্তোর গহনা ছাড়া আর কোন দিকেই তারা চেয়ে দেখে না। অথচ হোমে থাকলে······"

পাত্রীর রূপ-গুণ নিয়ে মতভেদ যতই প্রবল হোক না কেন, কলকাতার সাহেব পাড়ার বিয়ের প্রশংসা করেছেন সবাই। বিলেতের মত হাঙ্গামা নেই। বাপ-মায়ের মত নেওয়ার দরকার হয় না। বাড়ি কোথায়, কুল-পরিচয় কি, ইত্যাদি দুর্বিনীত প্রশ্নগুলি করতে হয় না। কেবল চোখে ভাল লাগলেই হল। সবচেয়ে মূল্যবান কথা হল এ বিয়েতে স্ক্যাণ্ডাল হয় কম। ডিভোর্স হয় না বললেই চলে। কোম্পানির আদি থেকে শুরু করে ১৮৩৮ পর্যন্ত ডিভোর্স ঘটেছে মাত্র তেত্রিশটি ক্ষেত্রে। তাও শুধু কলকাতায় নয়, সারা ভারতে। ইওরোপের লোক ভাবতে পারে। কিন্তু কেন? ইংরেজদের নৈতিক চরিত্র খুব উন্নত ছিল নাকি? মোটেই নয়। বরং নীতিবোধ ছিল খুব ক্ষীণ। "হার্টলি হাউসে"র গ্রন্থকার বলেছেন, কলকাতার ইংরেজদের নিজেদের মধ্যে এক অলিখিত সন্ধি ছিল। তাদের নিজেদের সমাজে সর্বজনমান্য নীতি হল—I trust you with my wife, you trust me with yours.

গ্র্যাণ্ডপ্রি বলেছেন অন্য কথা। তাঁর মতে, যে মেয়েটি আজ ভারতে এসে ধনী স্বামী পেয়েছে, গাড়ি পেয়েছে, বাড়ি পেয়েছে, সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ করেছে, নিজের দেশে সে কে? অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর অতি সাধারণ কন্যা ছাড়া তো কিছু না।

কাজেই স্বামী-সোহাগিনী হতেই হবে। কৃতজ্ঞতাবোধ হল আসল কথা। ডিভোর্স না হওয়ার কারণই হল স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কৃতজ্ঞতা। কিন্তু প্রকৃত কারণ এসব নয়। ডগলাস ডিউয়ারের অভিমতই ঠিক। এদেশের সাহেব বাড়িতে তখনকার কালে প্রাইভেসি বলে কিছু ছিল না। গরম দেশ। দরজা জানলা সব খুলে রাখতে হয়। একপাল দাস-দাসী সারাক্ষণ শত কর্মে রত। নিভৃতে প্রেমালাপের সুযোগ কোথায়?

দ্বিতীয়তঃ, ইলোপ করে পালাবার উপায় ছিল না সেদিন। রেলগাড়ি তখনও এদেশে হয়নি। ঘোড়ার গাড়ি সামান্য যা আছে তাতে চেপে শহরের চৌহদ্দির মধ্যেই চলাফেরা করা যেত, শহরের বাইরে নয়। পাল্কি ছিল বটে, কিন্তু সেকালে এখনকার মত পথের দুধারে ডাক-বাংলো ছিল না। রাত্রিবাসের কোন ব্যবস্থা নেই। তখনকার দিনে দূরে কোথাও যেতে হলে অন্ততঃ পনের দিন আগে পোস্ট মাস্টারকে চিঠি লিখে জানাতে হত। তিনি চিঠি পেয়ে তবে রান্নার সরঞ্জাম, বাবুর্চি, খানসামা, পাল্কিবাহক ইত্যাদি যোগাড় করতেন। অনেক টাকা লাগত দূরে কোথাও যেতে হলে। এতকাণ্ড করে কি পরের মেয়ে নিয়ে পালানো যায়!

কিন্‌কেয়াড অনেক চেষ্টায় সেদিনের বহু কাহিনী সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর "বৃটিশ সোস্থাল লাইফ ইন ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে কিন্‌কেয়াড আঠারো ও উনিশ-শতকীয় ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাণ্ডকারখানার বহু কাহিনী উপস্থাপন করেছেন। তাঁর নিজের পরিবার বৃটেন থেকে দু-পুরুষ আগে ভারতে আসে, ফলে পারিবারিক সুত্রেও বহু তথ্য তিনি জেনেছিলেন।

তিনিই লিখেছেন, ইঙ্গ-ভারতীয় বিয়ের ব্যাপারে মাদ্রাজ কলকাতার চেয়েও বহুদূর এগিয়ে ছিল। বিলেতের কাউন্সিলও তার জন্য সর্বদাই উদ্বিগ্ন বোধ করতেন। উদ্বেগের কারণ কেবল ইঙ্গ-ভারতীয় বিয়ের জন্যই নয়। তবু ভারতীয় কন্যার পাণিগ্রহণ সহ্য করা যায়, কিন্তু প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইংরেজ হয়ে ক্যাথলিক বিবাহ? অসহ্য। সে কারণে ইঙ্গ-ফরাসী বিয়েতেও তাদের আপত্তি। বাধ্য হয়ে বিলেতের কাউন্সিল একবার নির্দেশ দিলেন, ভবিষ্যতে খৃস্টান নাগরিকদের বিয়ের ব্যাপারে পুর্ব থেকে সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। কেবল ছেলে-ছোক্‌রার দলই যে মহিলাদের সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য চেষ্টা করত এমন নয়। বয়স্করাও এব্যাপারে বেশ পারদর্শী ছিলেন। কলকাতায় চার্চ স্থাপিত হবার আগে প্রতি রবিবার সকালে ধর্মানুষ্ঠান হত কাস্টমস্‌ অফিসে। দেখা যেত রবিবার সকালেই সবাই সেখানে উপস্থিত। হয়ত পুর্বদিন

শনিবার রাত্রে অত্যধিক খানাপিনার ফলে পেটের যন্ত্রণা, অথবা অধিক রাত্রি পর্যন্ত উদ্দাম নৃত্যের ফলে শরীর ক্লান্ত, তবু—এখনি অন্ধ বন্ধ কর না পাখা। রবিবার ভোরে শরীরের সব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে পুরুষের দল হাজির হতেন সেখানে। খুব ভোরেই আসতেন, অন্যথায় অন্য কেউ ভাল একটি স্থান দখল করে বসবে। মহিলারা আসতেন পাল্কি চেপে, ধীরগমনে। তারপর কাস্টমস্-অফিসের সামনে পাল্কি থামা মাত্র প্রতিযোগিতা পড়ে যেত, আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান। রেওয়াজ ছিল, পাল্কি এসে দাঁড়ালেই, সেখানে ঈষৎ নতজানু হয়ে ভদ্রমহিলাকে সম্মান দেখিয়ে হাত ধরে তাঁকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনা ও সযতনে হাত ধরে তাঁকে প্রার্থনা সভার কোন এক স্থানে বসিয়ে দেওয়া। মাত্র এইটুকু, এতেই সবাই কৃতার্থ। তবু তো খাঁটি ইংরেজ ললনার নরম হাতের একটু পরশ পাওয়া যাবে। এরই লোভে সবাই ভোর থেকে এসে দাঁড়াতেন। নবাগতা মহিলা কেউ এলে অনেক দুঃসাহসী সাহস করে এগিয়ে যেতেন এবং নিয়ম-মাফিক আত্মপরিচয় দিয়েই তাঁর হস্তধারণ করতেন। কিন্তু ইংরেজ রমণীরা যদিও স্বামী ধরতেই এদেশে আসতেন, তবু যে কেউ এসে তাঁকে হাত ধরে নামাবে, সেটা বেয়াদপি। দুঃসহ দুর্বিনয়। ফলে অনেকেই নবাগতা মহিলাদের হাত ধরতে গিয়ে দু-একটা চড়-চাপড় খেত। কটু মন্তব্যও শুনতে হত। কিন্তু সে-সব গায়ে মাখতো না কেউ। এখানে সবচেয়ে নিয়মিতভাবে হাজিরা দিত বুড়োরা। কেউ মার্চেণ্ট, কেউ পদস্থ কর্মচারী। সারা জীবন তাঁদের দেশী মেয়ে দেখে কেটেছে। প্রথম দিকে হয়ত ভরসা ছিল একদিন ব্যবসাতে প্রচুর পয়সা হবে, চাকরিতে হবে পদোন্নতি। তখন জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেব মেয়েদের। সবাই তখন, যত সুন্দরীই হোক, যত বনেদীই হোক, ছুটে আসবে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" বলে। কিন্তু ব্যবসায়ে অর্থের পরিমাণ যেদিন বিপুল হল, চাকরিতে ঘটল উন্নতি, তখন যৌবন শেষ হয়ে গেছে। হোমের সঙ্গে সম্বন্ধ চুকে গেছে বহুকাল। সেখানে ফিরে গিয়ে নতুন করে সমাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে সংসার পাতানো আর সম্ভব নয়। কাজেই হা-পিত্যেশ করে চার্চের (তখনকার কাস্টমস্ হাউস) সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় কি! এরা বৃদ্ধের দল। শ্রীমতী গোল্ডবর্ন বলেছেন, "দে আর টিফ্‌লী ওল্ড ফেলোজ"[২] বলুন তিনি। কিন্তু এই পদস্থ ধনবান ব্যক্তিদের শিকার করতেই বছর বছর বিলেতের বাপ-মায়ের দল ইণ্ডিয়ায় বিবাহযোগ্যা মেয়েদের পাঠাতেন।

---

(২) Hartly House—Sophia Goldburne.

টাকা পয়সা, মান-সম্মান থাকলেই হোল, চুলে পাক ধরলেই কি বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যাবে !

যেমন তখনকার চার্চের নৈতিক পরিবেশ, তেমন সেদিনের পাদ্রী। সোনায় সোহাগা। হিকি তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে মিঃ ব্লাণ্ট নামধেয় এক পাদ্রীর কথা লিখেছেন। ইনি ছিলেন সেনাবাহিনীর পাদ্রী। নামে ও কাজে তিনি সত্যিই ব্লাণ্ট।

"এই অসভ্য ছোকরা পাঁড় মাতাল হয়ে থাকত। আর সেই ঘৃণ্য অবস্থাতেই সৈনিক ও নাবিকদের সম্মুখে হাজির হত, তাদের মধ্যে ছোটাছুটি করত একেবারে দিগম্বর হয়ে। আর তার ফাঁকে ফাঁকে তার মুখ দিয়ে বের হত সব রকম অশ্লীল অশালীন বাক্য, বা নোংরা রুচি-বিগর্হিত গান। ফলে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত।"

যিনি উপাসনাকালে পুরোহিতের পবিত্র কার্যসম্পাদনের দায়িত্ব নিতেন, তাঁর নৈতিক চরিত্র যদি এই হয়, তবে তাঁর অনুগামী সমাজের নীতিবোধ কত দুর্বল ছিল সেটা সহজেই অনুমেয়।

সেদিনের সমাজব্যবস্থাই ছিল শিথিল-নিবদ্ধ। বিলেতের আইন কানুন দূরের কথা, সেদেশের নৈতিক মূল্যবোধের কোন গুরুত্ব ছিল না এদেশে। কোম্পানির লণ্ডনস্থ কোর্ট টের পেতেন সব। মাঝে মাঝে নিষেধাজ্ঞা জারি করে কড়া নোট পাঠাতেন। কিন্তু কাগজের লেখা কাগজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। যে সরিষার সাহায্যে ভূত ছাড়ানো হবে সেই সরিষার মধ্যেই ভূতের বাসা ছিল। কলিকাতার যখন পত্তন ঘটেছিল সেই তখন থেকেই এর সূত্রপাত। কলকাতার 'প্রতিষ্ঠাতা' জব-চার্নক স্বয়ং বিয়ে করেছিলেন এক হিন্দু বিধবাকে। অবশ্য তাঁর প্রেমে খাদ ছিল না। আর আঠারো শতকে সর্বাধিককাল যিনি গভর্নর-জেনারেলরূপে বৃটিশ-ভারত শাসন করে গেছেন, যার হাতে চরিত্র-নীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছুর ভার দিয়ে কোম্পানির ডিরেক্টরবর্গ লণ্ডনে বসে থাকতেন, সেই ওয়ারেন হেস্টিংসের স্ত্রী ছিলেন মিসেস ইমহফ্। জার্মান চিত্রকর ইমহফ্ সস্ত্রীক আসছিলেন জাহাজে, হেস্টিংসও ছিলেন সেই জাহাজের যাত্রী। তারপর যা ঘটল, সে করুণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বহুবার। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত শিল্পী ইমহফ্ চোখের জল সম্বল করে স্ত্রীকে সমর্পণ করে গেলেন গভর্নর জেনারেলের হাতে। হেস্টিংস পরবর্তীকালে কোনদিন স্ত্রীর প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শন করেননি, বরং স্ত্রীকে সুখী করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছেন।

সপারিষদ গভর্নর জেনারেল ছাড়া বাইরে যে টম-ডিক-হ্যারির দল পড়ে রইল, তাদের কাছে খুব উন্নত মানের নীতিবোধ নিশ্চয়ই আশা করা যায় না। ভারতের অপরিমেয় ধনৈশ্বর্যের কথা যখন সাগর পারে গিয়ে পৌছাতে লাগল, তখন সেখানকার বাপ-মায়ের দল বিবাহ-যোগ্যা কন্যাদের ভাবী-সৌভাগ্যের কথা বিবেচনা করে তাদের ভারতে পাঠাতে শুরু করবে এটাই তো স্বাভাবিক।

আঠারো শতকের শেষদিকে যে-সব ইংরেজ ললনা এদেশে এসে সোসাইটিতে বেশ একটু আলোড়ন তুলেছিলেন, তাদের মধ্যে মিস্ ক্রুটেনডেন, মিস্ এমা র‍্যাংহাম ইত্যাদির নাম অনেকেই উল্লেখ করেছেন। মিস ক্রুটেনডেন ছিলেন হিকির আমলে ডাকসাইটে সুন্দরী। হিকিরই বন্ধু বব পটকে তিনি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেন। তার আগে তিনি অন্ততঃ চারজন কভেন্যাণ্টেড অফিসারের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেছেন। বিয়ে করেছেন চারজনকেই, একের পর এক ডিভোর্স করে। বব পট তাঁর পঞ্চম স্বামী। মিস্ এমা র‍্যাংহাম ছিলেন যাকে একালে রোমাণ্টিক নায়িকা বলা হয়, তাই। তাঁর কথা হিকি উল্লেখ করেছেন—

"চমৎকার ধারালো মেয়ে। যাকে সুন্দরী বলে ঠিক তা নয়, কিন্তু দেহের গড়নে ও চাল-চলনে একেবারে অসাধারণ। অত্যধিক চতুর, অতিশয় বুদ্ধিমান। তার স্বভাবই তাকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভুলের দিকে বার বার ঠেলে দিয়েছে। মেয়েরা সাধারণতঃ যেভাবে ঘোড়ায় চাপে, সে ভাবে না বসে পুরুষের মত সদর্পে সে ঘোড়ায় চড়ত। নির্দ্বিধায় ঘোড়ার পিঠ থেকে এমন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ত ঝোপের বা খালের মধ্যে যা অতি পাকা খেলোয়াড়ের পক্ষেও সাহস করা সম্ভব নয়। ঘোড়ায় চেপে সে প্রতিযোগিতায় নামত এবং বহু ক্ষেত্রে সেরা জকিকেও হারিয়ে দিয়েছে। বন্দুক চালাতেও মেয়েটির হাত ছিল পাকা। পাখি শিকারে খুব কম ক্ষেত্রেই তার গুলি ব্যর্থ হয়েছে। মুষ্টিযুদ্ধের আধুনিক প্যাঁচের কথাও তার অজানা ছিল না। কেউ যদি কখনো সামান্যতম অসম্মানকর ব্যবহার করেছে তো তাকে বিনা দ্বিধায় ঘুষি মেরে ভূমিসাৎ করতেও সে বিলম্ব করত না। এক কথায় সে নিজ খুশিমত চলত।"

এহেন গুণ্ডা মেয়ে এমা র‍্যাংহামের সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য সারা ভারতের উচ্চ-নীচ সর্বশ্রেণীর ইংরেজ পাগল। তার কথা শোনেনি বা আলোচনা করেনি এমন কেউ তার আমলে ভারতে ছিল না। কেউ তাকে দেখেছে পেশোয়ারে, কেউ লক্ষ্ণৌতে, কেউ দিল্লীতে। এমা অন্ততঃ চারজনের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে শেষ পর্যন্ত জন ব্রিস্টোকে বিয়ে করে। ১৭৮১তে এমার জন্মদিনে রাজা নবকৃষ্ণ তাঁর বাড়িতে

নাচের আয়োজন করেন এবং উৎসবের শেষে তিনি এমাকে তার মুখচন্দ্রিমার আলোকে তাঁর গৃহ আলোকিত করার জন্য ধন্যবাদ জানান।

উইলিয়ম হিকি যেমন তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে, অগাস্টাস হিকি তাঁর গেজেটে তেমনই উৎসাহসহকারে সমাজের এই সব কেচ্ছা-কাহিনী ছেপেছেন। তখনকার অনেক কাগজের রেওয়াজ ছিল একের সঙ্গে অপরের কোন অবৈধ প্রণয় ঘটলেই পরোক্ষে তার প্রতি কটাক্ষ করা, কখনো কবিতায় কখনও বাঁকা গদ্যে। কারো নাম সরাসরি কাগজে উল্লেখ করা হত না। প্রত্যেক বিখ্যাত ব্যক্তির জন্য একটি করে ছদ্মনাম ব্যবহৃত হত। পাঠক ও উদ্দিষ্ট ব্যক্তি উভয়েই বেশ বুঝত কার প্রতি অন্তরাল থেকে এই শরক্ষেপণ।[৩] মিস এমা র‍্যাংহামকে বেঙ্গল গেজেটের বিভিন্ন সংখ্যায় "চুঁচরা-কন্যা", "পাগড়ি বিজয়ী" বা "হুকা-পাগড়ি" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কলকাতার কাউন্সিলে হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সিস ভারত থেকে চলে যাবার পর তাঁর এক বন্ধু লিভিউসকে চিঠি লিখতেন। তার একটি চিঠিতে দেখা যায়, এমা র‍্যাংহামের পাণিগ্রহণের জন্য ফ্রান্সিসের সময়ে অন্ততঃ চারজন পুরুষ ব্যস্ত ছিল। "...If you have literally married the Wrangham, or if Mackenzie should have married her, or Collings or Archdekin.........".

আর এক বহুবল্লভা হতভাগিনী বেগম জনসন। ভদ্রমহিলা খাঁটি ইংরেজ নন, গায়ের রঙ ছিল কালো, তাঁর মা হয় পর্তুগীজ বা পর্তুগীজ বংশোদ্ভবা। বাপ ঠাকুরদা উভয়েই ভারতে বিয়ে করেছিলেন। এসবের জন্যই তাঁকে মিসেস না বলে সবাই আড়ালে ঠাট্টা করে 'বেগম' বলে সম্বোধন করত। এহেন 'বেগম' ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না। কেবল ইউরোপীয়ানদের সঙ্গদান করতেন। আর তাঁর বাড়িতে সন্ধ্যায় আড্ডা না জমালে সারা দিনটাই ব্যর্থ মনে হত। কারণ পরনিন্দা-পরচর্চার এমন উপভোগ্য কেন্দ্র আর ছিল না। যেদিন কিছুই থাকত না, সেদিন গৃহস্বামিনীর গাত্রবর্ণ ও বংশ-পরিচয় নিয়ে লঘু পরিহাস করেও সময় কাটানো যেত। বেগম জনসন সত্যিই হতভাগিনী। মাত্র চার বৎসরের মধ্যে তিনি দুবার বিধবা হন, তারপর বিয়ে করেন ওয়াট্‌স্‌কে (ক্লাইভের দক্ষিণ হস্ত), চতুর্থ স্বামী ছিলেন রেভারেণ্ড উইলিয়ম জনসন। শেষোক্ত জনের নাম কেউ বেগমের ঘরে বসে তাঁর সামনে

---

(৩) **"Public Notice :—Lost on the course, last Monday evening, Buxey Clumsy's heart, whilst he stood simpering at the footstep of Hookah Turban's carriage......"**

বেগম জনসন (শেষ বয়সে)

উচ্চারণ করতেন না, কারণ রেভারেণ্ড হলেও তিনি বিনা নোটিশে ১৭৮৮তে বিপুল ধনসম্পদ সহ ইংলণ্ডে পাড়ি দেন। তার পরও দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন। পূর্ব-স্বামীদের (রেঃ জনসন ছাড়া) গৌরবময় কাহিনী রোমন্থন করে সময় কাটত তাঁর। তাঁরই নাতি লর্ড লিভারপুল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন, এবং সে সংবাদ শোনার পর আনন্দের সঙ্গেই তিনি মারা যান। তবু তো মৃত্যুকালে এই সান্ত্বনাটুকু পেয়েছিলেন।

আর একজনের কথা বলেই প্রসঙ্গ শেষ করব। তাঁর নাম মিস স্যাণ্ডার্সন। এমা র‍্যাংহামের ঠিক পূর্বে তিনিই ছিলেন সর্বজনের মানসী, হৃদয়সুন্দরী। পুরুষদের নিয়ে তিনি বোধ হয় পুতুল খেলতেন। একবার গভর্নমেণ্ট হাউসে বল্-নাচের আয়োজন হয়েছে। মিস স্যাণ্ডার্সন ঘোষণা করলেন, তিনি নিজে এক বিশেষ ধরনের পোশাকের পরিকল্পনা করেছেন। সেই বিশেষ পোশাক পরে যারা তাঁর সঙ্গে নাচতে রাজি হবে, তাদেরই একজনকে তিনি বিয়ে করবেন। তৎক্ষণাৎ ষোল জন প্রণয়ী আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এল। সবাই প্রস্তাবে রাজি। সবুজ রঙের পোশাক, তার মধ্যে পিঙ্ক রঙের সিল্কের পট্টি দেওয়া, আর স্থানে অস্থানে চুমকি বসানো। মিস স্যাণ্ডার্সন সবাইকে তাঁর সঙ্গে নাচবার সুযোগ দিলেন। কেউ নাচলেন ফরাসি কায়দায় কোটিলোঁ, কেউ রীল, কেউ গ্রাম্য-নাচ। তারপর ষোলজন প্রণয়ী দরজার বাইরে লাইন নিয়ে দাঁড়ালো। শ্রীমতী ধীরপায়ে এসে পাল্কিতে চড়লেন। ষোল জন প্রণয়ী মার্চ করে পাল্কির দুপাশে গার্ড-অব-অনার দিয়ে তাঁকে তাঁর বাড়ির দরজায় পৌঁছে দিল। "We gravely attended her home, marching by the side of her palankeen, regularly marshalled in procession of two and two". কিন্তু ষোলজনকে তো বিয়ে করা চলে না। মিস স্যাণ্ডার্সন বিয়ে করলেন একজনকে। ভাগ্যবানের নাম রিচার্ড বারওয়েল, যিনি সর্বদাই হেস্টিংসকে কাউন্সিলের সভায় সমর্থন করতেন এবং ফ্রান্সিসের আক্রমণ থেকে বাঁচাতেন।

আসল কথা তখনকার জগৎটাই ছিল ছোট। হোমের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা শক্ত দূরত্বের জন্য, আবার নেটিভদের সঙ্গেও বেশি মেলামেশা করা যায় না। আর এই গরম দেশে, জীবনটাই ছিল নলিনীদলগতজলম্। কখন যে কার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে ঠিক নেই। কাজেই জীবনের নীতিই ছিল চার্বাকপন্থা, যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ। হেসে নাও দুদিন বই তো নয়। আমোদ-প্রমোদ বলতে ছিল কেবল পরচর্চা আর পরের কেচ্ছা রোমন্থন। একটু ভালো পোশাক পড়ে রাস্তায় বের হলে আর রেহাই

নেই, অম্নি আড়ালে আলোচনা শুরু হয়ে যাবে। কারও মেয়েকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে সান্ধ্য বায়ু সেবন করলেই লোকে ধরে নেবে, ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির 'ইয়ে'.........।

বেকন তাঁর কলকাতার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন। তাঁর গৃহস্বামীর মেয়ে ম্যাটিল্ডাকে নিয়ে সন্ধ্যায় গাড়ি চেপে বেড়াতে গিয়েছেন। নিছক বেড়ানো ছাড়া আর কোন মতলব তাঁর ছিল না। পরদিনই এক ভদ্রলোক অকারণে তাকে পথের ধারে কনগ্রাচুলেশন্ জানালো তাঁর বিয়ের জন্য। বিয়ে! বেকনের বিয়ে অথচ বেকন নিজে জানেন না! অবাক হলেন তিনি। পরদিন পিওন এসে গৃহস্বামীর হাতে একখানি চিঠি দিয়ে গেল। তাতে একটি লাইন লেখা—"নবাগত যুবকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন ভাল, কিন্তু তার আগে একটু ভেবে দেখবেন।" গৃহস্বামী চটে আগুন। বেকনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কি? তোমাদের দুজনের মধ্যে সত্যিই কি বিয়ের কোন কথা হয়েছে? তোমরা একদিনে এতদূর এগিয়েছ, অথচ......"

গৃহস্বামী চিঠিখানি বেকনকে দেখালেন। বেকনও তাঁর পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করলেন, তাতে তাঁকে বিয়ের জন্য কনগ্রাচুলেশন্ জানানো হয়েছে। গৃহস্বামী দুটি চিঠি পাশাপাশি রেখে ব্যাপারটি বুঝলেন এবং বললেন—বৎস, ভবিষ্যতে কোনদিন আর আমার মেয়েকে নিয়ে গাড়িতে চেপে বের হবে না। ভারতে এটা রুচিবিগর্হিত ব্যাপার। ভবিষ্যতে যদি এমন কর তো ম্যাটিল্ডার কোনদিন বর জুটবে না।[৪]

(৪) **"Why don't you know, my dear fellow that carting a girl or riding out with her is considered in India as a regular publication of the banns, just as good as having them asked in an English Church, faith you must not do so in future or Matilda will never get a husband."**

—Bacon

বিদেশীদের চোখে দেশী বাজার

ইংরেজ ফরাসী ও ডাচরা এসেছিল বাণিজ্য করতে। পাইকারী বাণিজ্য। কোম্পানির নামে যে বাণিজ্য হত, তার বাইরেও কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত-ভাবেও বাণিজ্য করতেন। এমন কি কোম্পানি যখন দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে, তখনও সরকারী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য চলত। ক্লাইভ অজুহাত দেখিয়েছিলেন, মাইনে বড় কম, ব্যবসা চালাতে না দিলে কিসের লোভে লোকে কোম্পানির দায়িত্ব বহন করবে!

অন্ততঃ লবণ ও অন্য কয়েকটি দ্রব্যের ব্যবসাজাত লাভ কোম্পানি কর্মচারীদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিতে দেওয়া হোক। কোম্পানির লণ্ডনস্থ কর্তারা মাহিনা কম দেন একথা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু ক্লাইভের প্রস্তাব মেনে নেননি। তবু ব্যবসা তাঁরা করতেন। প্রকাশ্যেই। হিকির আমলেই এদেশের ইংরেজদের মোটামুটি তিনটি শাখায় ভাগ করে নেওয়া যেত। প্রথম, যাঁরা কোম্পানির অসামরিক কর্মচারী, দ্বিতীয়, যাঁরা সামরিক কর্মচারী এবং তৃতীয়, যাঁরা স্বাধীন ব্যবসায়ী, পরবর্তীকালে যাদের বক্সওয়ালা বলে ঠাট্টা করা হত। তবু দীর্ঘদিন যাবত বেসরকারীভাবে কোম্পানির কর্মচারীরা বাণিজ্য করে গেছেন। স্বভাবতই তাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল বেনিয়ানদের, যাদের মারফত এই বাণিজ্য চলত। বণিক শ্রেণীর বাইরে ভারতের যে বৃহত্তর জনসাধারণ আছে, তাদের কোন পরিচয় বণিকদের কোন গ্রন্থে নেই। সরকার ও বেনিয়ানদের কথা তাঁরা লিখেছেন। আর যাঁরা এসেছিলেন নিছক সফর করতে এবং যাঁদের সঙ্গে সরাসরি ব্যবসায়ের কোন সম্পর্ক ছিল না, তাঁরা কলকাতার বাজারের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রত্যেক দেশে বাজারের নিজস্ব কিছু ভাষা ও আচরণবিধি আছে। বিদেশীদের পক্ষে কলকাতার বাজারের সেই কেতা রপ্ত করা সম্ভব হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে সওদা শুরু হয় খেজুরীর ঘাট থেকেই। দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রার পর এখানেই প্রথম বর্ধিষ্ণু জনপদ নজরে পড়ে। মুখের স্বাদ বদলের বাসনাও দেখা দেয় তীব্রভাবে। আর গ্রামের ব্যবসায়ীরাও জানে কেমন করে বঁড়শি গেঁথে মাছ ডাঙায় তুলতে হয়।

খেজুরীর ঘাটে এক সাহেব তো ডিম বেচতে দেখে মহা খুশি। ডিমওয়ালার মুখে তখন ইংরেজির খৈ ফুটছে—

Very good egg master, no get, rainy season, hen no lay egg—same

as get in Calcutta, master, dry weather come, hen lay good egg—then master get.

এই বচনামৃতে মুগ্ধ হয়ে তিনি তো ডিম কিনলেন। পরে ব্যবহার করতে গিয়ে টের পেলেন ঠকেছেন। মিসেস ফে কিন্তু কলকাতার বাজারদরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এখানে সবকিছুই পাওয়া যায়। সুপ, রোস্ট ফাউল, কারি-রাইস, মাটন পাই, ফোর কোয়ার্টার ল্যাম্ব, রাইস পুডিং টার্ট, ভেরী গুড চীজ, ফ্রেস চার্নড বাটার, এবং একসেলেন্ট মাডেরা। তবে শেষোক্ত দ্রব্য, অর্থাৎ বিলিতী মদ ব্যয়সাপেক্ষ (that is expensive but eatables are very cheap)। "একটি আস্ত ভেড়া দুটাকা, বাচ্চা ভেড়া একটাকা, ৬টি হাস বা মুরগী একটাকা, বারোটি পায়রা ঐ, বারো পাউণ্ড রুটী, দু পাউণ্ড মাখন ঐ, গরুর একটি জয়েণ্ট ঐ,—দু মাস আগে ভাল মাখনের সর্বোচ্চ দাম উঠেছিল মণপ্রতি তিন বা চার টাকা, অবশ্য এখন মাত্র দেড় টাকা, ইংলিশ ক্লারেটের এখন দাম যাচ্ছে যাট টাকা ডজন।" শুধু পণ্যদ্রব্য সস্তা তাই নয়, কলকাতায় খেয়েও তৃপ্তি।

"দেশে থাকতে প্রায়ই শুনতাম বাংলাদেশের গরম খিদে নষ্ট করে, আমি একথা মানবই যে তার কোন প্রমাণ পাইনি। বরং দেখেছি এত অধিক পরিমাণ খাবার খেতে অন্য কোথাও দেখিনি।"[১]

এসব হল ১৭৮০ সালের আগস্ট মাসের কথা। এর যাট বছর পরেও কলকাতার বাজারে (দেশী দোকানে) খাঁটি ইওরোপীয় দ্রব্য পাওয়া সহজ ছিল না। "কলকাতা ও তার আশেপাশের দেশীয় উৎপাদকেরা পণ্যাদি প্রস্তুত করে বিলিতী কোম্পানির লেবেল মেরে বাজারে ছাড়ত। ইওরোপীয় দ্রব্যাদির সুনাম ছিল বলেই বাজারে নকল মাল দেখা দিত। গ্র্যাণ্ট বাজারীদের মনোবৃত্তি অনুধাবনের চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর দেখার মধ্যে একদেশদর্শিতা ছিল না। —"কলকাতার আশেপাশে অনেক নিকৃষ্ট মানের পণ্য তৈরী হয়ে আসত কলকাতার বাজারে। এখানে বিক্রি হত ইওরোপের জিনিস বলে। ইচ্ছা করে যে তাঁরা ঠকাতেন তা নয়, খরিদ্দাররা বিলিতী জিনিস শুনলে বেশি দাম কবুল করতেন সহজেই। দোকানদাররাও রেডি মার্কেটের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিত।" গ্র্যাণ্ট দেশী পণ্যের প্রশংসা করেছেন অকুণ্ঠচিত্তে।—

(১) "We were freely told in England that the heat in Bengal destroyed the appetite, I must own that I never yet saw any proof to that. On the contrary, I cannot help thinking that I never saw an equal quantity of victuals consumed."
—Mrs. Fay.

"অথচ তখনও ভারতের দেশীয় কারিগররা যে-সব জিনিস উৎপন্ন করত তার কোয়ালিটি খুব খারাপ ছিল না। শ্রীরামপুরে তৈরি হত সুগন্ধি তেল, সাবান, টুথব্রাস ইত্যাদি। মুঙ্গের থেকে আসত বন্দুক ও পিস্তল, কানপুর থেকে আসত ঘোড়ার সাজ, বালেশ্বর থেকে ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি, পাটনা থেকে ওয়াড্রোব, মুর্শিদাবাদ, বেনারস, ঢাকা, ভাগলপুর থেকে আসত সিল্ক।"

হেবার কলকাতায় আসার সময় শহর থেকে বহুদূরে গ্রামের পথে দেখেছেন হাটযাত্রীদের। পল্লীপথের অনাড়ম্বর শ্রীহীন এই দৃশ্য সামান্য দু-একটি রেখায় অঙ্কিত করেছেন—

"পথের দুধারে জনবসতি আর ফলের বাগান। রাস্তায় চলেছে গরুর গাড়ি। বলদ ও ঘোড়ার পিঠে মাল চাপিয়েও বহু লোক যাচ্ছে। রোগা কঙ্কালসার ঘোড়া ও বলদগুলি দেখলে কষ্ট হয়। খেতে না পাওয়া চেহারা, সর্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন। রাস্তার ধারে ছোট ছোট দোকানে দেশী কামারদের তৈরি লোহার কিছু জিনিস সাজানো, কিছু রঙীন সুতোও রাখা আছে। কেউ ঝুলিয়ে রেখেছে কলার ঝাড়। এক পাশে পথের উপরে সাজানো আছে পোড়া মাটির হাঁড়ি কলসি সরা ইত্যাদি।"

আঠারো শতকের শেষ দিকে পোলিশ ভ্রমণকারী উইকলিনস্কি কলকাতার অধিবাসী ও বাজার সম্পর্কে কিন্তু অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।[২] সারা ভারত তিনি সফর করেছিলেন, এবং ইওরোপের বহু দেশের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। এদেশের সঙ্গে তাঁর কোন বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক স্বার্থসম্পর্ক ছিল না। তাঁর অভিমত প্রায় নিরপেক্ষ। বাঙালীর জাতিচরিত্রে কোন ত্রুটি তাঁর চোখে পড়েনি।

(২) Bengal was the most important and richest part of Hindustan, the Ganges producing inconceivable fertility. Nature gave fruits and trees unknown to all the other parts of India. European vegetables and every kind of flower grew abundantly. People were light-yellow, nay, whitish with regular features, beautiful eyes, black and very long hair, fine and very white teeth. Their character was much milder than that of the other Indians. The manufactures of Bengal were the richest of the world; fine, smooth, muslin, embroidered with designs of golden and silver flowers as well as silk material, also embroidered, serving to reveal the greatness and magnificence of the Nawabs and the great Moghul, whose title was now nothing more than a mere name, since the English had subjugated all his states. SLUSZKIEWICZ

(The Indo-Asian Culture, I.C.C.R.)
April, 1961.

বিদেশীদের রুচি বিবর্তন

'আপরুচি খানা ও পররুচি পরনা' কথাটি আর যাদের প্রতিই প্রযুক্ত হোক সেকালের ইংরেজদের পক্ষে প্রযোজ্য ছিল না। পলাশীযুদ্ধের আগের অবস্থা কি ছিল সে আলোচনা শুরু করার আগে সেকালের একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে ভারতীয়-ইওরোপীয় সম্পর্কের বিবরণ উল্লেখ করি। রাজনারায়ণ বসু তাঁর "সেকাল আর একাল" গ্রন্থে লিখেছেন—

"তখন বিলাতে যাতায়াতের এমন সুবিধা ছিল না। যাঁহারা এখানে আসিতেন, তাঁহাদের সর্বদা বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। আর এক কারণ এই, তাঁহারা অতি অল্প লোকই এখানে থাকিতেন। সুতরাং এখানকার লোকদিগের সহিত তাঁহারা আত্মীয়তা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা অনেক পরিমাণে এদেশীয়দের আচার ব্যবহার পালন করিতেন। তখন সকাল-বিকাল কাছারী হইত। মধ্যাহ্নকালে সকলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা দ্বিপ্রহরা রজনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইত। তখনকার সাহেবরা পান খাইতেন, আলবোলা ফুঁকিতেন, বাইনাচ দিতেন ও হুলি খেলিতেন। স্টুয়ার্ট নামে একজন প্রধান সৈনিক সাহেব ছিলেন, হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য অন্যান্য সাহেবরা তাঁহাকে হিন্দু স্টুয়ার্ট বলিয়া ডাকিত। তাঁহার বাটীতে শালগ্রাম শিলা ছিল। প্রত্যহ পূজারী ব্রাহ্মণের দ্বারা তাহার পুজা করাইতেন। বাল্যকালে শুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথম কোম্পানির পুজা হইয়া তৎপরে অন্যান্য লোকের পুজা হইত। ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে তৎকালের সাহেবরা বাঙালীদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে, তাহাদের ধর্মের পর্যন্ত অনুমোদন করিতেন। একালেও গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরা সাহেব বাহাদুর আফগানিস্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় বৃন্দাবন মথুরা প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান দেবালয়ে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। সেকালের সাহেবরা আমলাদিগের উপর এমন সদয় ছিলেন যে, শুনা গিয়াছে তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিতেন। এখনকার সাহেবদের দেখিলে তাঁহাদিগকে সেই সকল সাহেবদের হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ

হয়। ইঁহাদের আর এদেশীয়দের সহিত সেরূপ ব্যথার ব্যথিত্ব নাই, তাঁহাদের প্রতি তাঁহাদিগের সেরূপ স্নেহ নাই, সেরূপ মমতা নাই।"

রাজনারায়ণ বসুর সেকাল শেষ হয়েছে ১৮১৭ সালে হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার আগেও একটা সেকাল ছিল যখন সাহেবরা ভারতীয় পোশাক পরতেন ও ভারতীয় খানা তৃপ্তি সহকারে খেতেন। পিটার মাণ্ডি (১৬৩৩ খৃঃ) সুরাটে ছিলেন। লিখেছেন, "সাধারণতঃ আমরা দোপেঁয়াজী, ভাত, খিচুড়ি ও আমের চাটনি খাই। বাইরে যখন যাই তখন মাথায় দিই পাগড়ি, সাদা লিনেনের চাদর (সূক্ষ্ম সুতী চাদর) কাঁধে, একটি কোমরবন্ধ, পায়ে জুতো, তলোয়ার ও ছোরা দুই পাশে ঝোলে।"

এরকম বর্ণনা আরও অনেকের ডায়েরীতেই আছে। সপ্তদশ শতকে দক্ষিণভারতের মাদুরায় একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রবার্টো ডি নোবিলি। মানুচ্চি তাঁর 'স্টোরিয়া ডি মোগোর' গ্রন্থে লিখেছেন, "ব্রাহ্মণদের চিত্তজয় করার জন্য ব্রাহ্মণ হয়ে যাওয়াই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। তাঁরা এতদুদ্দেশ্যে ইওরোপীয় জীবন-যাপন প্রণালী একেবারে বিসর্জন দেন। ব্রাহ্মণদের মত গৈরিক পোশাক পরে ব্রাহ্মণদের মতই নিরামিষ আহার করতেন। এমন কি রান্নার জন্য ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত করতেন। ১৭৪৪ সালে পোপ তাদের এবম্বিধ আচরণের প্রবল নিন্দা করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা এই ভাবেই চলতেন।" রোম থেকে তাঁরা এদেশে এসেছিলেন ও গৈরিক পোশাক পরতেন বলে এদেশের লোকেরা তাঁদের "রোমাপুরী ব্রাহ্মণ" বলতেন।

পলাশী-যুদ্ধের পর ইংরেজদের মনে বিজয়ীর অহঙ্কার দেখা দেয় সন্দেহ নেই। তবুও ইংরেজ শাসক-সমাজে যাঁরা উচ্চপদে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই ফার্সী সাহিত্যে অনুরাগ দেখিয়েছেন। হেস্টিংস স্বয়ং ভারতীয় পুরাণ ও বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। ফার্সী ভাষায় কবিতা লেখাতেও তিনি ছিলেন দক্ষ। সার উইলিয়ম জোন্স, উইলকিন্স ও কোলব্রুকের ভারততত্ত্ব-জিজ্ঞাসার মধ্যে, কেরীর রামায়ণ মহাভারত মুদ্রণের মধ্যে, ভারতকে গভীরভাবে জানার আগ্রহই প্রকাশ পেয়েছে। মুস্লিম নবাব, ভকিল ও হিন্দুরাজা জমিদারদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ উত্তরোত্তর ভারতের তথা ভারতবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান করে তুলেছিল। সিন্ধিয়ার ভকিল বেনিরাম পণ্ডিত ছিলেন হেস্টিংস, পামার ও চ্যাপমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চাকরি শেষ করে দেশে ফিরে যাওয়ার পর বহুদিন পর্যন্ত হেস্টিংস তাঁর এই সব ভারতীয় বন্ধুদের সম্পর্কে কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছেন। শেষ জীবনে হেস্টিংস যখন নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে

দিনাতিপাত করতেন, তখন নবাব ওয়াজির খান পামারের মারফত তাঁকে মাসো-হারার টাকা পাঠাতেন। ভারতীয় বন্ধুদের সামান্যতম সাফল্যে তাঁরা কতখানি উল্লসিত হতেন, তার প্রমাণ হেস্টিংসকে লেখা টার্নার, পামার ও চ্যাপম্যানের চিঠি।

১৭৯৯ সালে টার্নার লিখেছেন হেস্টিংসকে—'ফয়জুল্লা খান গ্রীক শিখতে শুরু করেছেন আর্মেনিয়ান পাদ্রী পার্থেনিওর কাছে।'

১৮০১ সালে তফজ্জল খান মারা গেলে পামার শোকাচ্ছন্ন চিত্তে লিখলেন তার মৃত্যুর কথা—"that excellent man Taffazal Hussain Khan and all that was wise and good among the Mussulmans."

এই তফজ্জল সম্পর্কে চ্যাপম্যান শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখেছেন 'my friend and fellow traveller'.

সেকাল ছিল অবাধ মেলামেশার কাল। শ্বেতাঙ্গ শাসকদের মনে কোন বিষ ছিল না। আন্তরিকভাবে বন্ধুর ন্যায় তাঁরা মেলামেশা করেছেন, একে অপরকে জানতে চেয়েছেন। এই অন্তরঙ্গতার পরিচয় আছে ইওরোপীয়দের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মধ্যে; ডায়েরীর গোপন পাতায়। তখনও শাসক ইংরেজ এমন গোঁ ধরেনি যে ভারতীয়দের ইংরেজীভাষা না শিখলে তাদের সঙ্গে কথাই বলা হবে না। অত ধৈর্য তাদের ছিল না। ভারতবাসীর ইংরেজী শেখা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তারা নিজেরাই ফার্সি ও হিন্দুস্থানী শিখতে শুরু করেছিলেন।

রাইটাররা এদেশে আসত মাত্র ১৫/১৬ বৎসর বয়সে। সেই কাঁচা বয়সে নতুন পরিবেশকে মানিয়ে নিতে, আপন বলে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধাই হত না। এক তাল নরম কাদাকে ভেঙ্গে দুম্‌ড়ে যে-কোন রূপ দেওয়া চলে, কাদা শক্ত হয়ে গেলে তাকে ইচ্ছামত পরিবর্তিত করা চলে না। কাঁচা বয়সের ধর্মও নরম কাদার মত। নতুন পরিবেশকে কম বয়সে সহজে গ্রহণ করা যায়।

১৭৭২ সালে কোম্পানি দেওয়ানী গ্রহণের পর জেলায় জেলায় কালেক্টরগণ ছড়িয়ে পড়ে। তারা গ্রাম্য লোকজন ও নবাব জমিদারদের সংস্পর্শে আসে। তাদের বয়স কম, শিক্ষা বেশীদূর নয়। স্বভাবতই ভারতীয়দের উপর ইওরোপীয় প্রভাব বিস্তার না করে তারা নিজেরাই ভারতীয় প্রভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

যতদিন হেস্টিংস এদেশে ছিলেন ততদিন ইংরেজদের এই ভারতপ্রেম ছিল অক্ষুণ্ণ।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, আঠারো শতক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-ভারতীয় অবাধ মেলামেশার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

ওয়েলেসলির সময় থেকেই দেখা দেয় পরিবর্তন। ভারতীয়দের ধীরে ধীরে শাসন কার্য থেকে অপসারণের কাজ এ সময় শুরু হয়। অলক্ষ্যে মাথা তুলে দাঁড়ায় অলঙ্ঘ্য প্রাচীর। ওয়েলেসলির সময়কার অবস্থা সম্পর্কে জেনারেল পামার এক পত্রে হেস্টিংসকে লিখেছেন—"দেশীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের কোন সামাজিক যোগাযোগ নেই। ম্যাজিস্ট্রেট ও জজের কাজ করেন ইওরোপিয়ানরা। তারা আইন বোঝে না, দেশীয় ভাষাতেও অজ্ঞ। অথচ তাদের জন্য কোম্পানির বিপুল অর্থব্যয় হয়। পক্ষান্তরে আদালতের যিনি হেড-মৌলবী, যাঁর তথ্য ও ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে জজ বিচার করেন, তিনি পান মাত্র মাসিক পঞ্চাশ টাকা মাহিনা।"

পামার আরও লিখেছেন—"দেশীয় রাজন্যবর্গের ভকিলদের (প্রতিনিধি) লর্ড ওয়েলেসলি কোন রকম সম্মান প্রদর্শন করেন না। তাদের বৎসরে বড় জোর দু-তিনবার সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়। ব্যাপারটি যেমন অসৌজন্যমূলক, তেমনই হীনবুদ্ধিজাত।"

আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের সূচনায় উইলিয়মসন লিখেছেন—"ভারতের কোন ধর্মের লোকের সঙ্গেই ইওরোপিয়ানদের কোন সম্পর্ক নেই।"

ফিলিপ উড্রফ তাঁর এক সাম্প্রতিক গ্রন্থে এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, হিন্দু ও মুসলমানেরা রক্ষণশীল, সেইজন্যই ইওরোপিয়ানদের পক্ষে মেলামেশা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন এই—আঠারো শতকেও তো হিন্দুরা রক্ষণশীল ছিল। তখনও তারা ইওরোপিয়ানদের সঙ্গে একত্রে খানাপিনা করত না। সে সময় তো সামাজিক মেলামেশায় কোন ছেদ পড়েনি? উনিশ শতকে হঠাৎ সামাজিকতা বন্ধ হল কেন? উইলিয়মসন উনিশ শতকের সূচনাতে লিখেছেন—এখনও হিন্দু ও মুসলমানরা নাচের আসরে বা শিকার যাত্রার সময়, বা অন্যান্য উৎসবে ইওরোপিয়ানদের আগের মতই আমন্ত্রণ করেন। আঠারো শতকে তাঁরা নাচের আসরে গিয়েছেন, পান ভোজন করেছেন। এখন উনিশ শতকে বাধা দিচ্ছে নবোদ্ভূত 'প্রেস্টিজ'।

মারিয়া গ্রাহাম কলকাতায় এসে (১৮০৯ খৃঃ) ইংরেজ পরিবারে অতিথি হয়েছিলেন। ফলে ভারতীয় কোন পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।—

"I grieve that the distance kept up between the Europeans and the natives, both here and Madras, is such that I have not been able to get acquainted with any native family."

ভিক্টর জেকমণ্ট এদেশে এসে (১৮২৮-৩১ খৃঃ) প্রায় একই কথা ইংরেজদের সম্পর্কে বলে গিয়েছেন। ভারতীয়রা তাদের গভীর শ্রদ্ধা করে। তাদের ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, শৌর্য, বীর্য প্রভৃতি ভারতীয়দের মুগ্ধ করে। সেজন্য ভারতীয়রা তাদের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতে কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু—

"The English are the only European people that do not take pleasure in these marks of respect. They esteem themselves too highly, they despise the coloured races too much to be flattered by their homage."

এই বিচ্ছেদের প্রধান দুটি কারণ হল—(ক) শাসন ব্যবস্থা ওয়েলেসলির সময় বেশ একটু কায়েমী হওয়ায় পরনির্ভরতা হ্রাস পায়, (খ) ইংরেজ মহিলাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজেদের সমাজ গড়ে ওঠায় ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে অনাগ্রহ দেখা দেয়। তারা বিজয়ীর জাত। অতএব মনে এল অহঙ্কার। নিজেদের উচ্চমন্য মনে করার শর্ত এই যে, তাতে অপরকে হীন মনে করলেই তৃপ্তি পাওয়া যায় না। তাকে ঘৃণার অযোগ্য মনে না করা পর্যন্ত স্বস্তিবোধ হয় না। যে ঘৃণা একদা জার্মানীতে ইহুদীদের সম্পর্কে ছিল বা এখনও দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণকায়দের সম্পর্কে শাসক-সম্প্রদায় মনে পোষণ করে সে ঘৃণার উদ্ভব উচ্চমন্যতা থেকেই। ক্লাইভ ও হেস্টিংস শাসনকার্যে যতদূর সম্ভব ভারতীয় নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য জেলার কালেক্টর ইওরোপীয় হলেও রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল দেওয়ানের উপর। ভারতীয়দের উপর যে আস্থা হেস্টিংসের সময় ছিল, কর্নওয়ালিসের সময় সে আস্থা সহসা বিলুপ্ত হল। তিনি ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের হানি করলেন দুটি উপায়ে। প্রথমতঃ শাসনকার্য থেকে ভারতীয়দের নির্বাসিত করে সেই স্থলে ইওরোপীয় নিয়োগ, দ্বিতীয়তঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা নূতন এক অভিজাত পদলেহী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। ভারতীয়দের সম্পর্কে কর্নওয়ালিসের অভিমত—"Every native of Hindusthan I verily believe is corrupt."

ওয়েলেসলির সময় থেকেই যদিও ইংরেজদের ভারতীয়ত্ব পরিহারের চেষ্টা দেখা দেয়, তবু কলকাতা, মাদ্রাজ বা বোম্বাই শহর থেকে দূরে রেওয়াজ বদল সঙ্গে সঙ্গেই

হুঁকাবরদার

হয়নি। ১৭৯৪ সালে দেখা যায় Twining গিয়েছিলেন Comte De Boine-র আলীগড়স্থ বাড়িতে। ইনি অবশ্য ইংরেজ নন। টুইনিং সেখানে বন্ধুর বাড়ির খানার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখি—"It was much in the Indian style ; pillows and curries, variously prepared in abundance, fish, poultry and kid." এখানেই শেষ নয়। আহারান্তে গৃহস্বামী হুঁকো হাতে নিয়ে তামাক খেয়েছিলেন অতিথির সামনে। তামাক খাওয়া অবশ্য অতিথির ভাল লাগেনি। কিন্তু রেওয়াজটা অনেকদিনের। আঠারো শতকের ষষ্ঠ দশকে হুঁকো খাওয়া সর্বজনসম্মত রীতি বলে স্বীকৃত হয়ে যায়। স্ট্যাভোরিনাস ১৭৬৯ সালে লিখেছেন—"বাংলাদেশে জনৈক ডাচ ডিরেক্টরের বাড়িতে এক ডিনারে আহূত প্রত্যেক ব্যক্তির হাতেই হুঁকো দেওয়া হয়। মহিলারাও হুঁকো খেতেন আনন্দের সঙ্গে।" Grandpre লিখেছেন—The rage of smoking extends even to the ladies and the highest compliment they can pay a man is to give him preference by smoking his hookah. In this case it is a point of politeness to take off a mouthpiece he is using and substitute a fresh one, which he persists to the lady with his hookah, who soon returns it.

(Grandpre—Voyages in the Indian Ocean and Bengal)

শ্রীমতী এলিজা ড্রেপার ইওরোপে শিক্ষিতা হলেও শৈশবে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন ভারতে ও পরে স্বামীর সঙ্গে যৌবনেও ভারতে কিছুদিন ছিলেন। ঔপন্যাসিক রেভারেণ্ড লরেন্স স্টার্নের সঙ্গে ইংলণ্ডেই তাঁর পরিচয় হয় এবং কালক্রমে স্বামীর অনুপস্থিতিতে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে। এলিজা ভারতে ছিলেন বলেই তিনি তাঁর প্রণয়ী পাদ্রীকে ব্রাহ্মণ বলে বিভিন্ন পত্রে সম্বোধন করেছেন এবং রেভারেণ্ড লরেন্স স্টার্নও প্রচ্ছন্ন কৌতুকে প্রণয়িণীকে ব্রাহ্মণী বলে সোহাগ জানিয়েছেন। পাদ্রীকে ব্রাহ্মণ বলায় তিনি অপমানিত হননি। এটা হল ১৭৬৭ সালের কথা। ভারত সম্পর্কে ইংরেজ রমণীদের যে উন্নাসিক মনোভাব তার ব্যাখ্যাও এলিজা করেছেন তাঁর বান্ধবীকে লেখা এক চিঠিতে। তাঁর মতে ভারতে ইংরেজ রমণীদের অফুরন্ত অবসর। তারা শিক্ষিত হলে অবসরকে সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারতেন। দুঃখের বিষয় অধিকাংশই অশিক্ষিত।

ভারতস্থ ইংরেজ মহিলাদের তথাকথিত মর্যাদাবোধ কোথায় নেমে এসেছিল তার প্রমাণ ওয়ালেসের 'মেময়িরস্ অব ইণ্ডিয়া' (১৮১০-১৮১৩ খঃ) গ্রন্থে আছে—

In Calcutta a civilian's lady considers herself a superior being to the wife of a military officer, the later looks down ,with contempt on the partner of a country Captain, who in her turn, despies the shop-keeper and his frets if neglected by the merchants' wife.

বিদেশীদের মুখে দেশী ভাষা

প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের প্রচম যোগসূত্র স্থাপন করে পর্তুগীজরা। শুধু ভারত নয়, প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলিতে ১৫৪০ সালের মধ্যে পর্তুগীজরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে অল্পদিনের মধ্যে কেবল তারাই যে বহু ভারতীয় শব্দ গ্রহণ করেছিল তা নয়, ঘনিষ্ঠ সংসর্গের ফলে আমরাও বহু পর্তুগীজ শব্দ গ্রহণ করেছিলাম। কালক্রমে দেখা গেল, পর্তুগীজ প্রমুখাৎ অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলিতেও বহু ভারতীয় শব্দ চালু হয়ে গেছে। ভারতের উপকূলবর্তী বন্দরগুলিতে পর্তুগীজ ভাষা এমন পরিচিতি লাভ করেছিল যে, ইংরেজ ও ডাচদের প্রথম দিকে পর্তুগীজ ভাষা শিখে নিয়ে ভারতের বন্দরে বাণিজ্যিক লেনদেন করতে হত। পর্তুগীজ মিশনারীরা বাংলাভাষা সযত্নে মাতৃভাষার মত আয়ত্ত করেছিলেন যে তাই নয়, বাংলাভাষার প্রথম তিনখানি গ্রন্থও রোমান অক্ষরে প্রকাশিত হয় লিসবনে। এই ইন্দো-পর্তুগীজ বাক্ প্রণালী আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত এদেশে বেশ সক্রিয় ছিল। আজও বহু পর্তুগীজ শব্দ আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় শব্দভাণ্ডারে অপরিহার্য রূপে সংরক্ষিত।

এর আর এক কারণ, পর্তুগীজদের সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ। ইওরোপের দেশগুলির মধ্যে পর্তুগীজরা ব্যবসায়ী হিসাবে যত সুনাম অর্জন করেছে, তার অনেক বেশী দুর্নাম অর্জন করেছে জলদস্যু বা বোম্বেটে রূপে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তারা নারী অপহরণ করত বে-পরোয়াভাবে। এদেশীয় রমণীদের তারা বিয়ে করেছে নির্দ্বিধায়। ইন্দো-পর্তুগীজ বিবাহের ফলে উদ্ভূত সন্তানদের নাম কোথাও ফিরিঙ্গি, কোথাও মেস্টিক। এছাড়াও বহু পর্তুগীজ পরিবার ভারতে পুরুষানুক্রমে বসবাস করতে করতে সকলের অজ্ঞাতে ভারতীয় রীতিনীতি গ্রহণ করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছে।

বার্নিয়ে ভারত সফরকালে (১৬৬০ খৃঃ) লিখেছিলেন—

"তিনি (সুলতান সুজা) পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের খুব খাতির করেন। তারাও সুলতানকে খুশি রাখে। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে বঙ্গদেশে আট-নয় হাজার ফরাসী অথবা পর্তুগীজ পরিবার আছে। তারা সবাই হয় দেশী অধিবাসী অথবা মেস্টিক (বর্ণ-সঙ্কর)।"

এই সপ্তদশ শতকেই ভারতে এসেছিলেন হ্যামিলটন। তিনিও লিখেছেন—

"সমুদ্র উপকূলবরাবর পর্তুগীজরা তাদের ভাষা চালু করেছে। এই ভাষা কিছু বিকৃত। কিন্তু এই ভাষাই প্রত্যেক ইওরোপীয় ভারতে ব্যবহারিক কথোপকথনের জন্য এবং সাধারণভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতবাসীর সহিত লেনদেনের সুবিধার্থ ব্যবহার করে থাকে।"

লকইয়ার বলেছেন এই কথাই—

"তারা (পর্তুগীজরা) ভারতের বন্দরগুলিতে একরকম ভাষা-মাধ্যম সৃষ্টি করেছে, যেভাষা অন্যান্য ইওরোপীয়দের প্রভূত সাহায্য করে। এভাষা বাদ দিলে অনেক স্থানেই ইওরোপীয়রা নিজেদের কথা বোঝাতে পারে না।"

ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, পরবর্তীকালের ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দভাণ্ডারের বহু ভারতীয় শব্দকে আমরা ইংরেজী শব্দ মনে করে গ্রহণ করেছি। ইংরেজরা সেই শব্দ পেয়েছে পর্তুগীজদের কাছ থেকে। এই শব্দাবলীর অনেকই আজ অচল, কিছু অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত, কিছু পরিচিত হলেও নিষ্ক্রিয়। যে সব পর্তুগীজ শব্দ ভারতস্থিত ইংরেজরা বেমালুম আত্মসাৎ করেছে তার মধ্যে গ্রাম, প্লানটেন, মাস্টার, কাস্ট পিওন, পাদ্রী, মিস্ত্রী, আলমিরা, আয়া, কোব্রা, মসকুইটো, পামফ্রেট, কামিজ, পামিরা ইত্যাদি আজও বেপরোয়া ব্যবহৃত হচ্ছে।

জাগেরনাথ (জগন্নাথ), পণ্ডিত, শাল, টিপয়, চুরুট, লুট, বারান্দা, সেপাই, কড়ি, ম্যাঙ্গো, মঙ্গুস, কারী, পারিয়া প্রভৃতি ভারতীয় শব্দকে জাতইংরেজ লেখকরাও মাতৃভাষার জ্ঞানে গ্রহণ করেছে এবং আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। আর কিছু শব্দ আছে যেগুলি ভারতের বা ভারত-ফেরত ইংরেজরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলেও ইংলণ্ডের ইংরেজরা যেন একটু সসঙ্কোচে ব্যবহার করেন। যেমন—কম্পাউণ্ড, বাটা, পাক্কা, বাবু, মাহুত, আয়া, নাচ ইত্যাদি। এছাড়া আরও কিছু ভারতীয় শব্দ আছে যেগুলি বিশেষ্য (প্রপার নাউন), ইংরেজীতে গ্রহণের সময় সেগুলির সামান্য রদ-বদল হয়েছে। যেমন—ব্যাম্বু, প্যাগোডো, মনসুন, টাইফুন, প্যালাঙ্কিন, ট্যামারিণ্ড, ইত্যাদি।

আরবদের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক সুপ্রাচীন। স্বভাবতই, ভারত যেমন আরবদের নিকট থেকে বহু শব্দ আহরণ করেছে, আরবরাও বহু ভারতীয় শব্দ সানন্দে গ্রহণ করে পশ্চিমের দেশগুলিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দ-ভাণ্ডার গড়ে ওঠার বহু পুর্বেই ইওরোপে এই সব আর্বী-ভারতীয় শব্দ পৌঁছে গিয়েছিল

এবং ভূমধ্য-সাগরীয় দেশগুলিতে ব্যবহারিক শব্দরূপে চালু হয়েছিল। যেমন বাজার, কাজী, হামাল (মুটে), ব্রিনজাল (বেগুন), মেরামত, দেওয়ান।

এমন বহু শব্দ আছে যেগুলি মূলতঃ ভারতীয় শব্দ, পরে পর্তুগীজরা গ্রহণ করে এবং তাদের মারফত গ্রহণ করে ইংরেজরা। সর্বশেষে ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা সেই সব ভারতীয় শব্দকে ইংরেজী শব্দ মনে করে গ্রহণ করেছি। কিভাবে বিভিন্ন ভারতীয় বা বিদেশী শব্দ ওষ্ঠান্তরিত হতে হতে নবকলেবরে ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দ-ভাণ্ডারে স্থানলাভ করেছে তা নিয়ে উনিশ শতকেই মূল্যবান গবেষণা করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকেরা। তাঁদের গবেষণার নমুনা কিছু উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না হয়ত।

প্যাগোডা—মূল সংস্কৃত শব্দ ভগবতী, দ্রাবিড়দের কণ্ঠে পাগোডী। কুর্গেও পাগোডী। ভগবতী>পগবতী>পগোডী>প্যাগোডা।

প্যালাঙ্কিন—মূল সংস্কৃত শব্দ পালঙ্ক, তদ্ভব পাল্কি। মালয়ালমে পেলাঙ্কি। মালয়-জাভায় পেলাঙ্কি। পর্তগীজরা বলত প্যালাঙ্কিন।

ব্যাঙ্কশাল—সংস্কৃত ভাণ্ডারশালা, কানাড়ী ভণ্ডোসাল, পর্তুগীজ ব্যাংগাকাল, ইংরেজী ব্যাঙ্কশাল।

ব্যাণ্ডেল—মূল ফার্সী শব্দ বন্দর। তা থেকে পর্তুগীজ শব্দ ব্যাণ্ডেল।

ম্যাণ্ডারীন—সংস্কৃত মন্ত্রিণ। মালয়-জাভাতেও মন্ত্রী। রাজপুরুষ অর্থে ম্যাণ্ডারিন শব্দ ব্যবহৃত হত।

ম্যাঙ্গো—মূল তামিল শব্দ মান-কে বা মান-গে, পর্তুগীজরা বলত ম্যাঙ্গু, ইংরেজী ম্যাঙ্গো।

মঙ্গুস (বেজী)—তেলেগু মাঙ্গুইস।

বিদেশীদের মধ্যে বাংলা তথা ভারতে (পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি ছাড়া) ইংরেজদের প্রভাব সমধিক। প্রথম দিকে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক শেষ দিকে ঘনিষ্ঠতর সাংস্কৃতিক আত্মীয়তায় পর্যবসিত হয়েছে। পার্থক্য এই, পর্তুগীজরা উনিশ শতকের আগেই (গোয়া ব্যতীত) নিঃশেষে মিশে গিয়ে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল। খাস কলকাতায় এখনো কিছু গঞ্জালেস, ডিসুজা, পেট্রুস, ডিক্রুস, গোমেশ, রোজারিওদের দর্শন মেলে। নাম ও ধর্ম ছাড়া অবশ্য পর্তুগীজদের সঙ্গে এদের দূরতম সম্পর্কও নেই। পর্তুগীজভাষা প্রায় কেউই বোঝে না। পুরুষানুক্রমে বসবাসের ফলে কলকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের মধ্যেও ভাষার পরিবর্তন ঘটেছিল বিপুল। স্মরণীয় যে, আত্মস্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার আগ্রহে এই ইংরেজ-নন্দনেরা দেশী উচ্চকোটি সম্প্রদায়ের

সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনে তেমন উৎসাহ প্রথম দিকে দেখাননি। বাড়ির আয়া, বেহারা, খিদমতগার, খানসামা জাতীয় ভৃত্যকুলের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছিল অধিক। এই অনভিজাত নফরকুলের ভাষাকেই স্ট্যাণ্ডার্ড ভারতীয় ভাষা মনে করে অনেকে শিখেছিলেন। এই গৃহভৃত্যদের শতকরা পাঁচজনও বাংলাদেশের অকৃত্রিম অধিবাসী নয়। রক্তের আভিজাত্যে তারা কেউ খানদানী নয়। উর্দু, ফার্সী, হিন্দী ও বিভিন্ন দক্ষিণী ভাষার এক বিচিত্র সাড়ে বত্রিশভাজাকে তারা মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করত এবং এই ভাষা আয়ত্ত করে সাহেব মেমের দল কাজ চালাতেন। (আজও এই বিচিত্র ভাষাই সাহেবপাড়ায় দেশী ভাষারূপে অক্ষুন্ন বেগে প্রচলিত) ফলে বহু অশ্লীল, অরুচিকর, ইতর শব্দও ইংরেজরা পবিত্র শব্দজ্ঞানে গ্রহণ করেছিল।

প্রত্যেক কসমোপলিটান শহরে বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু বর্ণের আনাগোনার ফলে এক মিশ্রভাষার সৃষ্টি হয়। কলকাতায় ইংরেজদের প্রাধান্য থাকলেও ব্যবসায়িক বা অন্যান্য প্রয়োজনে অন্যান্য দেশের অধিবাসীরাও অল্পাধিক এসেছে। ডাচ্, পর্তুগীজ ও ফরাসীদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ঘাঁটিও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল। ফলে এক সঙ্করভাষা এখানে অপরিহার্যরূপে গড়ে উঠেছিল। এই ভাষার নাম এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইংরেজী। কোম্পানীর নবাগত কর্মচারীদের সুবিধার জন্য ডাঃ গিলক্রাইস্ট যে "স্ট্রেঞ্জার্স ইস্ট ইণ্ডিয়া গাইড" লেখেন তাতে বহু ইতর শব্দ ভদ্র শব্দরূপে স্থান পেয়েছে। হাডলি বা ফার্গুসনও তাঁদের অভিধানে বহু অশোভন শব্দ ব্যবহারিক শব্দরূপে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কলকাতার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইংরেজীর এই জগা-খিচুড়ীয়ানা দূর করার জন্য সমালোচনা ও চেষ্টা কম হয়নি। একটি খাঁটি হিন্দুস্থানী অভিধান প্রস্তুত করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "ক্যালকাটা জার্নালে" জনৈক ইংরেজ (যিনি বহুকাল চাঁদনীচকে বসবাস করে খাঁটি হিন্দুস্থানী আয়ত্ত করেছেন) এক দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন—

"Will any man deny that the language, or rather lingo, now current in Calcutta, among the Sircars Sablogs is anything but mere cant and gibberish, composed of Arabic, Persian, English, Italian, Spanish as well as all the dialects of Dukhin, corrupted, curtailed and amalgamated with the pure Hinduee, in such a manner as to bid defiance to all grace and grammar. This is a serious truth." (1819)

এই ভাষা-সঙ্করকে পত্রলেখক "জিপসী জার্গন" নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই বিকৃতির জন্য কারও প্রতি দোষারোপ করেননি। স্বীকার করেছেন, উভয়পক্ষের অনুধাবনের সুবিধার্থেই এমন ভাষার উদ্ভব হয়ে থাকে। অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"কলকাতায় যে হিন্দুস্তানী প্রচলিত তার অর্ধাংশ, কখনও বা দুই-তৃতীয়াংশ ইংরেজী। সেও বিশুদ্ধ ইংরেজী নয়, ইংরেজীর অপভ্রংশ। বিকৃতি। হয়ত এই অপভ্রংশের ব্যাপারে আমরাই (ইংরেজরা) স্বকৃতভঙ্গ। নেটিভরা যাতে সহজে বুঝতে পারে তজ্জন্য আমরা, অথবা আমরা যাতে বুঝতে পারি তজ্জন্য নেটিভরা শব্দের রূপান্তর ঘটায়। উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যাক। যদি কোন ক্যালকাটা নেটিভকে ব্রিচেস, বিফষ্টিক, বক্স ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতে হয়, তবে সে শব্দগুলি উচ্চারণ করবে বিরগিস, বিফিষ্টিকি, বাকাস। আমরাও কম যাইনি। আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য পরিচিত ইংরেজী শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বয়কে বলি বোয়, বেনিয়াকে বলি বানিয়ান, ডালিকে বলি ডলী। অবশ্য এই উচ্চারণঘটিত ত্রুটির জন্য দোষ দিইনে। কারণ হিন্দুরা ব্রিচেস পরে না, বিফষ্টিক খায় না। অতএব অনুরূপ শব্দ তাদের নেই। আমরা নেটিভ শব্দের যে বিকৃতি ঘটিয়েছি, তাও অনুরূপ কারণে। বকসিস্ বলতে গিয়ে বলি বক্সেস, হাগনাহাগ বোঝাতে বলি হকনক, খলিফা বলতে বলি কালি-পাও—অর্থাৎ পরিচিত কোন ইংরেজী শব্দের অনুরূপ উচ্চারণ করি।"

কলকাতার সাহেব সমাজে কি রকম ডায়ালগ চালু ছিল তারও কিছু নমুনা পত্রলেখক উদ্ধৃত করেছেন এবং পরবর্তীকালেও সেই বিচিত্র ইংরেজী-হিন্দী-উর্দু'র শব্দ-সম্ভারে জারিত ভাষা চালু আছে। উদাহরণ—

(1) Pray be silent.

(2) Khidmutgar, bring the boxes of wafer from the desk.

(3) You gardiner, bring me some vegetable.

(4) Order a bottle of champagne.

(5) My friend, I fear you exaggerate.

(6) The mango fish is not fresh, do you hear ?

(1) Chup, you soor.

(2) Kis-my-gar, bakas ke weper dekus se low.

(3) You Molly, dolly low.

(4) Hookum kuro, ek bowttul Simpkeen.

(5) Joot, you d—d soor.

(6) Mungo pish bo kurta, you soono.

বিদেশীদের ভারতীয় ভাষা অনুশীলনের ইতিহাসে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস ও ফোর্ট উইলিয়মের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লিসবনে প্রকাশিত, রোমান হরফে মুদ্রিত তিনখানি বাংলা গ্রন্থ বাদ দিলে, বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ।' ১৭৭৮ সালে হুগলীর মিঃ এনড্রুজের প্রেসে মুদ্রিত। গ্রন্থকার ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য টাইটেল পেজে সংস্কৃত ভাষায় দেওয়া আছে।

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদঙ্গে্রজী

তিনি সবনিয়ে আরও বলেছেন—

ইন্দ্রদয়োপি যস্যান্তং নযযুঃ শব্দ বারিধেঃ।

প্রক্রিয়াস্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নবঃ কথম্॥

হ্যালহেডের সঙ্গে একযোগে স্মরণীয় চার্লস উইলকিনসের নাম। সরকারী গ্রন্থশালার অধ্যক্ষ ভারততত্ত্ববিদ উইলকিনস্ পঞ্চানন কর্মকারের সাহায্যে কাঠ-খোদাই বাংলা অক্ষর প্রস্তুত করেন। তারই সাহায্যে মুদ্রিত হয় হ্যালহেডের ব্যাকরণ। যে অসাধারণ ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা সহযোগে উইলকিনস্ বাংলা টাইপ প্রস্তুত করেছিলেন, তজ্জন্য বঙ্গবাসীমাত্রই চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। ভবিষ্যৎ বঙ্গভাষার দুকূলপ্রসারী বিস্তার, তার ক্রমবর্ধমান রূপৈশ্বর্য, বিশ্বের দরবারে একটি স্থায়ী গৌরবের আসন অর্জনের ভগীরথ এই উইলকিনস্। উইলকিনসের প্রস্তুত বাংলা টাইপের সাহায্যে পরে কোম্পানির প্রেস থেকে কয়েকটি আইনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। জোনাথান ডানকান ১৭৭৫তে অনুবাদ করেন ইম্পে কোড, ফরস্টার অনুবাদ করেন কর্নওয়ালিস কোড। এছাড়া আরও দুটি আইনের অনুবাদ ১৭৯১ ও ১৭৯২ সালে মুদ্রিত হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এ-দুটি রক্ষিত আছে।

হ্যালহেডের ব্যাকরণের পর উল্লেখযোগ্য আপজনের "এ্যান এক্স্টেনসিভ ভোকাবুলরী, বেঙ্গলী এণ্ড ইংলিস" (১৭৯৩)।

তারপর ফরস্টারের "এ ভোকাবুলরী ইন টু পার্টস, ইংলিশ এণ্ড বেঙ্গলী, এণ্ড

ভাইসভার্সা।” এই অভিধানের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হয় ১৭৯৯ ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০২ সালে। কলকাতার ক্রনিকল প্রেসে দুটিই ছাপা হয়। ফরস্টারের ভোকাবুলরী যে বৎসর প্রকাশিত হয় ঐ বৎসরই শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাঃ উইলিয়ম কেরী অবশ্য মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই মদনাবাটীতে (উত্তরবঙ্গ) একটি প্রেস বসিয়েছিলেন। এখন সহকর্মী জোসুয়া মার্সম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের সাহায্যে সে প্রেসটি মদনাবাটী থেকে শ্রীরামপুরে নিয়ে আসেন। শ্রীরামপুরের ডেনিশ গভর্নর কর্নেল বাই মিশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮০১-১৮৩২ সালের মধ্যে চল্লিশটি ভাষায় মোট বারো হাজার দুশো খণ্ড মুদ্রিত হয়। এই চল্লিশটি ভাষার প্রত্যেকটির টাইপ তাঁদের নিজেদের তৈরী করে নিতে হয়েছে। প্রথম দিকে খৃস্টধর্ম প্রচার যদিও তাঁদের লক্ষ্য ছিল এবং “নিউ-টেস্টামেণ্টর” বঙ্গানুবাদ দিয়েই যদিও এই মুদ্রণ পর্বের সূত্রপাত হয়েছিল, পরে মৌলিক গ্রন্থও তাঁরা রচনা করেছেন ও বাংলা ভাষায় ছাপিয়েছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত বা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রথম মুদ্রিত হয়েছে বিদেশী মিশনারীদের পরিচালিত শ্রীরামপুর প্রেস থেকেই।

ইংরেজী সাহিত্যে বাংলার প্রভাব'

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৫ বৎসর কেটে গেল। এতদিনের মন দেয়া-নেয়ার পর স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে ভারত ও পশ্চিমের মধ্যে পারস্পরিক ঋণ কতখানি। আমরা কতখানি গ্রহণ করেছি, তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি, ভালই জানি। তরু দত্ত বা সরোজিনীর বিদেশী ভাষাশ্রিত কবিতার সাফল্যে আহ্লাদে আটখানা হয়েছি, অক্সফোর্ডে ভারতীয় অধ্যাপককে অধ্যাপনা করতে দেখে বা সিভিল সার্বিসে ভারতীয়কে প্রথম স্থান অধিকার করতে দেখে নিজেদের দ্বিজোত্তম সাহেব ভেবে বিদেশী পুচ্ছ উচ্চে তুলে নেচেছি। কিন্তু অপর সরিক কতখানি গ্রহণ করেছে তার হিসাব নেওয়া হয়নি। একটি বৃহৎ গবেষণার ক্ষেত্র এখনও অকর্ষিত রয়ে গেছে। স্মরণ রাখা দরকার, অপর সরিক কেবল ইংরেজ নয়, ফরাসী, জার্মানী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও রাশিয়ানদের সঙ্গেও আদানপ্রদান বড় কম হয়নি। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়ছে, বেড়েই চলবে।

ভারতীয় সাহিত্যে, অন্তত বঙ্গ সাহিত্যে ইংরেজ প্রভাব নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে, কিন্তু ইংরেজী ফরাসী বা জার্মান সাহিত্যে ভারতের প্রভাব কতখানি তার পরিমাপ করার কোন চেষ্টা হয় নি।

বোধ হয় আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশকেই এ্যারেবিয়ান নাইটসের একটি ফরাসী সংস্করণ (Antoine Galland) ইংলণ্ডে এসে পৌঁছায়। বই নয়, সোনার কাঠি। ইংলণ্ডের মনোজগতে সৃষ্টি করল অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য। প্রাচ্যের ধনদৌলত বিলাস-ব্যসন সম্পর্কিত চমকপ্রদ বর্ণনা সাধারণের হাতে এসে পৌঁছাল সেই সর্বপ্রথম। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যের ঐশ্বর্য ও জীবনযাপন প্রণালী হয়ে উঠল আলোচ্য বিষয়। প্রাচ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন পরিচয় নেই, কাজেই রঙ্গীন কল্পনায় ডানা মেলে লেখককুল উড়তে শুরু করলেন। স্যামুয়েল জনসনের 'রাসেলাস', জেমস বেকফোর্ডের 'হিস্টরী অব দি ক্যালিফ বাটেক', আইজ্যাক ডিসরেইলীর 'মেজনুন্ এণ্ড লয়লা', জর্জ মিরিডিথের 'দি শেভিং অব শাগপাট' রচিত হল সেই উচ্ছ্বাসে। থামল না, আঠারো শতকের ইংলণ্ডের সাহিত্যে প্রাচ্য কল্পনাবিলাস এক হুজুগে দাঁড়ালো। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক-লেশহীন। ১৭৬০ সালে গোল্ডস্মিথ তাঁর 'সিটিজেন অব দি ওয়ার্ল্ডে'র' ৩৩তম চিঠিতে

কটাক্ষ করলেন সেই হুজুগের প্রতি। লিখলেন—"The fictions every day propagated here under the title of Eastern tales and Oriental histories।" অবশ্য তাঁর সমালোচনার পরেও কল্পনাবিলাস থামেনি। টমাস মুরের 'লালারুখ', 'কার্স অব কেহামার' মত উদ্ভট কল্পনাবৈদগ্ধও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাচ্যের বাস্তবজীবনকে পটভূমি করে গ্রন্থরচনার চেষ্টা হয় ১৮১৯ থেকে ১৮৩৯ সালের মধ্যে। এই সময়ে যাঁরা প্রাচ্যকে উপজীব্য করে লেখনী ধারণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সিরিয়া, পারস্য ও ভারতে এসেছেন, বাস করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন। টমাস হোপের 'এ্যানাসটাসিয়াস', জেমস জাষ্টিনিয়ান মোরিয়ের 'হাজিবাবা অব ইস্পাহান' যথাক্রমে তুরস্ক ও পারস্যের জীবন এবং উইলিয়ম ব্রাউনি হকলের 'পাণ্ডুরং হরি' গ্রন্থে ভারতীয় ব্রাহ্মণচরিত্রাঙ্কণের প্রয়াস লক্ষণীয়। ওদিকে আফগান সীমান্তের জনজীবনকে উপজীব্য করে 'কাজিলবাস' এবং মেডো টেলরের "কনফেসন অব এ ঠগ" গ্রন্থে ভারতীয় বিষয়বস্তু অবলম্বিত হয়েছে। ফিল্ডিং ও স্মোলেট্ যেমন কোন একজন দুঃসাহসী নায়ককে তার নিজের দেশের নানাস্থানে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, পুর্বোক্ত গ্রন্থকর্তারাও সেই পথ অবলম্বন করেছেন। পারস্য ও ভারতের সঙ্গে গ্রন্থকারদের কিঞ্চিৎ সম্পর্ক ছিল, কারণ ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের বিরোধ ব্যাপ্ত হয়েছিল এই অঞ্চলের উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন নিয়ে। বহু ফরাসী ও ইংরেজ কর্মচারীকে সে-সময় এসব দেশে থাকতে ও ঘনিষ্ঠভাবে জানতে হয়েছিল কূটনৈতিক প্রয়োজনে। ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর এশিয়া মাইনর পেরিয়ে আরও পুবে যাওয়ার প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এতদিন কেবল হারুন-অল-রশিদের পারস্যকে নিয়েই উদ্ভট কল্পনাবিলাস চলত। ওয়াটারলুর পরে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে পশ্চিমের দূত এসে উঁকি দিল। চোখে দুর্নিবার কৌতূহল, হাতে মায়াবনবিহারিণী লেখনি, বক্ষপটে অসমসাহসিকতা। সামান্য কয়েক বৎসরে উৎপন্ন হয়েছিল অনেক উপন্যাস। কিন্তু কেউ তাদের স্মরণ করে না আজ। মরিয়েরের রচনা কেউ কেউ চকিতে উল্লেখ করেই জিভ কাটেন। কবিদের মধ্যে সার এডুইন আর্নল্ড এখনো কারো কারো স্মৃতিপটে চাঞ্চল্য জাগায়। তবু গদ্যের চেয়ে কাব্যক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন হয়েছিল বেশী এবং সেটা সারবান। ইংলণ্ডের সেই হাওয়া এসে লাগে ভারতের ইংরেজ শাসক-বণিক সম্প্রদায়ের মনে। ক্লাইভ বা হেষ্টিংসের সময়কার অশান্ত অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিবেশ অনুকূল ছিল না সাহিত্য-সৃজনকর্মের। আঠারো শতকের শেষে রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোটামুটি

শান্তভাব ধারণ করে। নীলনদের যুদ্ধে নেপোলিয়ন-বাহিনী নেলসনের কাছে পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যে ফরাসী আধিপত্যের সম্ভাবনা লুপ্ত হয়। সেদিনের বিজয়চেতনা ভারতস্থ ইংরেজ লেখককুলকে উদ্বুদ্ধ করে নবতর সৃষ্টিতে। সেদিনের রচনায় কোথাও লঘু-চাপল্যের স্থান ছিল না এজন্যই। তদুপরি সার উইলিয়ম জোন্স প্রাচ্য সাহিত্য ও ইতিহাসের অমূল্য রত্নরাজি উদ্ধার করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর দেশবাসীর। মোগল সম্রাটদের অমিত ঐশ্বর্য সম্পর্কে কিছু ধারণা পূর্বেই ছিল, জ্যোন্সের কল্যাণে প্রাক-মোগল যুগের রত্নসম্ভারের দিকেও এবার সশ্রদ্ধ সচকিত দৃষ্টিপাত ঘটল। অবশ্য স্বয়ং হেস্টিংস এ ব্যাপারে পূর্বেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। উনিশ শতকের সূচনায় দেখা যায় ইংলণ্ডের রোমান্টিক-সাহিত্যসৃষ্টির প্রভাব পড়েছে ভারতস্থ ইংরেজ কবিকুলের উপর। রেজিনাল্ড হেবার, জন লিডেন প্রভৃতি সেই রোমান্টিকতার পূর্বসূরী। হেবারের উপর কাউপারের শান্ত-মধুর প্রভাব যেমন লক্ষণীয়, লিডেনের উপর দেখা যায় স্কটিশ কবিজনোচিত বলিষ্ঠ দীপ্তি, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। কলকাতার নির্জন সন্ধ্যা, ঝিঁঝির ডাক, পেঁচকের কর্কশ চিৎকার, চৌকিদারের নিশি ঘোষণা—সবকিছু হেবারের কাব্যে আত্মীয়-পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। ('বিদেশীদের চোখে গঙ্গা' দ্রষ্টব্য)।

ভারতের প্রতি ইংরেজদের অত্যুৎসাহী দৃষ্টিপাত প্রথম ঘটে পলাশী যুদ্ধের কিছু দিন পরেই, সিরাজের পরিত্যক্ত রাজকোষের অর্থ ও দুর্নীতিদুষ্ট ব্যবসায়ের রন্ধ্রপথে কয়েকজন ইংরেজ অফিসার সামান্য অবস্থা থেকে রাতারাতি নবাবে পরিণত হন। ও দেশে বলত নাবুব বা নাবব। এইসব হঠাৎ-নবাবদের বিকৃত রুচি ও ধরাকে সরাজ্ঞান করার চেষ্টা বিশ্বের সবদেশের মত ইংলণ্ডেও ঘটল। হঠাৎ নবাবদের চালচলন ও বাহ্বাস্ফোটভাব বিলেতের কমেডিয়ান ও নাট্যকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

১৭৭২ সালে স্যামুয়েল ফুট লিখলেন নাটক—দি নাবব। ফুট তাঁর স্মৃতিকথায় সমসাময়িক ভারতপ্রত্যাগত ইংরেজদের আচরণ ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাদের প্রভাব সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন।

"এই সময়ে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বহু কর্মচারীর বিরুদ্ধে জনমনে বিক্ষোভ দেখা দেয়, তারা অতিসামান্য পদ আশ্রয় করে নগণ্য অবস্থা থেকে অল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত বিত্তের অধিকারী হয়েছে। শুধু এখানেই শেষ নয়। জনসাধারণ, বিশেষত অভিজাত মহলের ক্ষোভের আরও কারণ এই যে, ভারতফেরত এইসব ইংরেজ নিছক অর্থের জোরে ও ব্যয়বহুল সমারোহের আয়োজন করে বহু বনেদী পরিবারকে পার্লামেণ্টের আসন থেকে উৎখাত করতে সক্ষম হয়। তাই নয়, গ্রামাঞ্চলে আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদ

বানিয়ে বর্ণাঢ্য জীবনযাপন প্রণালীর মধ্য দিয়ে বহু বনেদী ঐতিহ্যময় পরিবারের দীপ্তি ম্লান করে দেয়।"

হঠাৎ-নবাবদের জীবনধারা ফুট প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৭৭২ সালে তাঁর 'দি নাবব' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্য পড়ে যায়। 'দি নাবব' নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্র সার ম্যাথু মাইট। নাটকে তাঁর পিতা একজন মাখনওয়ালা। তিনি নিজে ইস্ট ইণ্ডিজে গিয়ে প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়েছেন। নাট্যকার এই হঠাৎ-বড়লোকটির বিলাসী জীবনযাপন ও ভণ্ডামির প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন। নাটক প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জনসাধারণের মধ্যে মুখে মুখে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, নাটকের প্রধান চরিত্র সার ম্যাথু আর কেউ নয়, ইনি অমুক লোক। সেই অমুক ব্যক্তিটি সত্যিই ভারত থেকে প্রভূত অর্থ কামিয়ে ফিরে এসেছিলেন, এবং কাকতালীয়বৎ তাঁর পিতাও ছিলেন মাখনওয়ালা। নাট্যকার সত্যিই তাঁকে অবলম্বন করেই নাটক লিখেছিলেন কিনা জোর করে বলা যায় না, কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ করা শক্ত। অচিরে ঐ ভদ্রলোকের কানেও কথাটা উঠল। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও পরিজনবর্গ গেলেন ক্ষেপে। ওক গাছের ডাণ্ডা হাতে করে তাঁদেরই একজন অগ্নিশর্মা হয়ে একদিন হাজির হলেন নাট্যকারের দরজায়।

নাট্যকার হিউ ফুট তাঁদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং পরিশেষে জানালেন,—ব্যঙ্গ-নাট্যকার রূপেই তাঁর জন-পরিচিতি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে যাঁরা অশালীন আচরণ করেছেন, তাঁদের অবলম্বন করে সাধারণভাবে যদি তিনি নাটক লিখে থাকেন তবে অন্যায় কিছু হয়নি, বরং জনসাধারণ তাঁর কাছে এই ধরনের সত্যউন্মোচনকর্ম আশা করে থাকে।

এটা হল হেস্টিংস-পূর্ব যুগের ঘটনা। এর পরেই ভারতে নন্দকুমারের ফাঁসি এবং বিলেতের পার্লামেণ্টে এডমণ্ড বার্ক কর্তৃক কোম্পানির কর্মচারীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন-পর্ব। হেস্টিংসের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যে ভারতের প্রভাব অত্যন্ত পরোক্ষ। যেখানে প্রত্যক্ষ সেখানেও বাস্তববর্জিত ভাববিলাসিতা প্রশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু এসব থেকে অন্ততঃ একটি বিষয়ের উপলব্ধি সম্যক হতে পারে—

তদানীন্তন শিক্ষিত ইংরেজমনে ভারত সম্পর্কিত ধারণা কেমন ছিল সেটা জানা যায়। ধরা যাক কাউপারের কবিতার নিম্নোক্ত ছত্র—

The Brahmin kindles on his own bare head
The sacred fire, self-torturing his trade !

His voluntary pains, severe and long
Would give a barbarous air to British song.
No grand inquisitor could worse invent
Than he contrives to suffer, well-content.

প্রার্থনারত ভারতীয়দের সৌম্য শান্ত মূর্তি তিনি দেখেছেন এবং তার সঙ্গে উপমিত করেছেন লণ্ডন শহরের

The villas with which London stands begirt
Like a swarth Indian with his belt of beads.

পোপের একটি কবিতায় সতীদাহের কথা উল্লেখ আছে, সতীদাহ সম্পর্কে পোপের যে কিছু ধারণা ছিল সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। লেডী মেরী মণ্টেগু ছিলেন পোপের ব্যক্তিগত বন্ধু। তাঁকে পোপ ১৭১৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের এক পত্রে জানিয়েছেন যে, জন হার্ভে ও সারা ড্রু নামক এক প্রেমিক দম্পতি আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় বজ্রাঘাতে মারা গিয়েছে। তাদের সমাধিস্তম্ভের জন্য কবি দুছত্র কবিতা লিখেছেন। এই কবিতায় প্রেমিক-প্রেমিকার যুগল-মৃত্যুর সঙ্গে পোপ সতীদাহের উপমা দিয়েছেন—

When Eastern lovers feed their funeral fire
On the same pile the faithful pair expire.

ইওরোপের ভারততত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে সার উইলিয়ম জোন্সের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। জন্ম ১৭৪৬ সালে। হ্যারোতে থাকতেই আয়ত্ত করেছিলেন আরবী ও হিব্রু। ১৭৮৩ সালে কলকাতায় আসেন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হয়ে। কলকাতায় পৌছবার আগেই তিনি শিখেছিলেন গ্রীক, লাতিন, ইতালীয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ, আরবী, ফার্সী ও তুর্কী ভাষা। আর কলকাতায় পা দিয়েই শুরু করেন সংস্কৃত চর্চা এবং অচিরে নির্বাচিত হন সদ্য প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। ১৭৮৯ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ এশিয়াটিক রিসার্চ-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসরই তিনি শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ শেষ করেন। কলকাতায় আসার আগেই আরবী সাহিত্যের ভাব আহরণ করে তিনি ইংরেজীতে কিছু কবিতা লিখেছিলেন, পরে কলকাতায় শুরু করলেন ভারতীয় পুরাণাদি আহরণ ও স্বীকরণ। ভারতীয় পুরাণাদির বিভিন্ন চরিত্র বহুবার তাঁকে আকৃষ্ট করেছে।

কামদেব, দুর্গা, ইন্দ্র, ভবানী, সূর্য, লক্ষ্মী, নারায়ণ, সরস্বতী ও গঙ্গাকে অবলম্বন করে তিনি ইংরেজীতে রচনা করেছেন স্তোত্র। সূর্যকে অবলম্বন করে তাঁর যে কবিতা তাতে সঞ্জীবিত হয়েছে ভারতীয় ভক্তিরস—

Fountain of living light
That o'ver all nature streams
Of this vast microcosm both nerves
Whose swift and subtil beams
Eluding mortal sight,
Pervade, attract, sustain, th' effulgent whole
Unite, impel, dialate, calcine,
Give to gold its weight and blaze
Dart from the diamond many limid rays
Condense, protrude, transform, concoct, refine
The sparkling daughters of the mine.

সার উইলিয়ম জোন্সের কথায় প্রসঙ্গত মেকলের নাম মনে পড়ে। অবশ্য বিপরীত কারণে। ভারতের বহু ক্ষতিসাধনের হোতা মেকলে ছিলেন জোন্সের সমসাময়িক। জোন্স যখন বেদ-পুরাণাদি পাঠ করে ভারত-তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে রত, মেকলে সে সময় কেবল গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থ পাঠ করে সময় কাটিয়েছেন। ভারতকে, তার চিত্তের মহৎ ঐশ্বর্যকে উপলব্ধির কোনো চেষ্টাই তিনি করেন নি। প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থাকে উৎখাত করে পশ্চিমী শিক্ষার ধারা প্রবর্তনের মূলে তাঁর ভারতপ্রেম কণামাত্রও ছিল না, কিন্তু ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল পূর্ণমাত্রায়। বাঙালী জাতি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য অতি অশোভন—"বিদেশী পদাশ্রিত থাকায় উপযোগী দৈহিক গঠন ও মানসিক গড়নের দিক থেকে বাঙ্গালীর মত এমন যোগ্য জাতি বিশ্বের কোথাও নেই।"

ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক স্টকলার নিজ স্মৃতিকথায় মেকলের কথা উল্লেখ কালে বলেছেন—ভারতের আইন-সংশোধনের জন্য নিযুক্ত এক কমিশনের সভাপতি হয়ে তিনি এদেশে আসেন। তিনি নিজেই আমায় বলেছিলেন যে তাঁর আইনের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। স্বদেশে ওকালতি-জীবনে মাত্র একবার তিনি এক বৃদ্ধাকে মক্কেল

হিসাবে পেয়েছিলেন। বৃদ্ধার বিরুদ্ধে মোরগ চুরির অভিযোগ ছিল। তাঁর ওকালতির ফলে বৃদ্ধার জেল হয়েছিল।

মেকলে তিন বৎসর এদেশে ছিলেন। স্টকলার লিখেছেন—his departure was not lamented, for he had done little for the press, and nothing for the society.

বিচিত্র এই দেশ। ওয়ারেন হেস্টিংস আন্তরিকভাবে সংস্কৃতচর্চা, পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ব্রাহ্মণোচিত বহুবিধ গুণাবলীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এদেশে নিন্দিত। আর মেকলে ভারতকে বিন্দুমাত্র ভাল না বেসেও, পরন্তু প্রকাশ্যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন।

ভারতাশ্রিত ইংরেজী গ্রন্থের মধ্যে হার্টলি-হাউসের নাম প্রথমেই স্মর্তব্য। কেম্ব্রিজ হিস্টরী অব ইংলিশ লিটারেচরের মতে—ভারত থেকে ইংলণ্ডের বন্ধুদের জন্য প্রথম মহিলা লিখিত জার্নাল হল এই গ্রন্থ। ভারতস্থ ইংরেজ সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে পত্রালাপের আকারে জনৈক মহিলা এই ব্যঙ্গ-গ্রন্থ রচনা করেন। বৃটেনের মধ্যবিত্ত সমাজের কন্যারা ভারতের প্রাচুর্য ও বিলাসবহুল সামাজিক পরিবেশে সহসা নিক্ষিপ্ত হয়ে কী রকম চালে চলেন, তারই বিবরণ এই গ্রন্থ। বিলেতে থাকাকালে ইওরোপিয় কালচারের বিশেষ কিছু আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এদিকে ভারতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ যুবকরা তাদের প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মোহিত করে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে নবাব-নন্দিনীর মত বিলাসিতা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্যের কথা তারা ভাবতে পারে না। "কলকাতায় মেম-সাহেবদের বিবেচনাবোধ বলে কোন কিছু নেই। এক বেলায় বাজারে গিয়ে চার পাঁচ হাজার পাউণ্ড খরচ করে আসার কথাও শোনা যায়। যদি কোন স্বামীকে বলা হয় যে তোমার স্ত্রীকে অমুক দোকানে প্রবেশ করতে দেখলাম তো স্বামী বেচারীর মুখ তৎক্ষণাৎ ছাই-এর মত ফ্যাকাশে হয়ে যায়।"

শ্রীমতী এমা রবার্টস সেকালীন অর্থে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, কিন্তু হাফ-কাস্ট নন। একপুরুষ পূর্বেই তাঁদের পরিবার ভারতবাসী হয়। এমা ভারতকে ভালবেসেছিলেন, তাঁর কাব্যে ভারতবাসীর আর্তি প্রকাশিত হয়েছে, উন্নাসিক অনুকম্পা পরোক্ষেও আত্মপ্রকাশ করেনি কোথাও। দীনবন্ধুর নীলদর্পণে নীলকর চাষীদের, শ্রীমতী স্টোর আঙ্কল টমস কেবিনে নিগ্রো ক্রীতদাসদের দুঃখজর্জর জীবনের মর্মবেদনা যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, শ্রীমতী এমা রবার্টসের একটি কবিতায় ততোধিক নিষ্ঠায় মূর্ত

হয়েছে ভারতের সদ্যো-বিধবার দুঃখ। সতীদাহ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ভারতীয় রমণীদের সাহচর্যে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছিল, তাই সতীর বিলাপ কবিতায় অতি রূঢ় সত্যকে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। মৃত স্বামীর চিতায় আবদ্ধ অসহায় সতী, সহস্র সামাজিক নাগপাশে আবদ্ধ তার জীবন—তবু, মৃত্যু একমাত্র নিয়তি জেনেও সতীর কণ্ঠে একবার উচ্চারিত হল বিদ্রোহ।

> "Think not accursed priests, that I will lend
> My sanction to those most unholy rites,
> And though yon funeral pile I may ascend,
> It is not that your stern command affrights.
> My lofty soul,—it is because these hands
> Are all too weak to break my sex's bands."

এমা রবার্টস্ বঙ্গদেশে বাস করেন নি, উত্তর ভারত ছিল তাঁর কর্মকেন্দ্র। কিন্তু তিনি কবিতার বিষয়বস্তু নির্বাচনে এমন সর্বভারতীয় পশ্চাদপট নির্বাচন করেছিলেন যে, তাঁর নামোল্লেখ না করলে অশোভন হবে।

সেকালের কলিকাতাবাসী ইংরেজদের অনেকেই সমসাময়িক নগরজীবনের কথা লিখেছেন। কিন্তু হেণ্ডারসন সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যক্তি যিনি "বেঙ্গলী" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি নিজেকে বাঙ্গালী বলে পরিচয় দেওয়ার কারণও উল্লেখ করেছেন—

> "সোনার বাংলা, আমি
> তোমায় ভালবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ
> তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

এটা রবীন্দ্রনাথের বহু আগে হেণ্ডারসন লিখেছেন, অবশ্য তাঁর ভাষায়।

আর এক অখ্যাত কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিতে মূল্যবান ইংরেজ কবি উইলিয়ম ওয়াটার-ফিল্ড (১৮৩২-১৯০৭)। ভারতে অবস্থানকালে ভারত-আত্মার অনুসন্ধানে দিন কাটিয়েছেন। তাঁকে বলা যায় ইংরেজ বৈষ্ণব-কবি। ভক্ত বৈষ্ণবের কণ্ঠ থেকে এদেশে গত যুগে যখন উচ্চারিত হয়েছিল 'কই কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ, কোথা আমার প্রাণসখা', অনুরূপ আবেগ, অনুরূপ আকূতি ধ্বনিত হয়েছে ওয়াটারফিল্ডের একটি কবিতায়। দীর্ঘ কবিতা, কাজেই অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি—

Come Krishna from the tyrant proud
How long shall virtue flee ?
The lightning loves the evening cloud,
And I love thee.

* * * *

Come Krishna ! Leave Vaikuntha's bower
Do thou our refuse be,
The koel loves the mango flower
And I love thee.

* * * *

Come Krishna ! Come my Lord, my own !
From prison set me free
The Chakravaki pines alone
As I for thee.

এর ঠিক পূর্বগামী ভারতপ্রেমিক কবি ডব্লিউ-এফ-থমসন (১৮০৮-১৮৪২)। তাঁর "The Jogi's address to the Ganges" নামক কবিতাটি তুলনারহিত। সন্ন্যাসী পরমার্থের সন্ধানে ঘর ছেড়ে একদিন পথে বের হয়েছিল। সারাজীবন ঈশ্বর সন্ধানে কাটিয়ে আজ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সহসা আজ সে মহৎ এক প্রশ্নের সম্মুখীন। গঙ্গার তীরে যেখানেই তীর্থ সেখানেই সে স্নান করেছে, কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার, গঙ্গোত্রী কোন তীর্থস্নান বাদ নেই। কিন্তু কোথায় সেই দেবতা ? কোথায় সেই পরমপুরুষ ? তাঁর তো দর্শন মিলল না।

"Wherever thy sacred wave is drunk
In every haunted spot
I have sought thee till my spirit sunk
For Oh ! I found thee not."

থ্যাকারে ও কিপলিং দুজনেই এদেশে জন্মেছেন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁদের অবদান স্বীকৃত হলেও তাঁদের ভারতপ্রেম সম্পর্কে অনেকেই সন্দিহান। উইলিয়ম

মেকপিস, থ্যাকারের ঠাকুর্দা, আই-সি-এস হয়ে এদেশে আসেন। ঔপন্যাসিক থ্যাকারের বাল্যকাল কলকাতায় অতিবাহিত হয় কিন্তু তাঁর কোন রচনায় কলকাতা বা ভারত তেমন গুরুত্বপুর্ণভাবে উল্লিখিত হয়নি। অবশ্য "দি নিউ কাম্‌সে" পুরানো কলকাতার সাহেবপাড়ার কিছু কাহিনী শ্লেষাত্মক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কিপলিং তো সোজা কথায় ঘোষণা করেছিলেন, পুর্ব-পশ্চিমের মিলন অসম্ভব। সেজন্য তিনি নিন্দিত। কিন্তু কলকাতার উৎপত্তি সম্পর্কে লঘুসুরে যে কবিতা তিনি রচনা করেছেন সেটি একালেও সত্য—

Chance directed, chance erected, laid and built
On the silt
Palace, hovel—poverty and pride, side by side,
And above the packed and pestilential town
Death looked down.

ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, প্রাসাদ ও বস্তির বিচিত্র সহাবস্থান—এই হল কলকাতা, তার সেকাল ও একালের অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য। আমাদের ঠুনকো সম্ভ্রমবোধে আঘাত দিলেও কিপলিং অসত্য উক্তি করেন নি। কিন্তু অন্য কারণেও কিপলিং স্মরণীয়।

মার্কিন লেখক মার্ক টোয়েন যে ভারতে এসেছিলেন (১৮৯৬) এবং ভারত সম্পর্কে তাঁর যে কৌতূহল ছিল, তার মূলে ছিলেন কিপলিং। এদেশে থাকার সময়েও কিপলিং নিয়মিত মার্ককে চিঠি লিখতেন। পরে মার্কিন দেশ ভ্রমণের সময় কিপলিং মার্কের নিউ-ইয়র্ক স্টেটের এলমিরার বাড়িতে আশ্রয় নেন। তাঁর কন্যা সুশী আকুল জিজ্ঞাসা নিয়ে কিপলিং-এর কাছে ভারতের গল্প শুনেছেন। মার্ক আত্মজীবনীতে লিখেছেন,—

No doubt India had been to her an imaginary land upto this time, a fairy land, a dreamland, a land made out of poetry and moonlight for the Arabian Nights to do their gorgeous miracles in; and doubtless Kipling's flesh and blood and modern clothes realised it to her for the first time and solidified him.

বিবিধ প্রসঙ্গ

মশা

বাংলা দেশের মশা, যার নামডাক বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিল, তার কথা সভয়ে অনেকেই গত শতকে উল্লেখ করেছেন। কোলওয়ার্দি' গ্র্যাণ্ট (১৮৪০) লিখেছেন—

"বাইরের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্যই গায়ে চামড়ার ব্যবস্থা। কিন্তু জঙ্গলে যে সব প্রাণীর গায়ের চামড়া অত্যধিক পুরু তারাও শরীরের চারিদিকে আচ্ছাদন দেয়। এমন কি, অমন যে বৃহদায়তন হাতি, তাকেও দেখা যায় মাথা ও পিঠ অশ্বত্থ গাছের পাতা দিয়ে ঢাকতে হয়েছে। অবশ্য কেবল যে মশার জন্যই তাদের শরীর ঢাকতে হয়, এমন কথা বলছি না। বাংলা দেশের নিম্ন-জলাভূমিতে যে সব বিচিত্র কীট-পতঙ্গ প্রতিবেশীদের উপর আক্রমণ চালায়, মশা তাদের মধ্যে অন্যতম, অবশ্যই প্রধানতম।

এদের মধ্যে এক দল কেবল সংখ্যাধিক্যের জোরেই মারাত্মক, প্রায়ই তাদের বিভিন্ন পাত্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট দেখা যায়। আর একদল আরও সাংঘাতিক, বিপদ সৃষ্টির জন্যই যেন তাদের জন্ম। এরা কেবল কামড়ায় না, দংশনস্থলে ক্ষতের সৃষ্টি করে। এদের দংশনে ঘোড়ার পা থেকেও রক্ত পড়তে আমি দেখেছি। দেখে মনে হয় যেন ছোট ছুরি কেউ তার পায়ে ফুটিয়েছে। সেজন্য প্রায়ই দেখা যায় ঘোড়ার পায়ে স্টকিং দিয়ে বা খড় দিয়ে বাঁধা।"

ব্যাঙের ডাক

ক্যালকাটা জার্নালে (১৮১৯, ২৪ নভেম্বর) জনৈক পাঠক ব্যাঙের ডাক সম্পর্কে নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন—

"আমরা, ভাগ্য যাদের এই ভারতে পাঠিয়েছে, প্রায়ই এক ব্যথাভরা অভাব অনুভব করি। এদেশে কোন শোভন সান্ধ্য-আনন্দানুষ্ঠান নেই। এখানে কোন সুকণ্ঠী পাখী নেই, এখানে আছে নানা শব্দপারঙ্গম কীটপতঙ্গ ও গম্ভীরনাদী ব্যাঙ।

সম্পাদক মহাশয়, বর্ষারাতের সন্ধ্যায় আমার ঘরের আশে-পাশে যে লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ ডাকে, আমি আন্তরিক ভাবে চেয়েছিলাম, সেগুলি গান হোক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রায়ই তাদের "সুমিষ্ট গান" আমায় শুনতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু সেই একঘেয়ে কণ্ঠনিনাদের মধ্যে সুন্দর কিছু পাইনি। তারা যেন একটানা বলে যায়—Pay me what you owe me, Pay me what you owe me. I'll go to law, I'll go to law." অনেক সময় সেই হুমকি এমন অপ্রীতিকর মনে হয় যে, ইচ্ছা করে তাদের নাম দিই "জেল বার্ড।"

তাড়ি

মদ্যপানের ব্যাপারে ইওরোপিয়রা চিরদিনই ভারতীয়দের উপর টেক্কা দিয়েছে। আকবরের বাহিনীতে যে সব ইওরোপিয় গানার ছিল, তাদের ঢালাও মদ সরবরাহের হুকুম দেওয়া হয়। আকবর নাকি বলতেন, "মদ ও ইওরোপীয়দের সৃষ্টি হয়েছে যুগপৎ। এদুটির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মাছকে জল থেকে তুলে আনলে যেমন মাছ বাঁচে না, ইওরোপিয়দের মদ না দিলে তেমনই মারা যাবে। নেশা না হলে চোখে তারা দেখতে পায় না।" (Manucci, Storia de Mogor)।

ভারতে কোথায় কোন নেশার দ্রব্য বিখ্যাত সেটা সেনাবাহিনীর লোকেরা পরখ করে দেখতে ভোলেনি। জনৈক ক্যাপ্টেন সিম্পসন ভারতীয় নেশার দ্রব্য সম্পর্কে প্রায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। আঠারো শতক পর্যন্ত ভারতের প্রধান মদ ছিল আরক। ক্যাপ্টেন সিম্পসনের বর্ণনা থেকে জানতে পারি, আরক তৈরী হত চাল বা তাড়ি থেকে, কখনও বা চিনির রস থেকে। এর সঙ্গে মেশানো হত বাবুল গাছের রস। তখন একে বলা হত "জাগর আরক।" সেটা হত "hot as brandy and drunk in drums by Europeans." তাড়ি সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন "It affects the head as much as English Beer. In the morning it is laxative, and in the evening astringent."

আরও বলেছেন—"অপরিমিতভাবে সেবনের ফলে বহু ইওরোপিয়ান মৃত্যু বরণ করেছে। কারণ নেশার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পেত। ফলে তারা এত অধৈর্য হয়ে পড়ত যে কোন স্থানে তাদের শরীর ঠাণ্ডা হত না। বাধ্য হয়ে সারা রাত খোলা

মাঠে তারা অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকত। এই অবস্থায় সহজেই তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হত।"

আরকের পর পাঞ্চ ইওরোপিয় মহলে জনপ্রিয় পানীয়রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। পাঞ্চ কথাটি এসেছে পঞ্চ রঙ থেকে। আরক, গোলাপ জল, citron juice, চিনি ও জল মিশিয়ে তৈরী হত পাঞ্চ।

ক্যাপ্টেন মাণ্ডি তাড়ি খেয়ে প্রশংসা করেছেন, তাঁর মতে—"তাড়ি এদেশে খুবই সস্তা। ভোরবেলা খেলে নির্দোষ পানীয়। কিন্তু বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তালরস গেঁজে যায়। তখন একে বলে তাড়ি। এই তাড়ির সঙ্গে লঙ্কা মিশিয়ে তাকে আরও উত্তেজক করা হয়। ইওরোপিয়রা অধিক পরিমাণে এই জিনিস পান করে। সাহেবরা লিভারের দোষে এদেশে যে কষ্ট পায়, তার মূলে এই তাড়ি-সেবন। দাম সস্তা। মাত্র এক পেনী ব্যয় করলে একেবারে ব্যোম হয়ে (dead drunk) পড়ে থাকা যায়।"

স্ট্যাথামও স্বীকার করেছেন তাড়ির দাম সস্তা এবং ইওরোপিয় সৈন্যদের খুব প্রিয়।

"আমি দেখেছি তিন-চার জনের একটি দল গোল হয়ে বসে, তাদের মাঝখানে দু-তিন গ্যালন পানায়ের একটি পাত্র। এই পাত্র সারারাত্রে একাধিকবার বদল হয়েছে, একটি খালি হলে আর একটি সেই স্থান দখল করেছে।

নির্জন সেনা-ছাউনির কাছে যেখানেই বাজার, সেখানেই তাড়ির দোকান আছে। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না যে কিছু আছে। যে-সব সৈন্য দায়িত্বশীল ও কর্তব্য-পরায়ণ, তারা এসবের কোন খবর রাখে না, অথচ যারা নেশা করে তাদের সময় ও অর্থের অধিকাংশই অপব্যয়িত হয় তাড়ি ও আরক খেয়েই। যেখানে দোকান নেই, সেখানে নেশাখোরেরা সরাসরি তালগাছের কাছে চলে যায় ও সেখানে বসেই ভাঁড় নামিয়ে খায়।"

ষাঁড়

এদেশের ষাঁড় বহুবার বহু বিদেশীকে আকর্ষণ করেছে। সম্ভবতঃ এদের ককুদ্ ও বেপরোয়া চালচলন তাঁদের মুগ্ধ করে থাকবে। হেবার লিখেছেন তাঁর ডায়েরীতে—

"নদীর তীরে জামগাছের তলায় প্রথম দেখলাম এক নধরকান্তি ষাঁড়। তার ককুদের

উপর শিবের প্রতীক অঙ্কিত। তখন সে সবুজ ধানক্ষেতে বিচরণরত। আমাদের রাস্তার ওপর এল বেশ খোস মেজাজেই। স্টো'র (সহযাত্রী) হাতে ছিল কচি ঘাস, তাই দেখে ঠাণ্ডা মাথায় এগিয়ে এল শুঁকে দেখতে। শিবের নিকট উৎসর্গ করার জন্য অল্পবয়সী বাছুরদের ষাঁড়ে পরিণত করা হয় বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে। এদের প্রহার করা বা আহত করা মহাপাপ। তারা যখন যেখানে খুশি খায়, আর ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা এদের পরিতোষ সহকারে খাইয়ে তৃপ্তি লাভ করে। কলকাতার আশেপাশের গ্রামগুলিতে এরা সংখ্যায় পোকামাকড়দের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কখনও কারও বাগানে, কখনো কোন ফলের দোকানে, কখনো কোনো খাবারের দোকানে অবলীলাক্রমে মুখ লাগায় একেবারে নিঃশব্দে। অন্য পোষা প্রাণীর মত এরাও মাঝে মাঝে মেজাজ খারাপ করে বসে। ইচ্ছাপূরণে দেরি হলে শিঙের গুঁতো দিতে দেরি করে না।"

হেবার যাই বলুন, স্ট্যাথাম সাহেব বাঙালী ষাঁড়ের প্রশংসা করেছেন অকুণ্ঠিত মনে। ষাঁড়ের কাছে তিনি কিঞ্চিৎ কৃতজ্ঞ, সেকথাও স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

"বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেশীয় ধার্মিকরা বাছুর-ষাঁড়ের গায়ে শিবের প্রতীক অঙ্কিত করে ছেড়ে দেয়। এর অর্থ সে শিবের সম্পত্তি। তখন থেকে সে হল পবিত্র-ষণ্ড, অর্থাৎ ধর্মের ষাঁড়। যেখানেই সে বিচরণ করুক, কেউ তার গায়ে হাত তুলবে না। এদের কারও গায়ে আঘাত করা গুরুতর পাপ বলে বিবেচিত হয় এবং এই নিয়ম ভঙ্গের জন্য যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, সেই গুরুদণ্ডকে হিন্দুমাত্রই ভয় করে। কারণ তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে এবং শস্যাদি যা কিছু দোকানে বিক্রির জন্য খোলা পড়ে থাকে তাতেই মুখ লাগায়। শেষ পর্যন্ত তাদের দেহ হয় স্থূল, গতি হয় ধীর।

"কয়েক বৎসর আগে তাদের সংখ্যা কলকাতায় এত বৃদ্ধি পায় যে, সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কর্তৃপক্ষ হুকুম দিলেন তাদের গঙ্গার ওপারে হাওড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক। তাই করা হল। নৌকায় চাপিয়ে তাদের ওপারে হাওড়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। কলকাতার অধিবাসীরা যথোচিত প্রণাম ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করে তাদের বিদায় দিল।

"কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল, সবাই খাস কলকাতায় নিজ নিজ এলাকায় ফিরে এসেছে। কে এই জঘন্য অপকর্ম করল অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত হল। নগর কর্তৃপক্ষ ভুলে গেলেন যে এদেশের গরু-মোষ সবচেয়ে চওড়া ও বিপদসঙ্কুল নদীও সাঁতরে পার হতে পারে।

"একটি ভদ্র ষাঁড় আমার বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করত। ছোট ছেলে ও ভৃত্যদের সে ছিল প্রিয়পাত্র। ছোটরা প্রায়ই তার পিঠে চড়ে বসত। একদিন রাত্রে

আমি নদীর ওপারে গেছি, সহসা প্রবল ঝড় উঠল। ফলে যথাসময়ে ফিরতে পারলাম না। সহিসকে ঘোড়ার গাড়ি যে সময় ঘাটে আনতে বলেছিলাম, তার পরেও তিন চার ঘণ্টা দেরি হল। ফলে এপারে ঘাটে নেমে দেখি সহিস ও গাড়ি নেই। রাত তখন প্রায় বারোটা। তখন এমন পাকা রাস্তা ছিল না। বৃষ্টির জল পড়ে রাস্তাটা বড়ই নোংরা হয়ে ছিল। এপারে ফিরে এসে ভাবছি কি করে বাড়ি ফেরা যায়। দেখি সেই ষাঁড়টি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। চেপে বসলাম তার পিঠে। যদিও তার গতি ছিল অতি ধীর তবু কাদার মধ্য দিয়ে আমায় পিঠে নিয়ে একেবারে বাড়িতে পৌঁছে দিল। সারা রাস্তায় কোথাও কোন লোক নেই। কিন্তু একজন চৌকিদার দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গেল। বোধ হয় ভেবেছিল নিশ্চয়ই শিব স্বয়ং আসছেন। আমি তার সঙ্গে কথা বলতেই সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে হেসে উঠল। পরে বাড়ির দরজায় এসে ষাঁড়ের পিঠ থেকে নেমে সেই পবিত্র ষাঁড়ের গলায় একটু হাত বুলিয়ে বিদায় করলাম। যদিও আমার সাদা ট্রাউজার তার গায়ের কাদামাটির স্পর্শে নোংরা হয়ে গিয়েছিল তবু তো সে আমায় কাদার রাস্তা পার করেছে। অন্যথায় সেই কাদার মধ্য দিয়েই তো আমায় আসতে হত।"

কেরী তাঁর "গুড ওল্ড ডেজ অব জন কোম্পানি" গ্রন্থে কলকাতার ষাঁড়ের কথা উল্লেখ করেছেন—

"ধর্মের ষাঁড়ের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে নগরবাসীর জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। ফলে ১৮১৫ সালের আগস্ট মাসে শহর থেকে তাদের বিতাড়নের হুকুম হয়। নদীর ওপারে হাওড়ার দিকে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার পরেও বহুবৎসর, যতদিন পর্যন্ত দেশীয় অধিবাসীদের ধর্মীয় সংস্কারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত না, ততদিন পর্যন্ত এই সব ষাঁড় মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা বহনের কাজে নিয়োগ করা হত।"